Peace

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্র্যাকটিক্যাল নামায

রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিক্যাল নামায

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

রাসূল ﷺ -এর প্র্যাকটিক্যাল নামায

মূল

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী

সংকলনে

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

মুফাসসির : তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন

আরবি প্রভাষক : নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, চাঁদপুর।

সম্পাদনায়

শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক সালাফি

ভাইস প্রিন্সিপাল মাদারাতুল হাদীস, নাজীর বাজার, ঢাকা।

দাওরায় হাদীস পশ্চিম বঙ্গ ও দাওরায় হাদীস আল জামিয়া সালাফিয়া বেনারস, ভারত

কৃতজ্ঞতায়

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

রাসূল ﷺ -এর
প্র্যাকটিক্যাল নামায

প্রকাশক

মো: রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ফোন : ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : জুন – ২০১২ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি – ২০১৩ ইং

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

ISBN-978-984-8885-17-8

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. **মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী**
প্রফেসর কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি

২. **আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী**
গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ

৩. **আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল**
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ

৪. **মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান**
গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ

৫. **মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুল্লাহ**
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ

৬. **আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর**
নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: শরিয়া বিভাগ

৭. **মুহাম্মদ আবদুল আযীয মাদানী**
লেখক ও ইসলামী গবেষক

মুখবন্ধ

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ .
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ . وَصَلَّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ .

'রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ﷺ-কে নবুওয়াত ও রেসালাতের মতো গুরু দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তিনিও এ দায়িত্বকে পরিপূর্ণরূপে পালন করে গেছেন। যেহেতু তিনি মানব জাতির মহান শিক্ষক তাই তিনি মানব জাতির জন্য কথা ও কাজের মাধ্যমে যেসব বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে নামায। রাসূল ﷺ-কে জিব্রাঈল (আ) বাস্তবে হাতে কলমে নামাজ শিক্ষা দিয়েছেন। আর রাসূল ﷺও তার সাহাবীকে সেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। একদা রাসূল ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে এবং রুকু করে নামায পড়েন। অতঃপর সাহাবাদেরকে বলেন : "আমি এমনটি করলাম এজন্য যাতে করে তোমরা আমার অনুকরণ করতে পার এবং আমার নামায শিখতে পার।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আমাদের উপর তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব করেছেন। তাঁর বাণী হচ্ছে–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ .

অর্থ : তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ ঠিক সেভাবে নামায পড়।

(বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ)

যে ব্যক্তি তাঁর নামাযের মত নামায পড়বে তাকে তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন এ মর্মে যে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বলে ওয়াদা করেছেন, যেমন তিনি বলেন–

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ .... إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ .

অর্থ : মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এগুলোর জন্য সুন্দরভাবে ওযূ সম্পাদন করবে, আর ঠিক সময় মত তা আদায় করবে, এর রুকু, সাজদা ও খুশুখুযূ (বিনয়ভাবে) পূর্ণমাত্রায় পালন করবে, আল্লাহ তার ব্যাপারে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন, আর যে এমনটি করবে না তার ব্যাপারে আল্লাহর কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন আর তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। (আবূ দাউদ হাদীস নং- ৪৫১ ও ১২৭৬)

আর নবী করীম ﷺ-এর নামাযের সাথে এর মিল ও গরমিলের উপর পারিশ্রামিকেরও কম বেশি হয়। যেমন তিনি হাদীস বলেন–

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا .

অর্থ : নিশ্চয়ই কিছু বান্দা এমন নামাযও পড়ে যার বিনিময়ে তার জন্য কেবল নামাযের এক দশমাংশ, নবমাংশ, অষ্টমাংশ, সপ্তমাংশ, ষষ্ঠাংশ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ লিখিত হয়। (আবূ দাউদ হাদীস নং-৭৬১)

নামাজে 'রফই ইয়াদাইন' 'স্বশব্দে আমীন বলা', 'বুকের উপর হাত বাঁধা' ইত্যাদি এগুলো মূলত সহীহ্ হাদীসেরই নির্দেশনা।

মূলতঃ নামাযের ক্ষেত্রে মাযহাবগত যে পার্থক্য দেখা যায় তা দুর্বল ও জাল বা বানোয়াট হাদীসের অনুসরণ ও সহীহ্ হাদীসের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন না করে মাযহাবী টানাহিচড়ার কারণে। অথচ যাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করা হয়েছে তারা শুধু কুরআন ও সহীহ্ হাদীস মানার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন এবং সহীহ্ হাদীসকে তাদের মাযহাব বলে ঘোষণা করে গেছেন। তারা কস্মিনকালেও তাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করতে বা তাদের তাকলীদ করতে বলেননি বরং তারা তাঁদের দলীলবিহীন কথা ও ফতওয়া গ্রহণ করতে নিষেধ ও হারাম করেছেন।

যেমন আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ হানাফী মাজহাব অবলম্বী। অথচ আমরা নিজেদের মুখে হানাফী দাবী করছি, কিন্তু কার্যত করছি ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ) ও তার অনুসারীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন তিনি বলেছেন- إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ

অর্থ : হাদীস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে ওটাই আমার মাযহাব বলে পরিগণিত হবে।
(ইবনে আবিদীন এর হাশিয়া ১ম খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা)

لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَاْخُذَ بِقَوْلِنَا مَالَمْ يَعْلَمْ مِنْ اَيْنَ اَخَذْنَاهُ.

অর্থ : আমরা কোথা থেকে কথাটি নিলাম এটা না জানা পর্যন্ত কারো জন্য আমাদের কথা বা ফতোয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। (ইবনে আবিদীন এর আল বাহরুর রায়েক এর টীকায় ৬/২৯৩)

এ বইটিতে আমরা হাদীসের আলোকে এমন কিছু দোয়া ও নিয়মের কথা উল্লেখ করেছি যার ফলে একজন পাঠক সমাজে প্রচলিত নামাজের খেলাফ বা বিরোধী অনেক কিছু দেখতে পাবেন। এটা আপনি কেন আমিও এ রকম খটকায় পড়েছি। কারণ ছোটকালে আমরা মোকতব বা ফোরকানীয়া মাদ্রাসায় হুজুরের মাধ্যমে নামায শিখেছি। হুজুর আমাদেরকে শিখিয়েছেন .. نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىْ এ নিয়াত পড়া এবং এ নিয়্যাত পড়ার আগে ..اِنِّىْ وَجَّهْتُ পড়া।

অথচ হাদীস পাঠে জানতে পারলাম এ নিয়্যাত পড়া বিদআত এবং মুসল্লার দোয়া তাকবীরে তাহরীমার পড়ে পড়তে হবে আগে নয়। এ জন্য আমিও একজন ছাত্রের মত সহীহ হাদীস ভিত্তিক দোয়াগুলো শিক্ষা করার এবং সে মতে নামায পড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আমরা এ মূল্যবান গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম অংশে তাহারাত বা পবিত্রতা, দ্বিতীয় অংশে রাসূল ﷺ-এর প্যাকটিকাল নামায আর তৃতীয় অংশে নামাজে প্রচলিত কিছু ভুল ও বিদআতী নামায। উক্ত এ গ্রন্থটিতে যদি কোন ভুল ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে আনলে পরবর্তী প্রকাশে সংশোধন আনব ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র

১. পবিত্রতা ২৫

১. গোসল করার নিয়ম ২৭

২. ওযু ও তার গুরুত্ব ২৮

৩. ওযু করার নিয়ম ২৯

৪. ওযুর শেষে দুআ ৩০

৫. ওযুর আনুষঙ্গিক মাসায়েল ৩১

৬. রোগীর পবিত্রতা ও ওযু-গোসল ৩৪

৭. ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ ৩৫

৮. যাতে ওযু নষ্ট হয় না ৩৬

৯. যে সব কাজের জন্য ওযু মুস্তাহাব ৩৮

১০. মোজার উপর মাসেহ ৩৮

১১. মাসেহের শর্তাবলী ৩৯

১২. মাসেহের সময়কাল ৩৯

১৩. মাসেহের নিয়ম ৪০

১৪. যা দ্বারা মাসেহ নষ্ট হয় ৪০

১৫. মাসেহের আনুষঙ্গিক মাসায়েল ৪০

১৬. তায়াম্মুম ৪২

১৭. যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয ৪২

১৮. যা দ্বারা তায়াম্মুম হবে ৪৪

১৯. তায়াম্মুম করার পদ্ধতি ৪৪

২০. যা দ্বারা তায়াম্মু নষ্ট হয় ৪৪

২১. তায়াম্মুমের আনুষঙ্গিক মাসায়েল ৪৫

২২. মিসওয়াক করার গুরুত্ব ৪৬

২৩. নামাযীর লেবাস ৪৭

২৪. নামাযের ভিতরে বিশেষ লেবাস ৫২

২৫. নিষিদ্ধ সময়সমূহ ৫৫

◆ নিষিদ্ধ সময়ে নামায আদায়ের বিধান ৫৬

২. নামায (সালাত)

১.	**সালাতের অর্থ, হুকুম ও ফযীলত**	৫৭
১.	সালাত ফরজ হওয়ার হেকমত	৫৮
২.	আল্লাহর আদেশসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আলামত	৬০
৩.	শরিয়তের নির্দেশসমূহের সূক্ষ্ম জ্ঞান আল্লাহর আদেশসমূহ	৬০
৪.	আত্মার গুণাগুণ	৬০
৫.	সালাতের হুকুম	৬১
৬.	সাবালক তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ	৬২
৭.	সালাতের গুরুত্ব	৬৩
৮.	ফরজ সালাতের সংখ্যা	৬৪
৯.	ফরজ সালাত অস্বীকারকারী বা সালাত ত্যাগকারীর বিধান	৬৫
১০.	ফরজ নামায অস্বীকারকারী বা ত্যাগকারীর অন্যান্য বিধান	৬৬
১১.	নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত	৬৬
১২.	পবিত্র অবস্থায় মসজিদে নামাযের উদ্দেশ্যে গমনের ফযীলত	৬৭
১৩.	যা দ্বারা নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়	৬৭
১৪.	এমন ফযীলত যা ইবাদতের মূলের সাথে সম্পৃক্ত যেমন	৬৮
১৫.	আদেশ-নিষেধের সূক্ষ্ম জ্ঞান	৬৮
১৬.	যে সকল সময় আল্লাহর নিকট আমল পেশ করা হয়	৬৯
২.	**আজান ও একামত**	৭১
১.	ইসলামে আজানের বিধিবিধানের হেকমত	৭১
২.	আজান ও একামতের বিধান	৭১
৩.	নবী করীম ﷺ-এর মুয়াজ্জিনের সংখ্যা চারজন	৭১
৪.	আজানের ফযীলত	৭২
৫.	সহীহ হাদীসে বর্ণিত আজানের নিয়মাবলি	৭২
৬.	আজান শুদ্ধ হওয়ার শর্ত	৭৪
৭.	আজান শ্রবণকারী যা বলবে	৭৪
৮.	আজানের প্রতি উত্তরের ফযীলত	৭৬
৯.	আজান দেয়ার ফযীলত	৭৭
১০.	একাধিক আজানের বিধান	৭৭
১১.	ইমামতী ও আজান দিয়ে বেতন নেয়ার বিধান	৭৮

১২.	আজানরত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে তার বিধান	৭৮
১৩.	আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান	৭৮
১৪.	সহীহ হাদীস অনুযায়ী ইকামতের পদ্ধতি	৭৮
১৫.	সফর অবস্থায় আজান ও একামত	৮০
১৬.	আজান ও একামতের দিক থেকে নামাজের চার অবস্থা	৮০
৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়		**৮১**
১.	পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময়সূচি	৮১
২.	প্রচণ্ড গরমের সময় যখন সালাত আদায় করবে	৮৩
৩.	যখন নামাজের সময় অস্পষ্ট হবে তখন সালাতের সময়	৮৪
৪. সালাতের শর্তাবলী ও রোকনসমূহ		**৮৪**
১.	পুরুষ ও নারীর সতরের সীমা	৮৬
২.	সালাতের ফরজসমূহ	৮৭
৩.	নামাজ থেকে মুক্ত হতে সালাম	৯০
৪.	যে ব্যক্তি কোন একটি রোকন ছেড়ে দেবে তার বিধান	৯১
৫.	সুন্দরভাবে সালাত আদায় এবং পূর্ণ করা ওয়াজিব	৯২
৫. সালাতের ওয়াজিবসমূহ		
১.	সালাতের ওয়াজিবসমূহ	৯২
২.	যে সালাতের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেবে তার বিধান	৯৭
৩.	রোকন ও ওয়াজিবের মাঝে পার্থক্য	৯৭
৬. সালাতের সুন্নাতসমূহ		**৯৮**
১.	নামাজের মধ্যে নিয়ত পরিবর্তন করার বিধান	১০০
২.	যে কিবলা জানে না সে যেভাবে সালাত আদায় করবে	১০০
৩.	জুতা ও সেন্ডেল পরা অবস্থায় সালাত আদায়ের বিধান	১০০
৪.	উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায়ের পদ্ধতি	১০১
৫.	ভুলে ওযু ছাড়া নামাজ পড়লে তার হুকুম	১০১
৬.	বিভিন্ন নামাযের কাজার পদ্ধতি	১০১
৭.	সফরে ঘুমের কারণে ফজর সালাত ছুটে গেলে	১০২
৮.	বিবেক লোপ পাওয়া ব্যক্তি যেভাবে সালাত কাযা করবে	১০২
৯.	ঋতুবতী নারী ও বীর্যপাতজনিত অপবিত্র ব্যক্তি যেভাবে সালাত কাযা করবে	১০২
১০.	ঘুমের জন্য সালাত ছুটে গেলে বা ভুলে গেলে তার বিধান	১০৩

৭. মসজিদের আদব ১০৩

১. মুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে যা করবে ১০৪

২. মসজিদে ঘুমানোর বিধান ১০৫

৩. নামাজ আদায়কারীকে সালাম দেয়ার বিধান ১০৫

৪. মসজিদের কোন স্থান বুকিং বা নির্দিষ্ট করে রাখার বিধান ১০৫

৮. সালাত আদায়ের পদ্ধতি ১০৬

১. তাকবীর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত নবী করীম ﷺ এর সালাতের পদ্ধতি ১০৬

২. সানা পড়া ১০৭

৩. সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের গুরুত্ব ১১১

৪. ইমামের পিছনে জোরে 'আমীন' বলার বিশেষত্ব ১১২

৫. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে সুন্নাত মোতাবেক কেরাত ১১৪

৬. রুকুর দোয়া ১১৫

৭. রুকুতে কুরআন পড়া নিষেধ ১২০

৮. সিজদার দোয়া ১২১

৯. সিজদা অবস্থায় কুরআন পড়া নিষিদ্ধ ১২৫

১০. বিশ্রামের বৈঠক ১২৬

১১. সালাত ও সালাম ১২৮

১২. সালাতের নারী-পুরুষের পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই ১৩৫

১৩. সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদির দিকে ফিরে বসার পদ্ধতি ১৩৫

৯. ফরয সালাতের পর মাসনূন দোয়াসমূহ ১৩৯

১. ফজরের সালাতের পর যা পড়বে ১৪৩

২. জিকির ও দোয়ার স্থান ১৪৪

৩. সালাতের কিছু বিধান ১৪৫

৪. নামাজরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হলে করণীয় ১৪৫

৫. সালাতে মুসলিম ব্যক্তি যা করবে ১৪৬

৬. মুসল্লীর জন্য নামাজে দু'টি সেকতা (নিরবতা) রয়েছে ১৪৬

৭. সালাত দেরী করার বিধান ১৪৭

৮. মুসল্লি যা থেকে বিরত থাকবেন ১৪৭

৯. সালাতে এদিক-ওদিক দেখার বিধান ১৪৮

১০. নামাজের সময় সুতরা সামনে করে নেয়ার বিধান ১৪৮

১১. নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান ১৪৮

১২. নামাজে দুই হাত উত্তোলনের স্থানসমূহ ১৪৮
১৩. নামাজরত অবস্থায় মুসল্লীর জন্য যা জায়েয ১৪৯
১৪. একাকী নামাজির জন্য স্বশব্দে কেরাতের বিধান ১৫০

১০. সাহু সিজদা ১৫০
১. সাহু সিজদার নিয়ম ১৫১
২. সাহু সিজদা করার কারণগুলো ১৫২
৩. সাহু সিজদায় যা বলবে ১৫৬
৪. মাসবূক (যার সালাতের কিছু অংশ ছুটে গেছে) মুসল্লি যখন সাহু সিজদা করবে ১৫৭

১১. জামাতে নামায আদায়
১. জামাতে নামায বিধি-বিধানের হেকমত ১৫৭
২. মুসলমানদের সবচেয়ে বড় জামায়েত ১৫৭
৩. জামায়াতে নামায আদায়ের বিধান ১৫৭
৪. মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায়ের ফযীলত ১৫৭
৫. যেখানে জামায়াতবদ্ধ সালাত আদায় করবে ১৫৮
৬. মহিলাদের মসজিদে গমনের বিধান ১৫৯
৭. জামায়াতের জন্য সর্বনিম্ন লোক সংখ্যা ১৫৯
৮. একাকী সালাত আদায়ের পর জামায়াত পাবে তার বিধান ১৫৯
৯. জামায়াতে সালাত আদায় করা থেকে দূরে থাকার বিধান ১৬০
১০. জামাত ও প্রথম তাকবীরের ফযীলত ১৬০

১২. ইমামতির আহকাম ১৬০
১. ইমামকে অনুসরণের বিধান ১৬০
২. ইমামতির জন্য বেশি হকদার ও অগ্রাধিকার ১৬১
৩. ফাসেক ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায়ের বিধান ১৬২
৪. ইমামের আগে কিছু করলে তার বিধান ১৬২
৫. ইমামের সাথে মুক্তাদির চার অবস্থা ১৬২
৬. মাসবূকের অবস্থা ১৬৩
৭. সালাতে হালকা করার বিধান ১৬৩
৮. সুন্নত তরীকায় সালাত হালকা করার পদ্ধতি ১৬৪
৯. মুক্তাদিগণ যেখানে দাঁড়াবে ১৬৪
১০. ইমামের পিছনে পুরুষ ও মহিলাদের লাইন হয়ে দাড়ানোর বিবরণ ১৬৪

১১. জামায়াতে সালাতের কাতার সোজা করার নিয়ম ১৬৫
১২. জামায়াতের কাতার সোজা করার বিধান ১৬৬
১৩. নিয়তে বিপরীত হওয়ার বিধান ১৬৬
১৪. ছোট বাচ্চা ও মহিলাদের ইমামতির পদ্ধতি ১৬৭
১৫. ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হলে তার বিধান ১৬৭
১৬. মুক্তাদির ছুটে যাওয়া রাকাতসমূহের পূর্ণ করার পদ্ধতি ১৬৮
১৭. কোন ওজর ছাড়া লাইনের পিছনে সালাত আদায়ের বিধান ১৬৮
১৮. নফল সালাত জামায়াত করে আদায়ের বিধান ১৬৯
১৯. মুক্তাদিগণের ইমামের অনুসরণের পদ্ধতি ১৬৯
২০. মুক্তাদিগণের দিকে ইমামের ফিরার পদ্ধতি ১৬৯
২১. ইমামকে বাদ দিয়ে মুক্তাদির অবস্থাসমূহ ১৭০
২২. সালাতে ইমামের শব্দ করার অবস্থাসমূহ ১৭০
২৩. শিরককারী ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়ার বিধান ১৭০
২৪. অপবিত্র বস্তুসহ ইমামের সালাতের বিধান ১৭১
২৫. সালাতের লাইনের যেসব স্থান ফযীলতপূর্ণ ১৭১
২৬. সালাত লম্বা ও হালকা করার পদ্ধতি ১৭২

১৩. মা'জুর (অক্ষম) ব্যক্তিদের সালাত

১. মা'জুর তথা যাদের ওজর আছে তারা হলো ১৭৩
২. অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতার পদ্ধতি ১৭৩

ক. অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

১. অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের পদ্ধতি ১৭৩
২. অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের আহকাম ১৭৪
৩. রোগী যখন দুই ওয়াক্তকে জমা করে সালাত আদায় করবে ১৭৫
৪. রোগী ব্যক্তি যেখানে সালাত আদায় করবে ১৭৫
৫. রোগী ও মুসাফিরের আমলে যা লেখা হবে ১৭৫

খ. মুসাফিরের সালাত ১৭৫

১. সফরের দূরত্ব ১৭৫
২. সফরের সময়সীমা ১৭৬
৩. মুসাফির বা ভ্রমণকারী ১৭৬
৪. কসর সালাত পড়ার শরঈ হুকুম ১৭৬

৫. সফরে সুন্নাত সালাত আদায়ের বিধান ১৭৭
৬. সফরের সময় দুওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়া ১৭৭
৭. সফরে একত্রে সালাত আদায়ের পদ্ধতি ১৭৮
৮. কসর আদায়ের সূচনা ১৭৯
৯. কসর আদায়ের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় ১৮০
১০. যানবাহনে আরোহী অবস্থায় সালাত ১৮০
১১. কসর ও জমা করার বিধান ১৮২
১২. মুকিম অবস্থায় বাড়িতে একত্রে সালাত আদায়ের বিধান ১৮৪

গ. ভয়-আতঙ্ক অবস্থার সালাত ১৮৪

১. ভয়-ভীতির সময় সালাতের পদ্ধতি নামাযে ১৮৫
২. যদি শত্রু পক্ষ কিবলার দিকে থাকে তবে নিম্নের পদ্ধতিতে আদায় করবে ১৮৫

১৪. জুমার সালাত ১৮৭

১. জুমার সালাত বিধিবিধান করার হেকমত ১৮৭
২. জুমার দিনের ফযীলত ১৮৭
৩. জুমার দিন গোসলের বিধান ১৮৭
৪. জুমার সালাতের হুকুম ১৮৮
৫. জুমা কায়েম করার শর্তসমূহ ১৮৮
৬. জুমার সালাতের জন্য গোসল করা ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার ফযীলত ১৮৯
৭. জুমার জন্য যাওয়ার উত্তম সময় ১৯০
৮. জুমার দিন সফর করার বিধান ১৯০
৯. মাসবূক যখন জুমা পেয়েছে ধরা যাবে ১৯০
১০. ইমাম জুমার জন্য যখন আসবেন ১৯১
১১. জুমুআর 'খোৎবাহ' আরবী ভাষায় হওয়া কি অপরিহার্য ১৯১
১২. মাতৃভাষায় 'খোৎবাহ' দান ১৯১
১৩. খতিবের গুণাবলি ১৯৩
১৪. ইমাম প্রবেশ করে যা করবেন ১৯৪
১৫. খুৎবা ও সালাতের পরিমাণ ১৯৫
১৬. খুৎবার জন্য বসার পদ্ধতি ১৯৬
১৭. জুমার সালাতের পদ্ধতি ১৯৬
১৮. জুমার সালাতের সুন্নাত নামাজসমূহ ১৯৬

১৯. খুৎবা চলাকালীন কথা বলার বিধান ১৯৬
২০. শহরে জুমার নামাজ কায়েম করার বিধান ১৯৬
২১. ইমামের খুৎবারত অবস্থায় কেউ প্রবেশ করলে যা করবে ১৯৭
২২. খুৎবা চলাকালীন দোয়া করার বিধান ১৯৭
২৩. দোয়া কবুলের উত্তম সময় ১৯৭
২৪. জুমার সালাত ত্যাগ করার বিধান ১৯৭
২৫. ঈদের দিন জুমা হলে তার বিধান ১৯৮

১৫. নফল সালাত ১৯৮
১. নফল সালাত বিধি বিধান করার হেকমত ১৯৮

ক. সুন্নাতে রাতেবা ১৯৯
১. সুনানে রাতেবা ১৯৯
২. সুন্নাতে রাতেবার প্রকার ১৯৯
৩. সাধারণ নফল সালাতের বিধান ২০০
৪. সর্বাধিক তাকিদযুক্ত সুন্নাত ২০০
৫. আর কখনো কখনো এ আয়াত পাঠ করা সুন্নাত ২০১
৬. নফল সালাতের পদ্ধতি ২০২

খ. তাহাজ্জুদের সালাত ২০২
১. কিয়ামুল লাইলের বিধান ২০২
২. রাত্রির নামায তাহাজ্জুদের ফযীলত ২০৩
৩. রাত্রে দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত ২০৪
৪. রাত্রির সালাতের সূক্ষ্ম বুঝ ২০৫
৫. তাহাজ্জুদের সালাতের সময় ২০৬
৬. তাহাজ্জুদ সালাতের পদ্ধতি ২০৭

গ. বিতরের সালাত ২০৮
১. বিতরের হুকুম ২০৯
২. বিতরের সময় ২০৯
৩. সবচেয়ে কম ও বেশি বিতরের রাকায়াত সংখ্যা ২০৯
৪. বিতরের সময় ২১০
৫. বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার বিধান ২১১
৬. বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার পদ্ধতি ২১১

৭. অত:পর বিতর সালাতের শেষে বলবে ২১৪
৮. সফরে বিতর পড়ার বিধান ২১৫
৯. বিতর সালাতের কাযার পদ্ধতি ২১৬
১০. কুনূতে নাযেলা ২১৬

ঘ. তারাবীর সালাত ২১৯

১. ‘তারবিহাতুন’ এর বহুবচন ২১৯(تَرْوِيْحَةٌ)‘তারাবীহ’ আরবি শব্দ
২. তারাবীহ সালাত আদায়ের সময় ২১৯
৩. তারাবীহ সালাত আদায়ের শরঈ বিধান ২১৯
৪. তারাবীহ সালাতের রাকায়াত সংখ্যা ও জামায়াতসহ আদায় করা ২২০
৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ের তারাবীহ ২২০
৬. ওমর (রা)-এর সময়ের তারাবীহ ২২১
৭. সাহাবা ও তাবেঈদের যুগের তারাবীহ ২২২
৮. চার ইমামের মতামত ২২৩
৯. তারাবীহ সালাতের বিরতি, পঠিত দো'আ ও মুনাজাত প্রসংগ ২২৩
১০. তারাবীহ সালাতের বিবিধ মাসায়েল ২২৫
১১. তারাবীহ সালাতে কুরআন খতম করা ২২৫
১২. তারাবীর নামাজের সময় ২২৬
১৩. তারাবির সালাতের ইমামতি কে করবে ২২৭
১৪. কুরআন খতমের দোয়া পড়ার বিধান ২২৭

ঙ. দুই ঈদের সালাত ২২৭

১. নবী করীম ﷺ-এর খুৎবাসমূহ ২২৮
২. ঈদের সালাত বিধি বিধান করার হেকমত ২২৮
৩. দুই ঈদের সালাতের বিধান ২২৮
৪. দুই ঈদের সালাতের সময় ২২৮
৫. দুই ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার নিয়ম ২২৯
৬. ঈদের সালাতের স্থান ২২৯
৭. ঈদের সালাতের পদ্ধতি ২২৯
৮. ঈদের খুৎবা ২৩০
৯. ঈদের সালাতের আহকাম ২৩০
১০. ঈদের দিন তাকবীর বলার বিধান ২৩০

১১. তাকবীরের সময়সমূহ ২৩১
১২. তাকবীরের নিয়ম ২৩১
১৩. বিদ'আতি ঈদ তথা অনুষ্ঠানসমূহের হুকুম ২৩১

চ. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাত ২৩২
১. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাতের বিধান ২৩২
২. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাতের সময় জানা ২৩২
৩. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণসমূহ ২৩২
৪. সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সালাত আদায়ের পদ্ধতি ২৩২
৫. গ্রহণের খুৎবার নিয়ম ২৩৩
৬. গ্রহণের সালাতের কাযা ২৩৫
৭. গ্রহণের নির্দশনের সূক্ষ্ম বুঝ ২৩৫

ছ. সালাতুল ইস্তিসকা (বৃষ্টির জন্য সালাত) ২৩৬
১. বৃষ্টির জন্য সালাতের বিধান ২৩৬
২. বৃষ্টির সালাতের বিধি-বিধানের হেকমত ২৩৬
৩. বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের পদ্ধতি ২৩৬
৪. ইস্তিস্কার খুৎবার পদ্ধতি ২৩৮
৫. আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেয়ে বৃষ্টি চাওয়া ২৪১

জ. চাশতের বা দোহার সালাত ২৪২
১. চাশত নামাযের ওয়াক্ত ২৪২
২. চাশতের সালাতের ফযীলত ২৪২

ঝ. ইস্তেখারার সালাত কল্যাণ কামনা ২৪৩
১. ইস্তেখারার বিধান ২৪৩
২. ইস্তেখারার নিয়ম ২৪৪

ঞ. কুরআন তেলাওয়াতের সিজদা ২৪৫
১. কুরআন তেলাওয়াতের সিজদার হুকুম ২৪৫
২. কুরআনে সিজদার সংখ্যা ২৪৫
৩. তেলাওয়াতের সিজদার পদ্ধতি ২৪৬
৪. তেলাওয়াতের সিজদার ফযীলত ২৪৬
৫. শরীয়তসম্মত কৃতজ্ঞতার সিজদা ২৪৭
৬. শুকরিয়া আদায়ে জন্য সিজদার নিয়ম ২৪৭

৩. জানাজা

১. মৃত্যু ও তার বিধান

১. মানুষের অবস্থাসমূহ ২৪৮
২. মৃত্যুর সময়-সীমা ২৪৯
৩. রোগীর প্রতি যা ওয়াজিব ২৪৯
৪. যে জীবনের আশা হারিয়ে ফেলবে সে যা বলবে ২৫০
৫. মৃত্যু কামনা করার বিধান ২৫০
৬. মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির নিয়ম ২৫০
৭. মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে তালকীনের বিধান ২৫১
৮. শুভ মৃত্যুর কিছু আলামত বা লক্ষণ ২৫১
৯. মৃত্যুর সূক্ষ্ম বুঝ ২৫১
১০. মৃত্যুর আলামত ২৫২
১১. কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার সাথে যা করণীয় ২৫২
১২. মৃত্যুর সংবাদ মানুষকে জানানো ২৫৩
১৩. মুসিবতের সময় মুসিবতগ্রস্ত ব্যক্তি যা বলবে ও করবে ২৫৩
১৪. মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ইত্যাদির জন্য মৃত্যুর পর শবদেহ পরীক্ষা বিধান ২৫৪

২. মাইয়েতের গোসল

১. মাইয়েতকে যে গোসল দেবে ২৫৫
২. মাইয়েতের সুন্নতী পন্থায় গোসলের পদ্ধতি ২৫৫
৩. আগুনে পুড়ে মারা গেলে তার গোসলের বিধান ২৫৬
৪. কাফেরকে গোসল দেয়ার বিধান ২৫৬

৩. মাইয়েতের দাফন-সমাধি

১. মাইয়েতকে কাফন পরানোর পদ্ধতি ২৫৭
২. শহীদকে কাফনের পদ্ধতি ২৫৭
৩. মুহরিম ব্যক্তির কাফনের পদ্ধতি ২৫৮

৪. জানাযা নামায আদায়ের পদ্ধতি

১. জানাযার জ্ঞান ২৫৮
২. জানাযা সালাতের বিধান ২৫৮
৩. মাইয়েতের প্রতি জানাযা পড়ার পদ্ধতি ২৫৯
৪. একাধিক লাশ হলে ইমামের সামনে যেভাবে সারিবদ্ধ হবে ২৬২

৫.	জানাজার সালাতে দোয়ার পদ্ধতি	২৬২
৬.	শহীদের জানাজা পড়ার বিধান	২৬২
৭.	যার প্রতি জানাজার সালাত পড়া যাবে	২৬৩
৮.	জানাজা পড়া ও দাফন করা পর্যন্ত মৃতের সঙ্গে কবরস্থানে যাওয়ার ফযীলত	২৬৩
৯.	মাইয়েতের উপর জানাজা পড়ার স্থান	২৬৩
১০.	অনুপস্থিত মাইয়েতের জানাজা নামাজ আদায়ের বিধান	২৬৪
১১.	তাড়াতাড়ি জানাজা পড়ার বিধান	২৬৪
১২.	মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের দিকে নেয়া হয় তখন সে যা বলে	২৬৫

৫. মাইয়েতকে বহন ও দাফন করা

১.	মাইয়েতকে বহন করার পদ্ধতি	২৬৫
২.	মুসলমানদের দাফনের স্থান	২৬৫
৩.	মাইয়েতকে দাফনের পদ্ধতি	২৬৫
৪.	কবরের উপর ঘর বানানোর বিধান	২৬৬
৫.	কবরের উপর মসজিদ বানানোর বিধান	২৬৬
৬.	একাধিক লাশ দাফনের পদ্ধতি	২৬৭
৭.	কবর থেকে লাশ স্থানান্তর করার বিধান	২৬৭
৮.	কবরে লাশ নামাবে যারা	২৬৭
৯.	লাশের সঙ্গে নারীদের যাওয়ার বিধান	২৬৭
১০.	কবরকে চিহ্নিত করে রাখার বিধান	২৬৭
১১.	মুসলিম ব্যক্তির প্রয়োজনে জানাজা না দেয়া	২৬৮
১২.	লাশকে সম্মান দেখানো	২৬৮
১৩.	কবরের নিকট ওয়াজ করার বিধান	২৬৮
১৪.	লাশ দাফনের পর মুসলিম ব্যক্তি যা করবে	২৬৯
১৫.	যেসব সময়ে লাশ দাফন ও জানাজা পড়া নিষেধ	২৬৯
১৬.	কোন মুসলিম কাফেরের দেশে মারা গেলে যা করতে হবে	২৭০

৬. শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দান

১.	শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের সময়	২৭০
২.	শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধান	২৭০
৩.	শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের স্থান	২৭১
৪.	কাফেরদের জন্য শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধান	২৭১
৫.	মাইয়েতের জন্য বিলাপ করে কান্না করার বিধান	২৭১

৭. কবর জিয়ারত

১. কবর জিয়ারতের হেকমত ২৭২
২. কবর জিয়ারতের বিধান ২৭২
৩. মহিলাদের কবর জিয়ারতের বিধান ২৭২
৪. মৃতদের জন্যে দোয়া করার বিধান ২৭৩
৫. কবরস্থানে প্রবেশের সময় ও জিয়ারতের জন্য যা বলবে ২৭৩
৬. কবর জিয়ারতকারীদের প্রকার ২৭৪
৭. মুশরিকদের কবর জিয়ারতের বিধান ২৭৫
৮. মৃত্যুর পরে মাইয়েতের সঙ্গে যা যায় ২৭৫
৯. মৃতের জন্যে সৎকর্ম করা ২৭৫

৪. মুস্তাহাব সালাতসমূহ

১. তাহিয়্যাতুল ওযু ২৭৬
২. তাহিয়্যাতুল মসজিদ ২৭৬
৩. সালাতুত তাসবীহ ২৭৭
৪. সালাতুত তাসবীহ নামায আদায়ের নিয়ম ২৭৮
৫. সালাতুল ইসতিখারা ২৭৮
৬. ইসতিখারা সালাত আদায়ের নিয়ম ২৭৯
৭. সালাতুল হাজাত ২৮০
৮. আওয়াবীন সালাত ২৮১
৯. শবে বরাতের সালাত ২৮২
১০. এ রাতের করণীয় কাজ ২৮৪
১১. এ রজনীর বর্জনীয় কাজ ২৮৪
১২. লাইলাতুল কদরের সালাত ২৮৬
১৩. সে রাত কোনটি ২৮৭

৫. ক. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সালাতের আলোকে প্রচলিত ৫০টি ভুল সংশোধন

১. মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা ২৮৯
২. মুসল্লীর উচ্চস্বরে কিরায়াত, জিকির ও দো'আ পাঠ করা ২৮৯
৩. একাধিক আয়াতকে একসাথে মিলিয়ে পড়া ২৯০
৪. দাড়ানো ও বসার সময় পিঠ সোজা না করা ২৯১
৫. রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা না করা ২৯১
৬. বসা থাকলে দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভুল ২৯২

৭. সিজদায় ৭টি অঙ্গকে ঠিকমত না রাখা ২৯২
৮. কুকুরের মতো দুই উরু দাঁড় করে নিতম্বের উপর উপবিষ্ট ২৯৩
৯. প্রথম জাম'আত না পেলে দ্বিতীয় জাম'আত না করা ২৯৩
১০. সালাতের ইমামের আগে আগে কার্যপদ্ধতি আদায় করা ২৯৫
১১. দ্রুত মসজিদে যাওয়া ২৯৬
১২. কাঁচা রসুন-পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে গমন করা ২৯৮
১৩. ধুমপান করার পর মসজিদে যাওয়া ২৯৯
১৪. সালাতে এদিক-সেদিক দেখা ২৯৯
১৫. সালাতের ফরজ রোকনগুলো আদায়ে ইমামের তাড়াহুড়া ৩০০
১৬. সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকা সত্ত্বেও ৩০১
১৭. সিজদায় দুই হাত ও উরুদ্বয় একসাথে মিলানো উচিত নয় ৩০২
১৮. চাদর কিংবা জামা মাটি পর্যন্ত ঝুলানো ৩০২
১৯. বুকের উপর হাত না বাঁধা ৩০২
২০. ইকামতের পর কাতার সোজা করার জন্য না বলা ৩০৩
২১. খতমে কুরআনের অজুহাতে তারাবীর সালাতে তাড়াহুড়া করা ৩০৫
২২. বিনা প্রয়োজনে সালাতে দু'চোখ বন্ধ করা ৩০৬
২৩. প্রথম দু'রাকাত অপেক্ষা শেষ দু'রাকাতকে দীর্ঘ করা ৩০৬
২৪. টাখনু বা পায়ের ছোট গিরার নিচে কাপড় পরা ৩০৭
২৫. ইকামতের সময় সুন্নাত বা নফল সালাত পড়া ৩০৮
২৬. সালাতের মধ্যে ইশারায় সালামের জবাব না দেয়া ৩১০
২৭. সালাত কাজা হলে সাথে সাথে কাজা আদায় না করা ৩১১
২৮. ইমাম পরবর্তী রাকায়াতের জন্য উঠা সত্ত্বেও মোক্তাদীর কিছুক্ষণ বসে থাকা ৩১১
৩০. বেশি পাতলা কাপড়ে সালাত পড়া যাতে সতর দেখা যায় ৩১১
৩১. সালাতে চুল ও কাপড় গুছানো ৩১২
৩২. বাইরে সুতরাহ ব্যতীত সালাত আদায় করা ৩১২
৩৩. মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা ৩১৫
৩৪. সালাতে ভালো পোশাক না পরা ৩১৭
৩৫. ইকামতের সময় ক্বদকামাতিসসালাহ বললে এর উত্তরে ৩১৮
৩৬. ক্বদকামাতিসসালাহ বলার আগ পর্যন্ত মুক্তাদীদের না দাঁড়ানো ৩১৮
৩৭. অধিকাংশ সময় ছোট ছোট বা সংক্ষিপ্ত কেরায়াত পাঠ করা ৩১৯
৩৮. সালাতে সালাম ফিরানোর সময় মাথা নাড়ানো ৩২০
৩৯. তাসবীহর ছড়ার ব্যবহার ও আঙ্গুলে তাসবীহ পাঠ না করা ৩২১

৪০. হাই তুলে মুখ বন্ধ না করা ৩২২
৪১. আযান হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া ৩২৩
৪২. কেউ জাম'আতে শামীল হতে চাইলে নিষেধ করা ৩২৩
৪৩. সালাতে সূরার ক্রমধারা অব্যহত রাখার উপর তাকিদ দেয়া ৩২৪
৪৪. ইমামের সাথে একজন মোক্তাদী সালাতে দাঁড়ালে ইমামের একটু ৩২৪
৪৫. ইমামের সালাম ফিরানোর পর বাকি সালাত পূর্ণ করা ৩২৫
৪৬. সবাইকে নিয়ে একসাথে হাত তুলে ইমামের দোআ করা ৩২৬
৪৭. কপালে হাত রেখে মনগড়া দো'আ পাঠ ৩২৬
৪৮. আযান ও একামাতে মুহাম্মদ ﷺ এর নাম শুনে নখে ও মুখে চুমা খাওয়া ৩২৭
৪৯. পায়ের আঙ্গুলের মাথা দিয়ে কাতারে সোজা করা ৩২৮
৫০. ওমরী কাজা ৩২৮

খ. জুমুআর সালাতের প্রচলিত ৭টি ভুল সংশোধন

১. গোসল না করা ৩২৯
২. মুসল্লীদের ঘাড় টপকিয়ে সামনের কাতারে শরীক হওয়া ৩২৯
৩. জুমু'আর সময় দু'পা পেটের সাথে কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখা কিংবা হাত দিয়ে ধরে রাখা ৩২৯
৪. জুমুআর দিন দ্বিতীয় আযানের সময় তাহিয়াতুল মসজিদ সালাত না পড়া ৩৩০
৫. জুমুআর ফরজের পর অবিচ্ছিন্নভাবে সুন্নাত পড়া ৩৩০
৬. জুমু'আর খোতবার সময় কথা বলা ৩৩১
৭. খোতবার আগে সুন্নাত পড়ার সময় দেয়া ৩৩২

গ. অযু-গোসলে প্রচলিত ১৭টি ভুল সংশোধন

১. অযু করার সময় প্রকাশ্যে নিয়ত উচ্চারণ করা ৩৩৩
২. অযু-গোসলে পানির অপচয় করা ৩৩৪
৩. ভালোভাবে পরিপূর্ণ উপায়ে উত্তমরূপে অযু না করা ৩৩৫
৪. পেশাবের অপবিত্রতা থেকে না বাঁচা ৩৩৬
৫. পেশাব-পায়খানা করার সময় সতর ঢেকে না রাখা ৩৩৬
৬. পেশাব থেকে পবিত্রতার নামে বাড়াবাড়ি করা ৩৩৭
৭. পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত পড়া ৩৩৮
৮. ঘুম থেকে জেগে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত ঢুকানো ৩৩৮
৯. অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না বলে ৩৩৯
১০. গর্দার মাসেহ করা ৩৩৯
১১. যমযমের পানি দিয়ে অযু না করা ৩৩৯

১২. মাসিক সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে সালাত না পড়া ৩৪০
১৩. ওযূ করার পর কাপড়ে নাপাকী লাগলে ৩৪০
১৪. পাক হওয়া সত্ত্বেও ৪০ দিন পর্যন্ত নেফাসের মেয়াদ পূরণ করা ৩৪০
৬. কতিপয় বিদআতী নামায ৩৪১
১. মা-বাপের জন্য নামায ৩৪২
২. ঈদের রাতের নামায ৩৪২
৩. উমরী কাযা ৩৪২
৪. সালাতুল আওয়াবীন ৩৪৩
৫. এহতিয়াতী যোহর ৩৪৩
৬. সালাতুল হিফ্য ৩৪৩
মনগড়া প্রাত্যহিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াবর
৭. জুমুবার ৩৪৪
৮. মৃতের জন্য ঈসালে সওয়াবের নামায ৩৪৪
৯. রবিবারের নামায ৩৪৪
১০. সোমবারের নামায ৩৪৪
১১. মঙ্গলবারের নামায ৩৪৪
১২. বুধবারের নামায ৩৪৫
১৩. বৃহস্পতিবারের নামায ৩৪৫
মনগড়া মাসিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব
১৪. মহরম মাসের খেয়ালী নামায ৩৪৬
১৫. সফর মাসের খেয়ালী নামায ৩৪৭
১৬. রবিউল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায ৩৪৭
১৭. রবিউল-সানী মাসের বিদআতী নামায ৩৪৭
১৮. জুমাদাল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায ৩৪৭
১৯. জুমাদাস সানীর খেয়ালী নামায ৩৪৮
২০. রজব মাসের খেয়ালী নামায ৩৪৮
২১. শবে মি'রাজের নামায ৩৪৮
২২. শা'বান মাসের খেয়ালী নামায ৩৪৮
২৩. শবে বরাতের নামায ৩৪৮
২৪. রমযান মাসের খেয়ালী শবে কদরের নামায ৩৪৯
২৫. শওয়াল মাসের খেয়ালী নামায ৩৪৯
২৬. যুলক্বাদাহ মাসের খেয়ালী নামায ৩৪৯
২৭. যুলহজ্জ মাসের খেয়ালীনামা ৩৫০

১. পবিত্রতা

কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ـ

হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর ও পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমাদের শরীর অপবিত্র থাকে তাহলে (গোসল করে) পাক পবিত্র হও। আর যদি তোমরা অসুস্থ থাক অথবা সফরে থাক, কিংবা পায়খানা থেকে ফিরে আস, অথবা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করে থাক অতঃপর (গোসল বা অযুর জন্য) পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নিও। অর্থাৎ (পবিত্র মাটিতে হাত মেরে) নিজেদের চেহারা ও হাতগুলোকে মাসেহ করে নাও। (সূরা মায়িদা : আয়াত-৬)

নামায কবুল হওয়ার জন্য যেরূপ বিশুদ্ধ ঈমান এবং হৃদয়কে শির্কী ও কুফরী ধারণা ও বিশ্বাস থেকে পবিত্র রাখা আবশ্যকীয় শর্ত, তদ্রূপ নামাযীর বাহ্যিক দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে পবিত্র রাখাও এক আবশ্যকীয় শর্ত। যেহেতু নামাযের চাবিকাঠিই হলো পবিত্রতা। (সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, সুনান, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১২)

তাছাড়া এ পবিত্রতা হলো অর্ধেক ঈমান। (বিশেষ করে পানি দ্বারা অর্জিত) পবিত্রতায় মনোযোগ বৃদ্ধি হয়, দূর হয় অলস, তন্দ্রা ও নিদ্রা, স্ফূর্তির সাথে ইবাদতে অধিক মন বসে।

মযী বা মলমূত্র থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বা (যথেষ্ট পানি না পাওয়া গেলে) মাটির ঢিলা ব্যবহার করে তা দূর করা এবং ওযু করাই যথেষ্ট। অবশ্য কোন ধরনের মৈথুন দ্বারা বা স্বপ্নে অথবা যৌনচিন্তায় উত্তেজনা ও তৃপ্তির সাথে বীর্যপাত করলে বা হলে গোসল ফরয। যেমন সঙ্গমে যোনীপথে লিঙ্গাগ্র প্রবেশ করিয়ে বীর্যপাত না করলেও গোসল ফরয। (সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-৪৩০)

অনুরূপ নারীদের হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যও গোসল ফরয।

ওযু ও গোসলের জন্য ব্যবহার্য পানিও পবিত্র তথা পবিত্রকারী হওয়া আবশ্যক। সাধারণত : পুকুর, নদী, নালা, সমুদ্র, প্রভৃতির পানি পবিত্র ও পবিত্রকারী। যে পানিতে পবিত্র কোন জিনিস– যেমন আটা, সাবান, জাফরান ইত্যাদি মিশ্রিত হয়, সে পানির রং, গন্ধ বা স্বাদ পরিবর্তন না হলে তাতে ওযু-গোসল চলবে।

পানিতে কোনো অপবিত্র জিনিস পড়ে যাওয়ার ফলে তার রং, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তা নাপাক গণ্য হবে। পরিবর্তন না হলেও যদি পানি ২ কুল্লাহ (প্রায় ২৭০ লিটার, মতান্তরে ১৯১ থেকে ২০০ কেজি) এর চেয়ে কম হয়, তাহলেও তা নাপাক। এর অধিক হলে সে পানি পবিত্র। তাতে ওযু-গোসল চলবে। (আহমদ, সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সুনান, ইবনে মাজাহ, দারেমী, সুনান, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৭৭)

যে পানি একবার ওযু-গোসলে ব্যবহার হয়েছে, সে পানি পাক এবং এই পানি দ্বারা আবারো পবিত্রতা অর্জন করা যায় অর্থাৎ তার দ্বারা ওযু ও গোসল বৈধ হবে। (দেখুন সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ পৃষ্ঠা-০৪)

মানুষ, গাধা, খচ্চর, হালাল পশু, বিড়াল প্রভৃতির ঘোলা পানি পবিত্র; তাতে ওযু-গোসল জায়েয। অবশ্য শূকর ও কুকুরের ঘোলা পানি নাপাক। যদি পানি দুকুল্লাহর কম হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু ৩৩-৩৭ পৃ:)

১. গোসল করার নিয়ম

নাপাকী ব্যক্তির গোসল করতে হলে গোসলের নিয়ত করে প্রথমে ৩ বার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। অতঃপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে শরীরের নাপাকী ধৌত করে ফেলবে। তারপর বাম হাতকে মাটি অথবা সাবান দ্বারা ধৌত করে নামাযের জন্য ওযু করার মতো পূর্ণ ওযু করবে। অবশ্য গোসলের জায়গা পরিষ্কার না হলে পা দুটি গোসল শেষে ধৌত করে নেবে। ওযুর পর ৩ বার মাথায় পানি ঢেলে ভালো করে চুলগুলোকে হাতের আঙ্গুল দ্বারা খেলাল করবে, যাতে সমস্ত চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর গোটা দেহে প্রয়োজনীয় পানি ঢেলে উত্তমরূপে ধৌত করে নেবে।

মহিলাদের গোসলও পুরুষদের অনুরূপ। অবশ্য নারীর মাথার চুলে বেণী বাঁধা (চুটি গাঁথা) থাকলে তা খোলা আবশ্যক নয়। তবে ৩ বার পানি নিয়ে চুলের গোড়া অবশ্যই ধৌত করে নিতে হবে। (বুখারী মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩৮)

মাসিক, নিফাস, (সন্তান প্রসবে রক্ত প্রবাহ অবস্থা) অথবা বীর্যপাত বা সঙ্গমজনিত নাপাকী ও জুমু'আ বা ঈদের গোসল নিয়ত হলে একবারই যথেষ্ট। আলাদা আলাদা গোসলের প্রয়োজন নেই। (ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু- ৬০)

জানাবাতের (বীর্যপাত বা সঙ্গমজনীত যে নাপাকী) গোসলের পর অথবা যে গোসলের পূর্বে ওযু করা হয়। সেই গোসলের পরে নামাযের জন্য আর আলাদাভাবে ওযুর প্রয়োজন নেই। গোসলের পর ওযু ভাঙ্গার কোনো কাজ না করলে গোসলের ওযুতেই নামায হয়ে যাবে।

(সুনানে আবু দাউদ তিরমিযী নাসাঈ, সুনানে, ইবনে মাজাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৪৫)

অসুস্থতার কারণে যদি কারো লাগাতার বীর্যপাত যারই থাকে তবে তার জন্য সাধ্য অনুসারে গোসল ফরয; নচেৎ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযুই যথেষ্ট। এ সকল অবস্থাতেও নামায ক্ষমাযোগ্য নয়। কারো যদি ইস্তিহাযার (ঋতুস্রাবের পরেও যে রক্ত প্রবাহিত থাকে) অসুখ থাকে তাহলে তার জন্য উত্তম হলো সাধ্য অনুসারে গোসল করবে। নচেৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য শুধু ওযুই যথেষ্ট। নামাযকালীন অবস্থায় লজ্জাস্থানে পট্টি দিয়ে রক্ত প্রবাহ বন্ধ রাখবে। (সহীহ আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত-৪৪৫)

জ্ঞাতব্য বিষয় যে, পবিত্রতা অর্জনের জন্য কেবল গা-ধৌত করা বা গা ডুবিয়ে নেয়া যথেষ্ট নয়। পূর্বে ওযু করে যথানিয়মে গোসল করলে তাতেই পূর্ণ গোসল তথা পবিত্রতা অর্জন হয়। (শারহে ফিকহ, ইবনে উষাই ১/৩০৪)

২. ওযু ও তার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-

অর্থ : হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে। আর পা দু'টিকে টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে। (সূরা আল-মায়িদাহ ৫/৬)

কাজেই বড় নাপাকী না থাকার ফলে গোসলের প্রয়োজন না হলেও নামাযের জন্য ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে ওযু ফরয। এ বিষয়ে মহানবী ﷺও বলেন : "ওযু নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় ওযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ কারো নামায কবুল করেন না।"

ওযুর মাহাত্ম্য ও ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে ডাকা হবে; আর সে সময় ওযুর ফলে তাদের মুখমণ্ডল ও হাত-পা দীপ্তিময় থাকবে।

(সহীহুল বুখারী-১৩৬, সহীহ মুসলিম-২৪৬)

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, "ওযুর পানি যে পরিমাণ স্থানে পৌঁছবে সে পরিমাণ মু'মিনের অঙ্গে অলঙ্কার (জ্যোতি) শোভমান হবে।" (সহীহ মুসলিম ২৫০)

তিনি আরো বলেন, "মুসলিম বা মুমিন বান্দা যখন ওযুর উদ্দেশ্যে তার চেহারা ধৌত করে তখন ওযুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রতিটি পাপ বের হয়ে যায় যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার হাত দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রতিটি পাপ বের হয়ে যায় সে উত্তম হাতে ধারণ করার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রতিটি সে গুনাহ বের হয়ে যায় যা সে তার দুপায়ে চলার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। শেষ অবধি যাবতীয় পাপরাশি থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৪)

৩. ওযু করার নিয়ম

১. নামাযী ব্যক্তি প্রথমে মনে মনে ওযুর নিয়ত করবে। কারণ নিয়ত ব্যতীত কোন কর্মই শুদ্ধ হয় না। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ-১)

২. 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযু আরম্ভ করবে। কারণ শুরুতে তা না বললে ওযু হয় না। (সহীহ আবূ দাউদ, সুনান ৯২)

৩. তিনবার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে। হাতে ঘড়ি, চুড়ি, আংটি প্রভৃতি থাকলে তা নাড়াচাড়া করে তার ভেতরে পানি পৌঁছাবে। আঙ্গুল দিয়ে আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল করবে। এরপর পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে পানি নিতে পারে। (সহীহ আবূ দাউদ, বুখারী, মুসলিম-৩৯৪)

৪. তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে ৩ বার কুলি করবে সাথে সাথে অর্ধেক পানি নিয়ে নাকের গোড়ায় লাগিয়ে টেনে নিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বে। অবশ্য রোযা অবস্থায় থাকলে সাবধানে নাকে পানি টানবে, যাতে গলার নিচে পানি না চলে যায়।

৫. অতঃপর চেহারা (এক কান থেকে অপর কানের মধ্যবর্তী এবং কপালের চুলের গোড়া থেকে দাঁড়ির নিচের অংশ পর্যন্ত অঙ্গ) ৩ বার পানি দ্বারা দুই হাত দ্বারা ধৌত করবে। কপালে টিপ (?) থাকলে তা খুলে (কপাল) ধৌত করতে হবে। নচেৎ ওযু আদায় হবে না। (মিশকাত, হাদীস-৪০৫, ৪১০, তিরমিযী, নাসায়ী-৮৯)

৬. অতঃপর প্রথমে ডান হাতের আঙ্গুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত এবং তদনুরূপ বাম হাতও ৩ বার (প্রত্যেক বারে পুরো হাতে পানি ফিরিয়ে রগড়ে) ধৌত করবে। তবে ওযুর এই অঙ্গসমূহকে পূর্ণমাত্রায় পানি দ্বারা ধৌত করার স্বার্থে দুই বার অথবা এক বার করে ওযুর অঙ্গসমূহ ধুলেও ওযু হয়ে যাবে।

৭. অতঃপর একবার মাথা মাসেহ করবে; নতুন পানি দ্বারা দুই হাতকে ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলোকে মুখোমুখি করে মাথার সামনের দিক (যেখান থেকে চুল গজানো শুরু হয়েছে সেখান) থেকে পিছন দিক (ঘাড়ে যেখানে চুল শেষ হয়েছে সেখান) পর্যন্ত স্পর্শ করে পুনরায় সামনের দিক নিয়ে এসে শুরুর স্থান পর্যন্ত পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে। মাথায় পাগড়ি থাকলে তা না খুলে তার উপরে মাসেহ করলেও যথেষ্ট হবে। (সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৯৯ নং)

৮. অতঃপর আর নতুন পানি না নিয়ে ঐ হাতেই দুই কান মাসেহ করবে; শাহাদতের (তর্জনী) দুই আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ভিতর দিক এবং দুই বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের পিঠ ও বাহির দিক মাসেহ করবে।

(সহীহ আবু দাউদ, সুনান ৯৯-১২৫নং)

৯ অতঃপর প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা টাখনু পর্যন্ত ৩ বার ভালভাবে ধৌত করবে। হাতের আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল ভালভাবে ধৌত করবে। (সুনানে আবু দাউদ তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪০৭)

রাসূলে করীম ﷺ বলেন, "পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু কর, আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল কর আর রোযা না থাকলে নাকে খুব ভালোরূপে পানি চড়াও। (তারপর তা ঝেড়ে ফেলে ভালোভাবে নাক পরিষ্কার কর।)

১০. এরপর হাতে পানি নিয়ে কাপড়ের উপর থেকে লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেবে। বিশেষ করে পেশাব করার পর ওযু করলে এ আমল অধিকরূপে ব্যবহার্য। যেহেতু পেশাব করে পবিত্রতা অর্জনের পর দু-এক কাতরা পেশাব বের হওয়ার সন্দেহ থাকে। সুতরাং পানি ছিটিয়ে দিলে ঐ সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

(সহীহ আবূ দাউদ, সুনান ১৫২-১৫৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৭৪-৩৭৬)

এই আমল খোদ জিবরাঈল (আ) মহানবী ﷺ-কে শিক্ষা দিয়েছেন।

(ইবনে মাজাহ, মুসনাদ আহমদ, আলবানী ৮৪১)

৪. ওযুর শেষে দুআ

রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউই পরিপূর্ণরূপে ওযু করার পর (নিম্নের যিক্‌র) পড়ে তার জন্যই জান্নাতের আটটি দরজা খোলা হয়; যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

'আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অরাসূলুহ।"

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। (সহীহ মুসলিম ২৩৪ নং আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

তিরমিযীর বর্ণনায় এ দুআর শেষে নিম্নের অংশটিও যুক্ত আছে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবীনা, অজআলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভূক্ত কর।

(তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ২৮৯ নং)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

উচ্চারণ : "সুবহানাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আন লা ইলা-হা ইল্লাহ আন্তা, আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইকা।"

অর্থাৎ, তোমার সুপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি। (সহীহ ত্বাবারানী হাদীস-২১৮)

এ ছাড়া প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথকভাবে প্রচলিত নির্দিষ্ট দুআ অথবা শেষে 'ইন্না আনযালনা' পড়া বিদ'আত।

৫. ওযুর আনুষঙ্গিক মাসায়েল

ওযুর অঙ্গগুলোকে কমপক্ষে ১ বার করে পূর্ণ সিক্ত করতঃ ধৌত করা আবশ্যক। ২ বার করে ধৌত করলেও চলে। তবে ৩ বার করে ধৌত করাই উত্তম। এরই ওপরে আল্লাহর রাসূল ﷺ তথা সাহাবায়ে কেরামের আমল বেশি। কিন্তু তিনবারের অধিক ধৌত করা অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা।

(সহীহ আবু দাউদ, সুনান ১০৯ সহীহ তিরমিযী ৪৩ নং)

ওযুর কোন অঙ্গ ২ বার এবং কোন অঙ্গ ৩ বার ধৌত করা দোষণীয় নয়।

(সহীহ আবূ দাউদ, সুনান ১০৯, সহীহ তিরমিযী ৪৩)

জোড়া অঙ্গগুলোর ডান অঙ্গকে প্রথমে ধৌত করা রাসূল ﷺ এর নির্দেশ। তিনি ওযু, গোসল, মাথা আঁচড়ানো, জুতো পরা প্রভৃতি সকল কাজের সময় ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। (সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪০০)

ওযুর অঙ্গগুলো-বিশেষ করে হাত ও পা-রগড়ে ধোয়া উত্তম। রাসূল ﷺ-এর এরূপই আমল ছিল। (সহীহ নাসাঈ সুনান ৭২, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪০৭)

অঙ্গসমূহ এমনভাবে ধৌত করতে হবে যাতে ওযুর কোনো অঙ্গের সামান্যতম স্থানও শুকনো থেকে না যায়। ওযুর অঙ্গে কোন ধরনের পানিরোধক বস্তু (যেমন অলংকার, ঘড়ি, টিপ ইত্যাদি) থাকলে তা অবশ্যই দূর করে নিতে হবে। যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ একদা কতক লোকের শুকনো গোড়ালি দেখে বলেছিলেন, 'গোড়ালিগুলোর জন্য জাহান্নামে ধ্বংস ও সর্বনাশ রয়েছে। তোমরা ভালোরূপে (সকল অঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে) ধৌত করে ওযু কর। (সহীহ আবূ দাউদ, সুনান ১৫৮ নং)

এক ব্যক্তি ওযু করার পর মহানবী ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে দেখলেন, তার দুই পায়ে নখ পরিমাণ স্থান শুকনো রয়েছে। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি ফিরে গিয়ে ভালোরূপে ওযু করে এস। (সহীহ আবূ দাউদ, সুনান ১৫৮)

এক ব্যক্তিকে তিনি দেখলেন নামায পড়ছে, আর তার এক পায়ের পিঠে এক দিরহাম বরাবর স্থান শুষ্ক রয়েছে, যাতে সে পানিই পৌঁছায়নি। তিনি তাকে পুনরায় ওযু করে নতুনভাবে নামায আদায়ের আদেশ দিলেন।

(সহীহ সুনানে আবূ দাউদ-১৬১)

ওযু করার সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে একটানা অঙ্গগুলোকে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ধৌত করতে হবে। মাঝে বিরতি দেয়া নাজায়েয। কাজেই কেউ মাথা বা কান মাসেহ না করে ভুলে পা ধৌত করে ফেললে এবং সত্বর মনে পড়লে, সে মাসেহ করে পুনরায় পা ধৌত করবে। বহু পরে মনে পড়লে পুনরায় নতুন করে ওযু করবে।

কেউ যদি ওযু আরম্ভ করার পর পোশাকে নাপাকী দেখে এবং তা সাফ করতে করতে পূর্বেকার ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়, তাহলে তাকে পুনঃ ওযু করতে হবে। অনুরূপভাবে যদি ওযু সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে নিরবচ্ছিন্নতা কেটে যায় ও পূর্বেকার ধোয়া অঙ্গ শুকিয়ে যায়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে শুরু করে ওযু করতে হবে।

ওযু করার সময় বাঁধানো দাঁত খোলা বা খেলাল করে দাঁতের ফাঁক থেকে লেগে থাকা খাদ্যাংশ বের করা আবশ্যক নয়। (ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ১/২৮৩, ফম: ১/২১০)

একই পাত্র হতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সাথে অথবা স্ত্রী আগে ও স্বামী পরে অথবা তার বিপরীতভাবে ওযু-গোসল করায় কোন ক্ষতি বা বাধা নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ তথা সাহাবাগণ এরূপ আমল করেছেন।

(সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৩৫৭-৩৫৮)

ঠাণ্ডার কারণে গরম পানিতে ওযু-গোসল করায় কোনো বাধা নেই। উমর (রা) এরূপ করতেন। (সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪১৮নং)

পানির সংকট থাকলে অথবা অধিক পানি ব্যয়ে অর্থ অপচয় হলে ওযু-গোসলের জন্য পরিমিত পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। অধিক পানি খরচ করা অতিরঞ্জনের শামিল; যদি তা অন্যদের জন্য পানির সংকট সৃষ্টি করে আর তা নাজায়েয। মহানবী ১ মুদ্দ (কমপক্ষে বেশি ৬২৫ গ্রাম) পানিতে ওযু এবং ১ সা' থেকে ৫ মুদ্দ (কম-বেশি ২৫০০ থেকে ৩১২৫ গ্রাম) পানিতে গোসল করতেন। কেননা সে সময় পানির চরম সংকট ছিল কাজেই যারা ট্যাংকের সীমাবদ্ধ পানিতে ওযু-গোসল করেন, তাঁদেরকে সতর্ক হওয়া উচিত।

ওযুর শেষে ওযুর পানি অঙ্গ থেকে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা দোষণীয় নয়। মহানবী ওযুর পর নিজের জুব্বায় নিজের মুখমণ্ডল মুছেছিলেন। ওযূর পর পানি মুছার জন্য তাঁর একটি বস্ত্রখণ্ড ছিল।

(তিরমিযী হাকেম, মুস্তাদরাক সহীহুল জামে ৪৮৩০)

ওযূর পর দুই রাকআত নামাযের বড় ফযীলত রয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেন, 'যে কোনো ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে (কায়মনো বাক্যে) দুই রাকআত নামায আদায় করে তখনই তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।' (সহীহ মুসলিম ২৩৪ নং আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে, কোনো ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায আদায় করে সেই ব্যক্তির পূর্বেকার যাবতীয় পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।' (আবু দাউদ, সহীহ তাবগীব ২২১)

ওযুর পরে নামায আদায়ের ফলেই নবী করীম জান্নাতে তাঁর সবার আগে বিলালের জুতোর শব্দ শুনেছিলেন।

প্রিয় নবী প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু করতেন। তবে সাহাবাগণ না ভাঙ্গা পর্যন্ত একই ওযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়তেন।

অবশ্য মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম এক ওযুতেই পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করেছিলেন।

সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকা এবং ওযু ভাঙ্গলে সাথে সাথে ওযু করে নেয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল বলেন, জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। আর মুমিন ছাড়া কেউই ওযুর সংরক্ষণ করবে না।"

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা সকালে আল্লাহর রাসূল ﷺ বিলালকে ডেকে বললেন, হে বিলাল! কি এমন কাজ করে তুমি জান্নাতে আমার আগে চলে গেলে? আমি গত রাত্রে (স্বপ্নে) জান্নাতে গেলে তোমার (জুতার) শব্দ আমার সামনে থেকে শুনতে পেলাম। বিলাল বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, এ কাজের জন্যই। (জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার শব্দ শুনলাম। (ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ১৯৪)

৬. রোগীর পবিত্রতা ও ওযু-গোসল

রোগী গোসল করতে সক্ষম হলে তার প্রতি গোসল ওয়াজিব তেমনিভাবে ওযুর করতে সক্ষম হলে নামাযের জন্য ওযু করাও ওয়াজি।

ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করায় ক্ষতির সম্ভাবনা হলে রোগী গরম পানি ব্যবহার করবে। পানি ব্যবহারের একেবারেই অসমর্থ হলে বা রোগ-বৃদ্ধি অথবা আরোগ্য লাভে বিলম্বের আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করবে।

রোগী নিজে ওযু বা তায়াম্মুম করতে না পারলে অন্য কেউ করিয়ে দেবে।

ওযুর কোন অঙ্গে ক্ষত থাকলেও তা ধৌত করতে হবে। অবশ্য পানি লাগলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে হাত ভিজিয়ে তার উপর বুলিয়ে মাসেহ্ করবে।

ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধা বা প্লাস্টার করা থাকলে অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করে পট্টির উপর মাসেহ্ করবে।

রোগীর জন্যও দেহ, লেবাস ও নামায পড়ার স্থানের সর্বপ্রকার পবিত্রতা আবশ্যক। কিন্তু অপবিত্রতা দূর করতে না পারলে যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থাতেই তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

কোন নামাযকে তার যথা সময় থেকে পিছিয়ে দেয়া (যেমন ফজরকে যোহরের সময় পর্যন্ত দেরী করা) রোগীর জন্যও নাজায়েয। যথা সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে অথবা (অক্ষম হলে) না করেই নামাযের যথা সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই নামায অবশ্যই পড়ে নেবে। নচেৎ পাপী হবে।

কেবলমাত্র মাথা ধৌত করলে অসুখ হওয়ার বা বৃদ্ধির ভয় হলে অবশিষ্ট শরীর ধৌত করে মাথায় মাসাহ্ করবে।

সর্বদা প্রস্রাব ঝরলে অথবা বাতকর্ম হলে অথবা নারীদের সাদা স্রাব ঝরলে প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু আবশ্যক।

নামাযের সময় হলে যদি কাপড়ে নাপাকী লেগে থাকে, তবে নামাযী তা পরিবর্তন করে লজ্জাস্থান ধৌত করে ওযু করবে। নামাযের সময় যাতে নাপাকী অন্যান্য অঙ্গে বা কাপড়ে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য লজ্জাস্থানে বিশেষ পোশাক, ল্যাঙ্গট বা পট্টি ব্যবহার করবে।

গোসল করলে রোগ-বৃদ্ধি হবে এবং ওযু করলে ক্ষতি হবে না বুঝালে তায়াম্মুম করে ওযু করবে।

৭. ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

১. পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু (পেশাব, পায়খানা, বীর্য, মযী, হাওয়া, রক্ত, কৃমি, পাথর প্রভৃতি) বের হলে ওযু ভেঙ্গে যায়।

তদনুরূপ দেহের অন্যান্য অঙ্গ থেকে (যেমন অপারেশন করে পেট থেকে পাইপের মাধ্যমে) অপবিত্র (বিশেষ করে পেশাব-পায়খানা) বের হলেও ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।

২. যাতে গোসল ওয়াজেব হয়, তাতে ওযুও নষ্ট হয়।

৩. কোন প্রকারে বেঁহুশ বা জ্ঞানশূন্য হলে ওযু নষ্ট হয়।

৪. শুয়ে কিংবা কোনো কিছুর উপর ভর না দিয়ে নিজ আসনে তন্দ্রা বা ঘুম আসলে ও সেই ঘুম গাঢ় হলেও ওযু নষ্ট হবে না। সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম (সা)-এর যুগে এশার নামাযের জন্য তাঁর অপেক্ষা করতে করতে অনেকেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যান এমনকি নাক ডেকে নিজ আসনে ঘুমাতে থাকেন। অতঃপর তিনি এলে তারা নামায আদায় করেন কিন্তু নতুন করে তারা ওযু করেননি। অথবা নবী (সা) তাদের নতুনভাবে ওযু করার হুকুম দেননি। (সহীহ মুসলিম ৩৭৬, আবূ দাউদ, সুনান ১৯৯-২০১)

৫. পেশাব অথবা পায়খানা-রাস্তা সরাসরি স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়। (কাপড়ের উপর থেকে হাত দিলে নষ্ট হয় না।) মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিনা পর্দায় ও অন্তরালে নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তার ওপর ওযু ওয়াজিব হয়ে যায়। (সহীহুল জামে-৩৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী-১২৩৫)

হাতের কব্জির উপরের অংশ দ্বারা স্পর্শ হলে ওযু ভাঙ্গবে না।

৬. উটের গোশত খেলে ওযু ভেঙ্গে যায় কি-না এই মর্মে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কেও হাদীসে উটের গোশত খেলে ওযু করার যে বিবরণ এসেছে সেই ওযু থেকে আভিধানিক ওযু (হাত, মুখ পরিষ্কার করে নেয়া) অথবা পারিভাষিক ওযু (নামাযের জন্য যে ওযু) উভয় উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে ওযু করে নেয়াই উত্তম হবে। (সহীহ মুসলিম ৩৬০)

৮. যাতে ওযু নষ্ট হয় না

১. স্ত্রীর শরীরে স্পর্শ করলে ওযু ভাঙ্গে না। কারণ, রাসূল ﷺ রাত্রে নামায আদায় করতেন, আর মা আয়েশা (রা) তাঁর সম্মুখে পা মেলে শুয়ে থাকতেন। যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন তাঁর পায়ে স্পর্শ করে পা সরিয়ে নিতে বলতেন। এতে তিনি নিজের পা দু'টিকে গুটিয়ে নিতেন।

(বুখারী, হাদীস-৫১৩, মুসলিম, হাদীস-৫১২)

তিনি আয়েশা (রা) কে চুম্বন দিতেন। তারপর ওযু না করে নামায পড়তে বেরিয়ে যেতেন। অবশ্য স্পর্শ বা চুম্বনে মযী বের হলে তা ধৌত করে ওযু করা আবশ্যক। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস-১৭৮-১৭৯, নাসায়ী, হাদীস-১৭০)

২. **হো-হো করে হাসলে :** এ প্রসঙ্গের হাদীসটি দলীলের যোগ্য নয়। তাই হাসলে ওযু ভাঙ্গে না। (ফিকহুস সুন্নাহ)

৩. **বমি করলে :** একদা রাসূল ﷺ বমি করলে রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর তিনি ওযু করলেন। এ হাদীসে তাঁর কর্মের পরস্পর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বমি করলেন বলে ওযু ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই তিনি ওযু করেছিলেন তা প্রমাণ হয় না। (ইবনে উসাইমীন, হাদীস-১/২২৪-২২৫)

৪. **টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলালে :** টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো কাবীরা গুনাহ্। কিয়ামতে আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি তার পরনের কাপড় পায়ের টাখনুর নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে। (বুখারী) কিন্তু এর ফলে ওযু ভাঙ্গে না। এক ব্যক্তি ঐরূপ কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়লে মহানবী ﷺ তাকে পুনরায় ওযু করে নামায আদায় করতে আদেশ দিয়েছিলেন বলে যে হাদীস আবু দাউদ বর্ণিত হয়েছে, তা যয়ীফ এবং দলীলের যোগ্য নয়। (যঈফ ইবনে মাজা-২৫২)

৫. **নাক থেকে রক্ত পড়লে :** এতে ওযু নষ্ট হয় বলে হাদীস ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে, তা দুর্বল। (যঈফ ইবনু মাজাহ-২৫২,যঈফ জামেউস সগীর-৫৪২৬)

৬. **শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে রক্ত পড়লে, দাঁত থেকে রক্ত ঝরলে, তীরবিদ্ধ হয়ে রক্ত পড়লে :** যা -তুর রিকা' যুদ্ধে নবী করীম ﷺ হাজির ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত হলেও সে রুকু সিজদা করে নামায আদায় করেছিল। হাসান বাসরী (রা) বলেন, মুসলিমরা এ যাবৎ তাদের রক্তাক্ত ক্ষত নিয়েই নামায পড়ে আসছে। ইবনে উমর (রা) একটি ফুসকুরি গেলে দিলে তা থেকে রক্ত বের হল। কিন্তু তিনি ওযু করলেন না। ইবনে আবী আওফা রক্তমাখা থুথু ফেললেন। অতঃপর তিনি তাঁর নামায আদায় করলেন। ইবনে উমর ও হাসান বলেন, কেউ শিঙ্গা লাগিয়ে বদ-রক্ত বের করলে কেবল ঐ জায়গাটা ধুয়ে নেবে। এ ছাড়া ওযু-গোসল নেই। (ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, হাদীস১/৩৩৬)

পূর্বোক্ত তীরবিদ্ধ লোকটি ছিল একজন আনসারী। তার সঙ্গী একবার মুহাজেরী তার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বলল, সুবহানাল্লাহ! (তিন তিনটে তীর মেরেছে?) প্রথম তীর মারলে তুমি আমাকে জাগিয়ে দাওনি কেন?' আনসারী বলল, আমি এমন একটি সূরা পড়েছিলাম, যা সম্পূর্ণ না করে ছেড়ে দিতে পছন্দ করিনি। (সহীহ আবু দাউদ, হাদীস-১৯৮)

৭. **মুর্দা গোসল দিলে :** মহানবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দিবে, সে যেন নিজে গোসল করে নেয়। আর যে ব্যক্তি জানাযা বহন করবে, সে যেন ওযু করে নেয়। কিন্তু এ নির্দেশটি মুস্তাহাব। অর্থাৎ, না করলেও চলে। তবে করা উত্তম। কারণ, গোসলদাতার শরীরে নাপাকী লেগে যাওয়ার সন্দেহ থাকে তাই। তাই তো অন্য বর্ণনায় আছে; তিনি বলেন, মুর্দাকে গোসল দিলে তোমাদের জন্য গোসল করা আবশ্যক নয়। কারণ তোমাদের মুর্দা তো আর নাপাক নয়। অতএব তোমাদের হাত ধৌত করে নেয়াই যথেষ্ট। (হাকেম, মুস্তাদরাক ১/৩৮৬, বায়হাকী ৩/৩৯৮)

উমর (রা) বলেন, আমরা মৃতব্যক্তিকে গোসল দিতাম। তাতে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গোসল করে নিত। আবার অনেকে করত না। অবশ্য মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় তার লজ্জাস্থানে হাত লেগে থাকলে ওযু অবশ্যই নষ্ট হবে। আর জানাযা বহন করাতে ওযু নষ্ট হয় না।

(জাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ, হাদীস-২৬/৯৬)

৮. মৃতদেহের পোস্টমর্টেম [illegible]

৯. ওযু করে মায়েরা যদি তাদের শিশুর পেশাব বা পায়খানা পরিষ্কার করে, তবে তা হাতে লাগলেও ওযু ভাঙ্গে না। অবশ্য পায়খানাদ্বার বা পেশাবদ্বার ধৌত করার সময় কোন দ্বারে হাত লাগলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়।

১০. ওযু করার পর ধূমপান করলে ওযু নষ্ট হয় না। তবে ধূমপান করা অবশ্যই হারাম। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ, হাদীস-১৮/৯২-৯৩)

১১. কোলন, কোহল বা স্পিরিট-মিশ্রিত আতর বা সেন্ট ব্যবহার করলে ওযুর কোন ক্ষতি হয় না। তবে তা ব্যবহার নাজায়েয।

১৩. চুল, নখ ইত্যাদি পরিষ্কার করলে ওযু ভাঙ্গে না। তদানুরূপ অশ্লীল কথা বললে, হাঁটুর উপর কাপড় উঠে এলে, নারীর মাথা খুলে গেলে, কাউকে বা নিজেকে উলঙ্গ দেখলে ওযু নষ্ট হয় না। দুধ পান করলে নামাযের পূর্বে কুল্লি করা মুস্তাহাব। (বুখারী, হাদীস-২১১; মুসলিম, হাদীস-৩৫৮)

৯. যে সব কাজের জন্য ওযু শর্ত কিংবা মুস্তাহাব

নামায আদায়ের জন্য, এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ করার জন্য ওযু করা আবশ্যক। এ ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকর বা না দেখে কুরআন তিলাওয়াত ও কৃতজ্ঞতার সিজদা, আযান, সাফা-মারওয়ার সাঈ, বিভিন্ন খোতবা পাঠ ইত্যাদির সময় ওযু করা মুস্তাহাব।

১০. মোজার উপর মাসেহ

চামড়া বা কাপড়ের (সূতি বা [illegible]ইলনের) মোজার উপর মাসেহ বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবী [illegible]রীর [illegible]বা) (যিনি ওযুর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি বলে[illegible] 'আমি দেখেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ পেশাব করার পর ওযু করলেন এব[illegible]জের (চামড়ার) মোজার উপর মাসেহ করলেন।' (সহীহ মু[illegible] ১৭[illegible]

মুগীরাহ ইব[illegible] [illegible] (রা) [illegible] [illegible]. তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ওযুর প[illegible]। সূ[illegible] [illegible] [illegible]সেহ করেছেন।

[illegible] [illegible] মাহমদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫২৩ নং)

১১. মাসেহের শর্তাবলী

মোজা মাসেহের জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে–

১. পূর্ণরূপে ওযু করার পর মোজা পরতে হবে। ওযু অবস্থায় মোজা না পরে, তার উপর মাসেহ চলবে না।

সাহাবী মুগীরাহ (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি ওযু করছিলেন। আমি তাঁর মোজা দু'টি খুলে নিতে ঝুঁকালাম। তিনি বললেন, "ছাড়ো, আমি ও দু'টিকে ওযু অবস্থায় পরেছি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস-২৭৪)

২. মোজা দু'টি যেন পবিত্র হয়। অর্থাৎ, তাতে যেন কোনো ধরনের নাপাকী লেগে না থাকে।

৩. এ মাসেহ যেন সেই পবিত্রতা অর্জনের সময় হয়, যার জন্য কেবল ওযু আবশ্যক হয়। কারণ, যার জন্য গোসল আবশ্যক হয়, সেই পবিত্রতা অর্জনের সময় মোজা খুলে দিয়ে পা ধৌত করা আবশ্যক। (তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ, মিশকাত হাদীস-৫২০)

৪. মাসেহ যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হয়। অর্থাৎ নিজ এলাকার বাইরে গমনকারীদের জন্য ৩ দিন ৩ রাত ও নিজ এলাকায় অবস্থানকারীদের জন্য ১ দিন ১ রাত সময়সীমা নির্ধারিত। (উসাইমীন, ফাতাওয়া হাদীস-৩)

১২. মাসেহের সময়কাল

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসাফিরের জন্য ৩ দিন এবং গৃহবাসীর জন ১ দিন মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা নির্ধারিত করেছেন। (সহীহ মুসলিম-২৭৬)

এ নির্দিষ্ট সময় আরম্ভ হবে, ওযু করে মোজা পরে ঐ ওযু ভাঙ্গলে তার পরের ওযু করার সময় তার তার উপর মাসেহ করার পর থেকে। অতএব প্রথম মাসেহ থেকে ২৪ ঘণ্টা গৃহবাসীর জন্য এবং ৭২ ঘণ্টা মুসাফিরের জন্য মাসেহ করা বৈধ হবে। কাজেই যদি কেউ মঙ্গলবারের ফজরের নামাযের জন্য ওযু করার সময় মোজা পরে, তারপর ঐ ওযুতে চার ওয়াক্ত নামায পড়ে যদি তার ওযু এশার পর ভাঙ্গে এবং বুধবার ফজরের চার ওয়াক্ত নামায আদায় করে যদি তার ওযু ইশার পর ভাঙ্গে এবং বুধবার ফজরের পূর্বে ওযু করার সময় মাসেহ করে, তাহলে সে গৃহবাসী হলে পর দিন বৃহস্পতিবারের ফজর পর্যন্ত ওযু করার সময় মোজার উপর মাসেহ করতে পারে। অনুরূপ মুসাফিব হলে শনিবার ফজর পর্যন্ত মাসেহ করতে পারবে। (ফাতাওয়া, উসাইমীন. মাসহিআলাল খুফফাইন হাদীস-১৩)

১৩. মাসেহের নিয়ম

দু'টি হাতকে পানি দ্বারা ভিজিয়ে প্রথমে ডান পায়ের আঙ্গুলের উপর থেকে আরম্ভ করে পায়ের পাতার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে পায়ের গিড়া পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে। আর ঐ একই নিয়মে বাম পায়ের উপরও মাসেহ্ করবে।

পায়ের তলায় ধুলো-বালি থাকলেও তার নিচে মাসেহ্ করা বিধেয় নয়। আলী (রা)-এর বলেন, 'ইসলামে যদি রায় ও বিবেকের স্থান থাকত, তাহলে মোজার উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশই অধিক মাসেহ্যোগ্য হতো। কিন্তু আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসেহ্ করতে দেখেছি।

(সুনানে আবূ দাঊদ, মিশকাতুল মাসাবীহ-৫২৫)

১৪. যা দ্বারা মাসেহ্ নষ্ট হয়

১. মাসেহের নির্দিষ্ট সময়-সীমা অতিবাহিত হয়ে গেলে।

২. গোসল ফরয হলে।

৩. (মাসেহ্ করার পর) মোজা খুলে ফেললে।

১৫. মাসেহের আনুষঙ্গিক মাসায়েল

শীত-গ্রীষ্ম যে কোনো সময়ে মোজা পরে থাকলে তার উপর মাসেহ্ জায়েয। মোজা পরা শীতের জন্যই হতে হবে, এমন কোনো শর্ত নেই।

(ফতওয়া ইসলামিয়্যাহ, সউদী উলামা-কমিটি ১/২৩৫)

উত্তম ও সতর্কতামূলক আমল এই যে, উভয় পা ধোয়া শেষ হলে তবেই মোজা পরা হবে। নচেৎ ডান পা ধৌত করে মোজা পরে নিয়ে তারপর বাম পা ধৌত করা ও মোজা পরা উত্তম নয়।

মোজা পরার সময়-এর উপর মাসেহ্ করব' বা 'এতদিন মাসেহ্ করব' এমন কোনো নিয়ত শর্ত যা আবশ্যক নয়।

ওযু করার পরই মোজা পরিধান করলে তার উপর মাসেহ্ করা যায়। তায়াম্মুম করার পর মোজা পরিধান করলে (পুনরায় পানি পেলে ও ওযু করলে সে সময়) মাসেহ্ করা যায় না। পক্ষান্তরে পানি না পেলে এবং ওযু না করলে যতদিন তায়াম্মুম করবে ততদিন পায়ে মোজা থাকবে। এ সময় মোজার উপর মাসেহ্ করা বা মোজা খুলে ফেলা জরুরি নয়। যেহেতু তায়াম্মুমের সাথে পায়ের কোন সম্পর্ক নেই।

যে সফরে নামাযের কসর জায়েয, সেই সফরে ৩ দিন ৩ রাত মাসেহ্ জায়েয। ঘরে থেকে মাসেহ্ শুরু করার পর সফর করলে মুসাফিরের মত ৭২ ঘণ্টাই মাসেহ্ করতে পারা যাবে। অনুরূপ সফরে মাসেহ্ আরম্ভ করে ঘরে ফিরে এলে গৃহবাসীর মত কেবল ২৪ ঘণ্টাই মাসেহ্ করা যাবে।

মাসেহের নির্ধারিত সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাসেহ্ করে নামায আদায় করলে নামায হয় না।

ওযু করার পর মোজা পরে থাকলে ওযু না ভাঙ্গার পূর্বেই যদি খুলে পুনরায় পরে নেয়া হয়, তাহলে তাতেও মাসেহ্ করা চলবে। কিন্তু একবার মাসেহ্ করার পর মোজা খুলে ফেললে তারপর পুনরায় (ওযু থাকলেও) পরার পর আর মাসেহ্ চলবে না। কারণ, মোজা খুলে নেয়াটি মাসেহ্ ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য আর মাসেহ্ ভঙ্গ হলে পুনরায় মাসেহের জন্য পুনরায় ওযু শর্ত।

মোজার উপর মাসেহ করার পর জুতো পরলে বা ডবল মোজা পরলে অথবা ডবল মোজা বা জুতোর উপর মাসেহ্ করার পর একটি মোজা বা জুতো খুলে ফেললে উভয় অবস্থাতেই মাসেহ জায়েয। তবে মাসেহের সময়কাল ধরতে হবে প্রথম অবস্থা থেকে।

নারীরাও পুরুষদের মতোই মাসেহ্ করবে।

মোজা নামিয়ে পা চুলকালে বা পাথর বের করলে যদি বেশিরভাগ পা বের হয়ে যায়, তাহলে তার উপর আর মাসেহ্ নাজায়েয। মোজার তলায় হাত প্রবেশ করালে বা সামান্য পা বের হয়ে গেলে মাসেহতে কোন প্রভাব পড়বে না।

মোজার উপর মাসাহ্ করার পর মোজা খুলে ফেললে ওযু নষ্ট হয়ে যায় না। তবে পুনরায় মাসেহের জন্য পুনরায় ওযু শর্ত। পুনরায় ওযু ছাড়া মাসেহ্ জায়েয নয়।

ওযুর মধ্যে যতটা পা ধৌত করা ফরয মোজাতে ততটা-পা-ই ঢাকতে হবে; নচেৎ মাসেহ হবে না- এ কথার কোনো দলীল নেই। অতএব ফাটা, কাটা ও ছেঁড়া মোজার উপরেও মাসেহ্ চলবে। তবে যদি বেশিরভাগ পা বেরিয়ে থাকে, তাহলে সে কথা আলাদা।

ওযু না করে মোজা পরে তাতে মাসেহ্ করে ওযু করলে নামায হয় না। যেমন ক্ষতস্থানে মাসেহ ভুলে গিয়ে ওযু করে নামায আদায় করলে নামায হয় না।

১৬. তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ـ

অর্থাৎ, যদি তোমরা অসুস্থ্ হও অথবা সফরে থাক, কিংবা তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-সঙ্গম কর, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও; তোমাদের চেহারা ও হাতকে মাটি দ্বারা মাসেহ্ কর.....।

নবী ﷺ বলেন, 'সকল উম্মতের উপর আমাদেরকে ৩টি বিষয়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, আমাদের কাতারকে করা হয়েছে ফেরেশতাবর্গের কাতারের মতো, গোটা বিশ্বকে আমাদের জন্য মসজিদ করে দেয়া হয়েছে এবং পানি না পাওয়া গেলে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।

১৭. যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয

১. একেবারেই পানি না পাওয়া গেলে অথবা পান করার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ওযু ও গোসলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ না থাকলে তায়েম্মুম করবে।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন দেখলেন একটি লোক একটু সরে আলাদা দাঁড়িয়ে আছে। সে জামাআতে নামাযও আদায় করেনি। তিনি তাকে বললেন, কি কারণে তুমি জামাআতে নামায পড়লে না? লোকটি বলল, 'আমি নাপাক অবস্থায় আছি, আর পানিও নেই। তিনি বললেন, পাক মাটি ব্যবহার কর। তোমার জন্য তাই যথেষ্ট। (সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাদীস-৫২৭)

তিনি আরো বলেন, দশ বছর যাবৎ পানি না পাওয়া গেলে মুসলিমের ওযুর উপকরণ হলো পাক মাটি। তায়াম্মুমের পর পানি পাওয়া গেলে গোসল করে নেয়া উত্তম। (সহীহ আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাত হাদীস-৫৩০)

অবশ্য আশে-পাশে বা সঙ্গীদের কারো নিকট পানি আছে কি না, তা অবশ্যই দেখে নিতে হবে। যখন একান্ত পানি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না, তখন তায়াম্মুম করে নামায আদায় করতে হবে।

২. রোগাক্রান্ত হলে অথবা দেহে কোন প্রকার ক্ষত বা ঘা থাকলে এবং পানি ব্যবহারে তা বেড়ে যাওয়া বা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করবে। জাবের (রা) বলেন, একদা আমরা কোন সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত হয়েছিল। এরপর তার স্বপ্নদোষও হলো। সে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, আমার জন্য কি তায়াম্মুম জায়েয? সকলে বলল, তুমি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম নও। অতএব তোমার জন্য আমরা তায়াম্মুম জায়েয মনে করি না। তা শুনে লোকটি গোসল করল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সে মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর আমরা যখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম তখন তাঁকে সেই লোকটার ঘটনা খুলে বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, "তারা তাকে মেরে ফেলল, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুক! যদি তারা জানত না, তবে জেনে কেন নেয়নি? অজ্ঞতার ওষুধ তো প্রশ্নই।"

(সহীহ আবু দাউদ হাদীস-৩২৫; মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীস-৫৩১)

৩. পানি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হলে এবং তা দিয়ে ওযু-গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির বলে দৃঢ় আশঙ্কা হলে, পরন্তু পানি গরম করার সুযোগ বা ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম জায়েয।

আমর ইবনে আস (রা) বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধ-সফরে একে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। আমার ভয় হলো যে, যদি গোসল করি তাহলে আমি প্রচণ্ড রোগে আক্রান্ত হয়ে যাব। তাই তায়াম্মুম করে সঙ্গীদেরকে নিয়ে (ইমাম হয়ে) ফজরের নামায আদায় করলাম। আমার সঙ্গীরা একথা নবী করীম ﷺ-এর নিকটে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, হে আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের ইমামতি করেছ?" আমি গোসল না করার কারণ তাঁকে বললাম। আরো বললাম যে, আল্লাহ তাআলার এ বাণীও আমি শুনেছি, তিনি বলেন, "তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়াশীল।" (সূরা আন-নিসা ৪/২৯)

একথা শুনে তিনি হাসলেন এবং আর কিছুই বললেন না।

(সহীহ বুখারী, আবু দাউদ হাদীস-৩২৩)

৪. পানি ব্যবহারে ক্ষতি না হলে এবং পানি নিকটবর্তী কোন স্থানে থাকলেও তা আনতে জান, মাল বা ইজ্জতহানির আশঙ্কা হলে, পানি ব্যবহার করতে গিয়ে সফরের সঙ্গীদের সঙ্গ-ছাড়া হওয়ার ভয় হলে, বন্দী অবস্থায় থাকলে অথবা (কূয়া ইত্যাদি থেকে) পানি তোলার কোন ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয। কারণ উক্ত অবস্থাগুলো পানি না পাওয়ার মতোই অবস্থা।

৫. যদি পানি কাছে থাকে এবং তা দ্বারা ওযুর করলে পান করা, রান্না করা না যায় তাহলে তায়াম্মুম জায়েয। (মুগনী, ফিকহুস সুন্নাহ উর্দূ ১/৬১-৬২)

১৮. যা দ্বারা তায়াম্মুম হবে

পবিত্র মাটি এবং তার শ্রেণীভূক্ত সকল বস্তু (যেমন, পাথর, বালি, কাঁকর, সিমেন্ট প্রভৃতি) দ্বারা তায়াম্মুম শুদ্ধ। ধুলাযুক্ত মাটি না পাওয়া গেলে ধুলাহীন পাথর বা বালিতে তায়াম্মুম জায়েয হবে। (ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২১৮)

১৯. তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

সহীহ হাদীস অনুসারে তায়াম্মুম করার পদ্ধতি নিম্নরূপ–

(নিয়ত করার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে) দুই হাতের তালু মাটির উপর মারতে হবে। তারপর তুলে নিয়ে তার উপর ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত ধুলোবালি উড়িয়ে দিয়ে উভয় হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ্ করতে হবে। এরপর বাম হাত দ্বারা ডান হাত কব্জি পর্যন্ত এবং শেষ ডান হাত দ্বারা বাম হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে।

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫২৮)

২০. যা দ্বারা তায়াম্মু নষ্ট হয়

যে যে কারণে ওযু নষ্ট হয়, ঠিক সেই সেই কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ তায়াম্মুম হলো ওযুর বিকল্প। এ ছাড়া যে অসুবিধার কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, সেই অসুবিধা দূর হয়ে গেলেই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়। যেমন পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম শেষ হয়ে যায়। রোগের কারণে করলে, অসুখ দূর হয়ে যাওয়ার পর পরই আর তায়াম্মুম থাকে না। (ফিকহুস সুন্নাহ উর্দূ ১/৬৩)

২১. তায়াম্মুমের আনুষঙ্গিক মাসায়েল

অনুসন্ধান করার পর পানি না পাওয়া গেলে আউয়াল ওয়াক্তেই তায়াম্মুম করে নামায পড়া উচিত। শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত পানির অপেক্ষা করা বা পানি খোঁজা আবশ্যক নয়। আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ে শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়া গেলেও নামায পুনরায় পড়তে হবে না। (সিলসিলাহ সহীহ হাদীস-৬/২৬৫-২৬৮)

পানির সন্ধান না করেই তায়াম্মুম করে নামায পড়লে এবং পানি তার আশে-পাশে বিদ্যমান থাকলে নামায বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ফাতওয়া ইসলামিয়্যাহ সাইদী উলামা কমিটি হাদীস-১/২২০)

আবু সাইদ খুদরী (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হলো। নামাযের সময় হলে তাদের নিকট পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম করে উভয়েই নামায পড়ে নিল। অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন পানি দ্বারা ওযু করে পুনরায় ঐ নামায পুনরায় আদায় করল। কিন্তু অপর জন করল না। তারপর তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বলল। তিনি যে নামায পুনরায় পড়েনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমার আমল সুন্নাহর অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামাযও যথেষ্ট (শুদ্ধ) হয়ে গেছে।" আর যে ওযু করে নামায পুনরায় পড়েছিল, তার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তোমার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব।" (সুনানে আবু দাউদ, নাসাঈ, সুনান, দারেমী, সুনান, মিশকাতুল মাসাবীহ ৫৩৩)

প্রকাশ থাকে যে, সুন্নাহ জানার পর দ্বিগুণ করে নামায নাজায়েয।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায আদায়রত অবস্থায় পানি পেয়ে যায়, তাকে নামায ছেড়ে দিয়ে ওযু করে পুনরায় নামায পড়তে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ উর্দু-১/৬৩)

ওযু ও গোসলের পর যে কাজ করা বৈধ, তায়াম্মুমের পরও সেই কাজ করা বৈধ। যেহেতু তায়াম্মুম ওযু-গোসলের পরিবর্তে করতে হয়। (ফিকহুস সুন্নাহ)

পানি বা মাটি কিছু না পাওয়া গেলে বিনা ওযু ও তায়াম্মুমেই নামায পড়তে হবে।

ঘরে থাকলেও অনুসন্ধানের পর পানি না পাওয়া গেলে এবং নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা হলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করতে হবে।

পক্ষান্তরে পানি থাকলে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার সম্ভাবনা হলেও ওযু-গোসল করে নামায পড়তে হবে। ঐ সময় তায়াম্মুম করে নামায পড়লে নামায হবে না।

একই তায়াম্মুমে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় সিদ্ধ। (আলমুমতে, শারহে ফিক্‌হ ইবনে উভয়ই ১/৩৪০) সিদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে আসারগুলো শুদ্ধ নয়।

২২. মিসওয়াক করার গুরুত্ব

রাসূলে করীম ﷺ বলেন, "আমি উম্মতের জন্য কষ্টকর না হলে ইশার নামাযকে দেরী করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে আদেশ দিতাম। (বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, "আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না হলে (প্রত্যেক) ওযুর সাথে মিসওয়াক করা ফরয করতাম এবং ইশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম।" (হাকেম বাইহাকী জামে হাদীস-৫৩১৯)

তাই সাহাবী যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) মসজিদে নামায পড়তে উপস্থিত হতেন, আর তাঁর মেসওয়াককে কলমের মতো তাঁর কানে গুঁজে রাখতেন। নামাযে দাঁড়াবার সময় তিনি মেসওয়াক করে পুনরায় কানে গুঁজে নিতেন।
(আবু দাউদ, তিরমিযী)

বিশেষ করে জুমু'আর দিন গোসল ও মিসওয়াক করা এবং আতর ব্যবহার করা কর্তব্য। (আহমদ, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবূ দাউদ, সহীহু জামে ৪১৭৮)

রাসূলে করীম ﷺ বলেন, "জিবরীল (মুসনাদ আহমদ) আমাকে (এত) বেশি) মেসওয়াক করতে আদেশ করেছেন, যাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, এতে আমার ভয় হয় যে, মেসওয়াক করা আমার ওপর ফরয করে দেয়া হবে।" (সহীহুল জামে ১৩৭৬)

রাসূল (সা) বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র তিনি প্রথমে যে কাজ করতেন, তা হলো মেসওয়াক করা। তাহাজ্জুদ পড়তে উঠলেই তিনি মেসওয়াক করতেন। আবার রাত্রের অন্যান্য সময়েও যখন জেগে উঠতেন, তখন মিসওয়াক করতেন, আর এই জন্যই রাত্রে শোবার সময় সেখানে মেসওয়াক রেখে নিতেন।
(সহীহ জামে হাদীস-৪৮৭২)

তিনি বলেন, মেসওয়াক করার রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। (নাসাঈ, ইবনে খুজাইমা, সহীহ তারগীব-২০২)

একদা আলী (রা) মেসওয়াক আনতে আদেশ করে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কিরাআত শুনতে থাকেন। ফেরেশতা তার নিকটবর্তী হন; (অথবা বর্ণনাকারী অনুরূপ কিছু বললেন।) পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফেরেশ্তার পেটে প্রবেশ করে যায়। কাজেই কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।" (বাযযার, সহীহ তারগীব হাদীস-২১০)

তিনি বলেন, "মিসওয়াক করে তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর। কারণ, মুখ হলো কুরআনের পথ।' (বাযযার, সিলসিলাহ সহীহ হাদীস-১২১৩)

আয়েশা (রা) বলেন, 'রাসূল ﷺ মিসওয়াক করে আমাকে তা ধৌত করতে দিতেন। কিন্তু ধোয়ার আগে আমি মিসওয়াক করে নিতাম। তারপর তা ধুয়ে তাঁকে দিতাম।' তাঁর নিকট মিসওয়াকের এত গুরুত্ব ছিল যে, তিরোধানের পূর্ব মুহূর্তেও তিনি আয়েশার দাঁতে চিবিয়ে নরম করে নিজে মেসওয়াক করেছেন।

(সহীহ্ বুখারী, মিশকাতুল জামায়ী হাদীস-৫৯৫৯)

তিনি আরাক (পিলু) গাছের (ডাল বা শিকড়ের) মেসওয়াক করতেন।

আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজা যায়। তবে এটা সুন্নাত কি না বা এতেও ঐ সওয়াব অর্জন হবে কি না, সে বিষয়ে কোন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায় না। হাফেয ইবনে হাজার (র) তালখীসে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, 'এগুলোর চেয়ে মুসনাদে আহমদে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ্। কিন্তু সে হাদীসটির সনদ যয়ীফ।' (মুসনাদে আহমদ, তাহকীক, আহমদ, শাকের হাদীস-১৩৫৫)

২৩. নামাযীর লেবাস

মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَا بَنِىْ آدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ـ

"হে মানবজাতি! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে লেবাস দিয়েছি। পরন্ত তাকওয়ার লেবাসই সর্বোৎকৃষ্ট। আর এগুলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহ। সম্ভাবত তারা উপদেশ গ্রহণ করবেন।

(সূরা আল-আ'রাফ ৭/২৬)

يَا بَنِىْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

"হে বনী আদম! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।

(সূরা আল-আ'রাফ ৭/৩১)

শরীয়তের সভ্য-দৃষ্টিতে সাধারণভাবে লেবাসের কতকগুলো শর্ত ও আদব রয়েছে; যা পালন করতে মুসলিম বাধ্য।

◆ নারীদের লেবাসের শর্তাবলী নিম্নরূপ–

১. লেবাস যেন শরীরের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখে। দেহের কোন অঙ্গ বা সৌন্দর্য যেন কোনো বেগানা পুরুষের সামনে প্রকাশ না পায়। কেননা রাসূল ﷺ বলেন, মেয়ে মানুষের সবটাই পুরুষের দৃষ্টিতে পরিশোভিত করে তোলে।

মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ.

অর্থ : হে নবী! তুমি তোমার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়ংদশ নিজেদের (চেহারার) উপর টেনে নেয়। (সূরা আল-আহযাব ৩৩/৫৯)

উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে (মদীনার) আনসারদের মহিলারা যখন বের হলো, তখন তাদের মাথায় (কালো) চাদর (বা মোটা উড়না) দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওদের মাথায় কালো কাকের ঝাঁক বসে আছে।

আল্লাহ্ তাআলার আদেশ, মুমিন নারীরা যেন তাদের ঘাড় ও বুককে মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে নেয়।

আয়েশা (রা) বলেন, পূর্বের মুহাজির নারীদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করেন। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা তাদের পরিধেয় পোশাকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ফেড়ে মাতার উড়না বানিয়ে মাথা (ঘাড়-গলা-বুক) ঢেকেছিল। (আবূ দাউদ, সুনান ৪১০২)

সাহাবাদের মহিলাগণ যখন পথে চলতেন, তখন তাঁদের নিম্নাঙ্গের কাপড়ের শেষ প্রান্ত মাটির উপর ছেঁচড়ে যেত। নাপাক জায়গাতে চলার সময়েও তাদের কেউই পায়ের পাতা বের করতেন না। (মিশকাতুল মাসাবীহ ৫০৪, ৫১২, ৪৩৩৫)

কাজেই মাথা ও পায়ের মধ্যবর্তী কোন অঙ্গ যে প্রকাশ করাই যাবে না, তা অনুমেয়।

২. নারী এমন পোশাক পরিধান না করাই উত্তম যা অন্য পুরুষদের আকৃষ্টি করে।

৩. লেবাস যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের বস্তু নজরে আসে। নচেৎ ঢাকা থাকলেও খোলার পর্যায়ভূক্ত। এ বিষয়ে এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ আসমা (রা)-কে সতর্ক করেছিলেন।

(সুনানে আবূ দাউদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩৭২)

একদা হাফসা বিনতে আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করলে তিনি তার উড়নাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরতে দিলেন। (মুয়াত্তা মালেক, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩৭৫)

রাসূল ﷺ বলেন, দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী; যাদেরকে আমি (এখনো) দেখিনি। (এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সেই) মহিলা দল, যারা কাপড় পরে উলঙ্গ থাকবে, অপর পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও তার দিকে আকৃষ্ট হবে, যাদের মাথা (চুলের খোঁপা) হিলে থাকা উটের কুঁজের মতো হবে। তারা জান্নাতে যাবে না। আর তার সুগন্ধও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধ এত এত দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে। (আহমদ, সহীহ মুসলিম সহীহুল জামে' ৩৭৯৯)

৪. পোশাক যেন এমন আঁট-সাঁট (টাইট্‌ফিট) না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু প্রকাশ হয়। কারণ এমন ঢাকাও খোলার পর্যায়ভূক্ত এবং দৃষ্টি-আকর্ষণী।

৫. পোশাক যেন সুগন্ধিত না হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সুগন্ধি বা সেন্ট, বিতরণের উদ্দেশ্যে কোন নারী যদি তা ব্যবহার করে পুরুষদের সামনে যায়, তবে সে বেশ্যা মেয়ে। (সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ১০৬৫)

সেন্ট ব্যবহার করে নারী মসজিদেও যেতে পারে না। একদা চাশ্‌তের সময় আবূ হুরায়রা (রা) মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদে প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবু হুরায়রা নারীটির উদ্দেশ্যে বললেন, 'আলাইকিস্‌ সালাম।' মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবে তুমি?' সে বলল, মসজিদে। তিনি বললেন, কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি? বলল, মসজিদের জন্য। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম। পুনরায় বললেন, আল্লাহর কসম? তখন তিনি বললেন, তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, সেই নারীর কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মতো গোসল করে নেয়।" অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধৌত করে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায আদায় কর।

(সুনানে আবূ দাউদ, আলবানী ১০৩১)

৬. লেবাস যেন কোন কাফের মহিলার জাতীয় নিদর্শন না হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন (লেবাসে-পোশাকে, চাল-চলনে অনুকরণ) করবে সে তাদেরই দলভূক্ত। (সুনানে আবূ দাউদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩৪৭)

৭. তা যেন পুরুষদের লেবাসের অনুরূপ না হয়। রাসূল ﷺ সেই নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে এবং সেই পুরুষদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নারীদের বেশ ধারণ করে।

(আবূ দাউদ, সুনান ৪০৯৭, ইবনে মাজাহ ১৯০৪)

তিনি সেই পুরুষকে লা'নত করেছেন, যে নারীর মতো লেবাস পরে এবং সেই মহিলাকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যে পুরুষের মতো লেবাস পরে।

(আবূ দাউদ, সুনান ৪০৯৮, ইবনে মাজাহ ১৯০৩)

৮. লেবাস যেন জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়। কারণ, বিরল ধরনের লেবাস পরলে সাধারণত: পরিধানকারীর মনে গর্ব সৃষ্টি হয় এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধিজনক লেবাস পড়বে, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরাবেন।

(মুসনাদ আহমদ, সুনানে আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩৪৬)

"যে ব্যক্তি জাঁকজমকপূর্ণ লেবাস পরবে, আল্লাহ্ তাকে শেষ বিচার দিবসে অনুরূপ লেবাস পরিয়ে তা অগ্নিদগ্ধ করবেন।

(সুনানে আবূ দাউদ, বায়হাকী, সহীহুল জামে' ৬৫২৬)

পুরুষদের লেবাসের শর্তাবলী নিম্নরূপ

১. লেবাস যেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ অবশ্যই ঢাকা থাকে। যেহেতু ঐটুকু অঙ্গ পুরুষের লজ্জাস্থান।

২. এমন পাতলা না হয়, যাতে ভিতরের চামড়া নজরে আসে।

৩. এমন আট-সাট না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু প্রকাশিত হয়ে পরে।

৫. মহিলাদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।

৬. জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধজনক না হয়।

৭. গাঢ় হলুদ বা জাফরানী রঙের যেন না হয়। আম্‌র ইবনে আস (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ একদা আমার দেহে দু'টি জাফরানী রঙের কাপড় দেখে বললেন, "এগুলো কাফেরদের কাপড়। কাজেই তুমি তা পরো না।"

(সহীহুল মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩২৭)

৮. লেবাস যেন রেশমী কাপড়ের না হয়। রাসূল ﷺ বলেন, সোনা ও রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। দুনিয়ার রেশম-বস্তু তারাই পরবে, যাদের আখিরাতে কোন অংশ নেই।

উমর (রা) বলেন, রাসূল ﷺ রেশমের পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুল পরিমাণ (অন্য কাপড়ের সঙ্গে জুড়ে) ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন। তদানুরূপ কোন চর্মরোগ প্রভৃতিতে উপকারী হলে তা ব্যবহারে অনুমতি আছে।

৯. পরিহিত লেবাস (পায়জামা, প্যান্ট, লুঙ্গি, কামিস প্রভৃতি) যেন পায়ের গাঁটের নিচে না যায়। মহানবী ﷺ বলেন, টাখনুর নিচের অংশ লুঙ্গি জাহান্নামে। (সহীহুল বুখারী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩১৪)

"মু'মিনের লুঙ্গি পায়ের গিরা পর্যন্ত। এ (অর্ধেক রলা) থেকে গাঁট পর্যন্ত অংশের যে কোনও স্থানে হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এর নিচের অংশ জাহান্নামে যাবে।" এরূপ ৩ বার বলে তিনি পুনরায় বললেন, "আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি (গাঁটের নিচে) ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় লেবাস ছিল কামিস (ফুল-হাতা প্রায় টাখনুর উপর পর্যন্ত লম্বা জামা বিশেষ। যেমন তিনি চেক-কাটা চাদর পরতে ভালোবাসতেন। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩০৪)

তিনি মাথায় ব্যবহার করতেন পাগড়ী। তিনি কালো রঙের পাগড়ীও বাঁধতেন।

(সুনানে আবূদাউদ ৪০৭৭; ইবনে মাজাহ ৩৫৮৪)

আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবা তথা সলফদের যুগে টুপীও প্রচলিত ছিল।

যেমন সে যুগে সেলোয়ার বা পায়জামাও পরিচিতি ছিল। মহানবী ﷺও পায়জামা ক্রয় করেছিলেন। তিনি ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় হাজীদেরকে পায়জামা পরতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য লুঙ্গি না পাওয়া গেলে পায়জামা পরতে অনুমতি দিয়েছেন। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ২৬৭৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যখন লুঙ্গি পরতেন, তখন লুঙ্গির সামনের দিকের নিচের অংশ পায়ের পাতার উপর ঝুলিয়ে দিতেন এবং পেছন দিকটা (গাঁটের) উপরে তুলে নিতেন। এরূপ পরার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এরূপ পরতে দেখেছি।

তিনি আরো বলেন, "উত্তম আদর্শ, উত্তম বেশভূষা এবং মিতাচারিতা নবুওয়তের ২৫ অংশের অন্যতম অংশ। (সুনানে আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ১৯৯৩)

আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তির মাথায় আলুথালু চুল দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে সোজা করে (আঁচড়ে) নেয়?! আর এক ব্যক্তির পরনে ময়লা পোশাক দেখে বললেন, 'এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে নেয়।

আবুল আহওয়াস বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করলাম। আমার পরনে ছিল নেহাতই নিম্নমানের কাপড়। তিনি তা দেখে আমাকে বললেন, "তোমার কি মাল-ধন আছে? "আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, "কোন শ্রেণীর মাল আছে? আমি বললাম, 'সকল শ্রেণীরই মাল আমার নিকট জমা আছে। আল্লাহ্ আমাকে উট, গরু, ছাগল, ভেঁড়া, ঘোড়া ও ক্রীতদাস. দান করেছেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্ যখন তোমাকে এত সম্পদ দান করেছেন, তখন আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহ তোমার বেশ-ভূষার প্রকাশ পাওয়া উচিত।

তিনি বলেন, "যা ইচ্ছা তাই খাও এবং যেমন ইচ্ছা তেমনিই পর, তবে তাতে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও অহংকার।

২৪. নামাযের ভিতরে বিশেষ লেবাস

একটি পোশাকে পুরুষের নামায শুদ্ধ, তবে তাতে কাঁধ ঢাকতে হবে।

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৭৫৪-৭৫৬ নং)

আর লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন লজ্জাস্থান প্রকাশ না পেয়ে যায়। তওয়াফে কুদূম (হজ্জ ও উমরায় সর্বপ্রথম তওয়াফ) ছাড়া অন্য সময় ইহরাম অবস্থায় ডান কাঁধ বের করে রাখা বিধেয় নয়। বলাবাহুল্য নামাযের সময় উভয় কাঁধ ঢাকা আবশ্যক।

আল্লাহ্ সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তাই নামাযীর উচিত, যথাসাধ্য সৌন্দর্য অবলম্বন করে তাঁর সমীপে হাজির হওয়া। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করে, তখন তাকে দু'টি কাপড় পরা উচিত। কারণ, আল্লাহ্ অধিকতর হকদার যে, তাঁর জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ করা হবে।" (সহীহ জামে'-৬৫২)

পক্ষান্তরে নামাযের জন্য এমন নক্শাদার পোশাক হওয়া উচিত নয়, যাতে নামাযীর মন বা একাগ্রতা চুরি করে নেয়। একদা মহানবী ﷺ নকশাদার কোন কাপড়ে নামায আদায়ের পর বললেন, "এটি ফেরৎ দিয়ে আম্বাজানী (নক্শাবিহীন) পোশাক নিয়ে এস। কারণ, এটি আমাকে আমার নামায থেকে উদাস করে ফেলেনি। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৭৫৭)

নামাযীর নামাযের এমন লেবাস হওয়া উচিত নয়, যাতে কোন (বিচরণশীল) প্রাণীর ছবি থাকে। কারণ, এতেও নামাযীর মনোযোগ ছিনিয়ে নেয়। আয়েশা (রা)-এর কামরার এক প্রান্তে একটি ছবিযুক্ত রঙিন পর্দা টাঙ্গানো ছিল। একদা মহানবী ﷺ বললেন, "তোমার এ পর্দা আমাদের নিকট থেকে সরিয়ে নাও। কারণ, ওর ছবিগুলো আমার নামাযে বিঘ্নতা সৃষ্টি করছে।" (সহীহ বুখারী হাদীস-৩৭৪)

তিনি বলেন, "যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি (বা মূর্তি) থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না। অতএব নামাযের বাইরেও এ জাতীয় ছবিযুক্ত লেবাস মুসলিমের জন্য নাজায়েয। কারণ, ইসলাম ছবি ও মূর্তির ঘোর বিরোধী।

যে পোশাকে বিধর্মীদের কোন ধর্মীয় প্রতীক (যেমন ক্রুশ, শঙ্খ প্রভৃতি) থাকে, সে কাপড় (ও অলংকার) ব্যবহার বৈধ নয়। মা আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বাড়িতে কোন জিনিসে ক্রুশ দেখলেই তা কেটে ফেলতেন।

জুতো পবিত্র হলে, তা পায়ে রেখেই নামায পড়া জায়েয। মহানবী ﷺ বলেন, তোমরা ইয়াহুদীদের বিপরীত কর। (এবং জুতো ও মোজা পায়ে নামায পড়।) কারণ, ওরা ওদের জুতো ও মোজা পায়ে রেখে নামায আদায় করে না।

(সুনানে আবু দাউদ; মিশকাতুল মাসাবীহ ৭৬৫)

আল্লাহর রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, যেন কেউ বাম হাতে না খায়, কেউ যেন এক পায়ে জুতো রেখে না চলে, কেউ যেন এমনভাবে একটি মাত্র পোশাক দ্বারা নিজেকে জড়িয়ে না নেয়, যাতে তার হাত বের করার পথ থাকে না এবং কেউ যেন একটাই কাপড় পরে, পাছার উপর ভর করে, পায়ের নলা ও হাটু দু'টিকে খাড়া করে পেটে লাগিয়ে, হাত দু'টিকে পায়ে জড়িয়ে, লজ্জাস্থান খুলে না বসে।

(সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৩১৫)

লুঙ্গির ভিতরে কিছু না পরে থাকলে এবং অনুরূপ বসলেও লজ্জাস্থান প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন মহিলাদের শাড়ি-সায়াতেও ঐ একই অবস্থা হতে পারে। অতএব ঐ সব কাপড়ে ঐরূপ বসা নাজায়েয।

রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযে তার লুঙ্গিকে অহংকারের সাথে গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে রাখে, তার এ কাজ হালাল নয় এবং আল্লাহর নিকট তার কোন সম্মান নেই। (সুনানে আবূ দাউদ, সহীহ জামে' ৬০১২)

প্রকাশ থাকে যে, গাঁটের নিচে পোশাক ঝুলিয়ে নামায পড়লে নামায কবুল হয় না- এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। (যঈফ আবূ দাউদ, সুনান ১২৪, ৮৮৪)

নাপাকীর সন্দেহ না থাকলে প্রয়োজনে নারীদের শাল, চাদর, বা শাড়ি গায়ে দিয়ে পুরুষেরা নামায পড়তে পারে।

প্রয়োজনে একই কাপড়ের অর্ধেকটা (ঋতুমতী হলেও) স্ত্রীর গায়ে এবং পুরুষ বাকি অর্ধেকটা গায়ে দিয়ে নামায আদায় করতে পারে।

আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতে নামায পড়তেন। আমি মাসিক অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। আর আমার একটি পোশাক আমার দেহে এবং কিছু তাঁর দেহে থাকত। (আবূ দাঊদ, সুনান ৩৭০)

যে কাপড় পরে থাকা অবস্থায় মেয়েদের মাসিক হয়, সেই পোশাকে মাসিক লেগে থাকার সন্দেহ না থাকলে পবিত্রতার গোসলের পর না ধুয়েও ঐ কাপড়েই তাদের নামায আদায় জায়েয। মাসিক লাগলেও যে স্থানে লেগেছে কেবল সেই স্থান ধুয়ে ধুয়ে খুনের দাগ না গেলেও তাতেই নামায পড়া জায়েয ও শুদ্ধ হবে।

কেবল দুধ পান করে এমন শিশুপুত্র যদি কাপড়ে পেশাব করে দেয়, তাহলে তার উপর পানির ছিটা মেরে এবং না ধুয়ে তাতেই নামায হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকন্যার পেশাব হয় অথবা দুধ ছাড়া অন্য খাবারও খায় এমন শিশু হয়, তাহলে তার পেশাব পোশাক থেকে ধুয়ে ফেলতে হবে। নচেৎ নামায হবে না।

(আবু দাউদ, সুনান ৩৬৬)

কাপড়ে পেশাব রোদে শুকিয়ে গেলেও তাতে নামায হয় না। কাপড় থেকে পেশাব পানি দিয়ে ধোয়া আবশ্যক।

যে কাপড় পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয় সেই কাপড়েও নামায শুদ্ধ।

(আবূ দাঊদ, সুনান ৩৬৬)

টাইট-ফিট্ প্যান্ট ও শার্ট এবং চুস্ক পায়জামা ও খাটো পাঞ্জাবী পরে নামায মাকরূহ। টাইট হওয়ার কারণে নামাযে একাগ্রতা ভঙ্গ হয়। তাছাড়া পোশাকের উপর থেকে (বিশেষ করে পিছন থেকে) লজ্জাস্থানের উঁচু-নিচু অংশ ও আকার বোঝা যায়।

নারীদের লেবাসে চুল, পেট, পিঠ, হাতের কব্জির উপরি ভাগের অঙ্গ (কনুই, বাহু প্রভৃতি) বের হয়ে থাকলে নামায হয় না। কেবল চেহারা ও কব্জি পর্যন্ত হাত বের হয়ে থাকবে। পায়ের পাতাও আবৃত করা কর্তব্য। অবশ্য সামনে কোন বেগানা পুরুষ থাকলে মুখমণ্ডলও ঢেকে নিতে হবে।

ঘর অন্ধকার হলেও বা একা থাকলেও নামায পড়া অবস্থায় ঢাকা ফরয এমন কোন অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। সেই নামায পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২৮৫)

রাসূল ﷺ বলেন, কোন সাবালিকা মেয়ের মাথায় চাদর ছাড়া তার নামায কবুল হয় না। (সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৭৬২)

পুরুষের দেহের উর্ধ্বাংশের কাপড় (চাদর বা গামছা) সংকীর্ণ হলে মাথা ঢাকতে গিয়ে যেন পেট-পিঠ বাহির না হয়ে যায়। প্রকাশ যে, নামাযে পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা জরুরি নয়। সৌন্দর্যের জন্য টুপী, পাগড়ী বা মাথার রুমাল মাথায় ব্যবহার করা উত্তম। আর এ কথা বিদিত যে, আল্লাহর নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ কখনো কখনো এক কাপড়েও নামায আদায় করেছেন। তাছাড়া কতক সলফ সুতরার জন্য কিছু না পেলে মাথায় টুপী খুলে সামনে রেখে সুতরা বানাতেন।

(আবু দাউদ, সুনান ৬৯১)

প্রকাশ থাকে যে, পরিশ্রম ও মেহনতের কাজের ঘর্মসিক্ত, কাদা বা ধুলোমাখা দুর্গন্ধয় লেবাসে মহান বাদশা আল্লাহর সমীপে মসজিদে আসা উচিত নয়। কারণ, তাতে আল্লাহর উপস্থিত ফেরেশতা তথা মুসল্লীগণ কষ্ট পাবেন। আর এজন্যই তো কাঁচা-পিঁয়াজ-রসূন খেয়ে মসজিদে আসতে বারণ করা হয়েছে।

২৫. নিষিদ্ধ সময়সমূহ

◆ নামাযের নিষিদ্ধ সময় ৫টি

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নফল নামায নেই এবং ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নফল নামায নেই।"

(বুখারী হাদীস নং ৪৮৬ ও মুসলিম হাদীস নং ৮২৭)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ (رضى) قَالَ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ الظَّهِيْرَةُ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ -

২. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তিন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামায আদায় করতে এবং আমাদের মৃতু ব্যক্তিকে কবরস্থ

করতে নিষেধ করতেন। আর তা হলো সূর্যোদয়ের সময় থেকে কিছুটা উপরে উঠা পর্যন্ত। (উদয় শুরু থেকে প্রায় ১৫ মিনিট পর্যন্ত নিষিদ্ধ সময়ের অন্তর্ভুক্ত । অনুবাদক)

দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত এবং সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়।" (মুসলিম হাদীস নং ৮৩১)

আসরের নামাযের পরেও সাধারণ নফল নামায আদায় করা বৈধ, যদি সূর্যের আলো উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ـ

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আসরের পরে কোন নফল নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি সূর্য উপরে অবস্থান করে, তাহলে নামায আদায় চলবে। (আবূ দাউদ হাদীস-১২৭৪, নাসাঈ হাদীস-৫৭৩)

◆ নিষিদ্ধ সময়ে নামায আদায়ের বিধান

১. উপরোক্ত পাঁচ ওয়াক্তে ফরজসমূহের কাজা, তওয়াফের দুই রাকায়াত নফল এবং বিশেষ কারণবশত: নামায যেমন : তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু ও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের নামায ইত্যাদি আদায় করা জায়েয।

২. ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ফজরের সুন্নাত ফজরের ফরজ নামাযের পরে কাজা করা বৈধ আছে। এ ভাবে যোহরের সুন্নাত আসরের নামাযের পরে কাজা করতে পারে।

৩. মক্কার হারাম শরীফে যে কোন সময় নামায আদায় করা জায়েয আছে।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ ـ

জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : "হে আবদে মানাফের সন্তানরা! রাত ও দিনে যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তি এই ঘরের তওয়াফ করলে ও নামায আদায় করলে তাকে বাঁধা দিও না।"

(হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস-৮৬৮, ইবনে মাজাহ হাদীস-১২৪৫)

তবে অধিকাংশ উলামা এ সময়ে বিশেষ কারণবশত: নফল ছাড়া সাধারণ নফল মাকরূহ বলেছেন।

২. নামায (সালাত)

মহান আল্লাহর বাণী

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ . فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ .

তোমরা সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) সালাতের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়াও। অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই সালাত আদায় করে নাও অথবা বাহনের উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে, তখন আল্লাহর স্মরণ কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে যা তোমরা ইতোপূর্বে জানতে না। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৮-২৩৯]

১. সালাতের অর্থ, হুকুম ও ফযীলত

কালেমা শাহাদাতের দুই সাক্ষ্যদানের পরেই ইসলামের রোকনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক তাকিদ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ সালাত সকল মুসলিম নর-নারীর সর্বাবস্থায় ফরজ। নিরাপদ অবস্থায় হোক বা ভয়ের পরিস্থিতিতে হোক, সুস্থ অবস্থায় হোক বা অসুস্থ, সফর অবস্থায় হোক বা মুকিম (বাড়িতে অবস্থানকারী) অবস্থায়, প্রত্যেক অবস্থাতেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুযায়ী সালাতের বিধান রয়েছে।

সালাত : কতগুলো কথা ও কাজের সমন্বয়ে একটি ইবাদত, যার শুরু হয় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দিয়ে এবং শেষ হয় সালাম (আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ) দিয়ে।

◆ সালাত ফরজ হওয়ার হেকমত

১. সালাত একটি নূর তথা আলো (জ্যোতি)। আলো যেমন আলোকিত করে, তেমনিভাবে সালাত সঠিক পথ দেখায়, নাফরমানিতে বাধা প্রদান করে এবং সকল প্রকারের অশ্লীল ও অন্যায় কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখে।

২. সালাত আল্লাহ ও বান্দার মাঝের সেতুবন্ধন, দ্বীনের খুঁটি, এর মাধ্যমেই মুসলিম তার পালনকর্তার সাথে মোনাজাত তথা নিভৃত আলাপের সুযোগ পায়। ফলে তার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে, নয়ন শীতল হয়, অন্তর স্থির হয়, মনের কুটিলতা দূর হয়, তার প্রয়োজন মিটানো হয়, পার্থিব সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

৩. সালাতের জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (অপ্রকাশ্য) আছে। জাহের যা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত যেমন : দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সেজদা এবং অন্যান্য সমস্ত কথা ও কার্যকলাপ। আর বাতেন যা হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত যেমন : আল্লাহ তা'য়ালা-এর সম্মান প্রদর্শন, তাঁর বড়ত্ব, ভয়, মহব্বত, আনুগত্য, প্রশংসা, শোকর এবং প্রতিপালকের প্রতি বান্দার বশ্যতা ও নতি স্বীকার। জাহের বাস্তবায়ন নবী করীম ﷺ-এর তরিকায় সালাত আদায়ের দ্বারা। আর বাতেনের বাস্তবায়ন হবে তাওহীদ, ঈমান, ইখলাছ ও একাগ্রতার দ্বারা।

৪. সালাতের শরীর ও রূহ (প্রাণ) আছে। শরীর হলো দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সেজদা, ক্বিরাত। আর রূহ হলো আল্লাহর সম্মান প্রদর্শন, ভয়, প্রশংসা, তাঁর নিকটে চাওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁর গুণগান করা।

৫. কালেমা শাহাদতের দুই সাক্ষ্যের স্বীকৃতির পরেই আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি মুসলিমের জীবনকে আরো চারটি বিষয়ের (নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার আদেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো ইসলামের রোকন। এর প্রত্যেকটির মধ্যেই রয়েছে মানুষের মন, ধন-সম্পদ, প্রবৃত্তি ও স্বভাবের উপরে আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়নের অনুশীলন; যেন তার জীবনটা মনগড়া না হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দ অনুসারে হয়।

৬. মুসলিম ব্যক্তি সালাতে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আল্লাহর হুকুমসমূহ জারি করে থাকে; যেন সে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যে অভ্যস্ত হয় এবং জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্র যেমন : চরিত্র, আদান-প্রদান, খানাপিনা, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদিতে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে। এভাবে সে সালাতের ভিতরে ও বাহিরে তার প্রতিপালকের অনুগত হয়।

৭. সালাত সকল প্রকার অন্যায় ও পাপাচারের জন্য প্রতিবন্ধক এবং গুনাহসমূহ দূরীভূত করার অন্যতম উপকরণ।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضی) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ : اَرَاَیْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ یَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ یَبْقٰی مِنْ دَرَنِهٖ شَیْئٌ قَالُوْا لَا یَبْقٰی مِنْ دَرَنِهٖ شَیْئٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ یَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَایَا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন : "মনে কর যদি তোমাদের করো দরজার সামনে প্রবাহিত নদী থাকে, আর সেখানে সে দিনে পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার কোন ময়লা বাকি থাকবে? " তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) উত্তর করলেন : না, তার কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঠিক এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

(বুখারী হাদীস নং ৫২৮; মুসলিম হাদীস নং ৬৬৭)

৮. **অন্তর (হৃদয় বা মন) সুদৃঢ় হওয়া :** অন্তর (মন) সঠিক হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সঠিক হয়ে যায়। আর অন্তর সঠিক হয় দু'টি জিনিসের দ্বারা–

ক. প্রবৃত্তি যা পছন্দ করে তার চেয়ে আল্লাহ তা'য়ালা যা পছন্দ করেন তার প্রাধান্য দেয়া।

খ. আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আর এটাই হলো শরিয়ত। এই সম্মানটা এসেছে আদেশদাতা ও নিষেধকর্তা আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন থেকে। মানুষ কখনো কখনো হুকুম মেনে চলে সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করে, সৃষ্টিজগতের সম্মান ও মর্যাদা হাসিলের উদ্দেশ্যে। আবার কখনো কখনো নিষেধ কাজ পরিত্যাগ করে মাখলুকের দৃষ্টিতে পড়ে যাওয়ার আশংকায়, অথবা পার্থিব শাস্তির ভয়ে যা আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীর জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। যেমন : বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির বিধান। তাই এ ধরনের কাজ করা বা ত্যাগ করা আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও নয় বা আদেশকারী ও নিষেধাজ্ঞাদানকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও নয়।

◆ আল্লাহর আদেশসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আলামত

আল্লাহর আদেশসমূহের সময় ও সীমার দিকে লক্ষ্য রাখা। রোকন, ফরজ ও সুন্নাতসমূহ ঠিকমত আদায় করা। সেগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায়ে উদ্বুদ্ধ হওয়া। ফরজ হওয়ার সাথে সাথে খুশী মনে বিলম্ব না করে সেগুলো আদায় করা। কোন কারণে আদায় করতে না পারলে নাখোশ হওয়া যেমন : সালাতের জামায়াত ছুটে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহর ওয়াস্তে নারাজ হওয়া যদি কোন ক্ষেত্রে তাঁর বিধি-নিষেধের অবমাননা হয়। আল্লাহর নাফরমানিতে নারাজ হওয়া এবং তাঁর আনুগত্যে খুশি হওয়া। শরিয়তের শিথিল আহকামের তালাশ না করা। আহকামের কারণ তালাশে লেগে না থাকা, তবে যদি কোন কারণ (হেকমত) প্রকাশ পায় তাহলে বেশি বেশি আমল ও আনুগত্যে মনোনিবেশ করা।

◆ আল্লাহর আদেশসমূহ দুই প্রকার–

১. এমন আদেশ যা মনের অনুকূলে হয় যেমন : হালাল ভক্ষনের আদেশ, চাহিদা মতে চারটি বিবাহের আদেশ, স্থল ও জলজ প্রাণী শিকারের আদেশ ইত্যাদি।

২. এমন আদেশ যা মনের প্রতিকূলে হয়। এগুলো আবার দুই প্রকার–

  ক. হালকা আদেশ যেমন : বিভিন্ন দোয়াসমূহ, জিকিরসমূহ, আদবসমূহ, নফল ইবাদতসমূহ, সালাতসমূহ, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি।

  খ. ভারী আদেশ যেমন : আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দেয়া, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইত্যাদি। হালকা ও ভারী উভয় প্রকারের আদেশ পালনের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর ঈমান যখন বৃদ্ধি পায় তখন অপছন্দনীয় বিষয় পছন্দনীয় হয়ে যায়, ভারী হালকা হয়ে যায়। বান্দা থেকে আল্লাহর যা উদ্দেশ্য দাওয়াত ও ইবাদত তা পূরণ হয়। অতঃপর এর দ্বারা বান্দার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়।

◆ আত্মার গুণাগুণ

প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা দুই ধরনের আত্মা সৃষ্টি করেছেন : একটি সর্বদা কুমন্ত্রণাদাতা, অপরটি আল্লাহর অনুগত ও তাঁর ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল। উভয়ের মধ্যে সর্বদা বিরোধিতা। তাই একটির কাছে আল্লাহর কোন আদেশ হালকা হলে অপরটির কাছে তা ভারী হয়। একটির কাছে তা আনন্দের হলে

অন্যটির কাছে তা কষ্টের হয়। একটির সাথে সম্পর্ক ফেরেশতার অপরটির সাথে সম্পর্ক শয়তানের। সমস্ত হকের সম্পর্ক ফেরেশতা ও অনুগত মনের (আত্মার) সাথে। আর সমস্ত বাতিলের সম্পর্ক শয়তান এবং কুপ্রবৃত্তির সাথে। এভাবে অনবরত উভয়ের মাঝে যুদ্ধ লেগেই থাকে এবং হার-জিত চলতেই থাকে।

◆ সালাতের হুকুম

দিন ও রাতে প্রতিটি নারী-পুরুষ আজ্ঞাপ্রাপ্ত মুসলিমের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা ফরজ। তবে মাসিক ও প্রসূতি অবস্থার মহিলার ওপর পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ফরজ নয়। ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের গুরুত্ব কালেমায়ে শাহাদত তথা দুই সাক্ষ্যদানের পরেই।

১. আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের ওপর নির্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে।

[সূরা নিসা : আয়াত-১০৩]

২. আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন–

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ.

তোমরা নামাজসমূহের সংরক্ষণ কর; বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায (আসরের) এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেন : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিস : এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ (সত্য উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহর হজ্ব করা এবং রমযানের রোযা রাখা।

(বুখারী, হাদীস নং ৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) بَعَثَ مُعَاذًا (رضى) اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : اُدْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মু'য়ায (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন : "তাদেরেকে এ কালেমার দিকে আহবান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য (মাবুদ) নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এর আনুগত্য করে, তাহলে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন....।

(বুখারী, হাদীস নং-১৩৯৫ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৯)

◆ সাবালক তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ

শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যে প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন। বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত (লক্ষণ) সমূহের মধ্যে কিছু এমন আছে যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। যেমন : ১৫ বছরে উপনীত হওয়া, নাভীর নিচের লোম গজানো, বীর্যপাত হওয়া। আর কতগুলো লক্ষণ এমন আছে যা শুধুমাত্র পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। যেমন : দাঁড়ি ও মোচ গজানো। কিছু আলামত এমনও আছে যা শুধুমাত্র মহিলাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য যেমন : গর্ভধারণ, মাসিক ঋতুস্রাব। ছোটদেরকে ৭ বছর বয়সে সালাতের আদেশ করতে হবে এবং দশ বছর বয়সে উপনীত হলে সালাতের ব্যাপারে প্রহার করতে হবে এবং তাদেরকে বিছানা আলাদা করে দিতে হবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ .

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলাল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের ছেলেমেয়েরা সাত বছর বয়সে উপনীত হবে তখন তাদেরকে সালাতের হুকুম দাও। আর যখন দশ বছরে উপনীত হবে

অথচ নিয়মিত সালাত আদায় করে না তখন তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ করে হলেও সালাতের জন্য বাধ্য কর। আর দশ বছরের সন্তানদেরকে পৃথক পৃথক বিছানার ব্যবস্থা কর। [সহীহ্ সুনানি আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস-৪৬৫, মেশকাত শরীফ-৫২৬]

◆ **সালাতের গুরুত্ব**

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : انَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَانْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَانْ كَانَ انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْئٌ قَالَ انْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيْضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الْاَعْمَالِ يَجْرِىْ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে সালাতের। যদি সালাতের হিসাব পরিপূর্ণ পাওয়া যায়, তাহলে পরিপূর্ণ লেখা হবে। আর যদি তা হতে কিছু অপূর্ণ হয়, তাহলে (আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশ্তাদেরকে) বলবেন : দেখ তার কোন নফল সালাত পাওয়া যায় কি-না, যা তার ফরজের অপূর্ণতা পূরণ করা যেতে পারে। অতঃপর অবশিষ্ট আমলসমূহের হিসাব এভাবে চলবে।

(হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাদীস নং ৫৬৪ এবং ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৪২৫)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَالصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًاوَّلَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَىِّ بْنِ خَلْفٍ .

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম ﷺ সালাত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করবে শেষ বিচার দিবসে সে সালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ এবং নাজাতের উসীলা হয়ে

দাঁড়াবে। আর যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত পড়বে না তার জন্য কোন আলো, প্রমাণ এবং মুক্তি হবে না; বরং শেষ বিচার দিবসে সে কারূন, ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথেই উঠবে।

[সহীহ্ ইবনে হিব্বান–আরনাউত : চতুর্থ খণ্ড, হাদীস নং-১৪৬৭, মেশকাত শরীফ : ২/২১৫, হাদীস নং-৫৩১]

◆ ফরজ সালাতের সংখ্যা

হিজরতের প্রায় এক বছর পূর্বে মেরাজের রাত্রিতে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আল্লাহ্ সালাত (নামায) ফরজ করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। এটা নামাযের অধিক গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে এবং নামাযের জন্য আল্লাহ্র ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। অতঃপর আল্লাহ্ মেহেরবানী ও করুণা করে সংখ্যা কমিয়ে বাস্তব আমলে পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন, তবে সাওয়াব রেখেছেন পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই।

কেননা প্রতিটি ভালো কাজ দশ গুণ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং ৫ × ১০ = ৫০ ওয়াক্তের সাওয়াব পাওয়া যাবে। নবী করীম ﷺ বলেন–

يَا رَبِّ : اِنَّ اُمَّتِىْ ضُعَفَاءُ اَجْسَادِهِمْ وَقُلُوْبِهِمْ وَاَسْمَاعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ وَاَبْدَانِهِمْ فَخَفِّفْ عَنَّا، فَقَالَ الْجَبَّارُ : يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ : اِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ كَمَا فَرَضْتُهُ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ، قَالَ : فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا فَهِىَ خَمْسُوْنَ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ وَهِىَ خَمْسٌ عَلَيْكَ ـ

"হে আমার রব! আমার জাতি শারীরিকভাবে, মানসিক শক্তিতে, শ্রবণ শক্তিতে ও দৃষ্টি শক্তিতে দুর্বল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য হালকা করে দিন। মহান আল্লাহ জবাবে বললেন, হে মুহাম্মদ! তিনি বললেন উপস্থিত আপনার অনুগ্রহে তখন আল্লাহ্ বললেন, আমার কথার কোন পরিবর্তন হয় না, যেভাবে আমি আপনার ওপর নাযিলকৃত কিতাবে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, প্রত্যেক একটি ভালো কাজ দশটির সমতুল্য। সুতরাং মূল কিতাবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত-ই থাকল কিন্তু তোমার ওপর ফরয হলো পাঁচ ওয়াক্ত। (বুখারী– কিতাবুত তাওহীদ)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ বলেন, দিবা-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত-ই থাকল, প্রত্যেক ওয়াক্ত সাওয়াবের বেলায় দশ গুণ। সুতরাং ঐ পাঁচ ওয়াক্তই পঞ্চাশ ওয়াক্ত।

(মুসলিম– কিতাবুল ঈমান)

◆ **ফরজ সালাত অস্বীকারকারী বা সালাত ত্যাগকারীর বিধান**

যে ব্যক্তি নামায ফরজ ইহা অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি কেউ নামাযকে তুচ্ছ মনে করে অথবা অলসতা করে নামায ত্যাগ করে তার বিধানও একই। যদি সে ব্যক্তি অজ্ঞ হয়, তাহলে তাকে বুঝানো হবে। আর যদি ফরজ জেনে বুঝে নামায ত্যাগ করে তাহলে তিন দিন পর্যন্ত তাকে তওবা করার জন্য বলা হবে। এরপর যদি সে তওবা করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তওবা না করে তাহলে তাকে কাফের হিসেবে হত্যা করা হবে। (এ ধরনের হত্যা বা অন্যান্য শাস্তি প্রদানের অধিকার একমাত্র সরকারের রয়েছে। তাই যদি কেউ আইন বা বিচার ব্যবস্থা নিজের হাতে উঠিয়ে নেয় তবে তা বিদ্রোহ ও জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। সরকার তার বিচার করবেন।

১. আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ .

যদি তারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। [সূরা–৯ তাওবা : আয়াত-১১]

عَنْ جَابِرٍ (رضى) يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "কোন (মুসলিম) ব্যক্তির মধ্যে এবং কুফরি ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা। (মুসলিম হাদীস নং ৮২)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন– যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ করে, তবে তাকে হত্যা কর।

(বুখারী হাদীস নং ৩০১৭)

◆ ফরজ নামায অস্বীকারকারী বা ত্যাগকারীর অন্যান্য বিধান

১. **জীবিত অবস্থায় :** তার জন্য কোন মুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। সে কোন মুসলিমের সম্পত্তি ওয়ারিশ (উত্তাধিকারী) হবে না। সে কোন পশু-পাখি জবাই করলে তা হারাম হয়ে যাবে। মক্কা শরীফ ও মক্কার হারাম এলাকার ভিতরে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ; কেননা সে কাফের।

২. **মৃত্যুর পরে :** তাকে গোসল ও কাফন দেয়া হবে না। তার জানাজার নামায পড়া হবে না। তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না। কারণ সে মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার জন্য রহমতের দু'আ করা হবে না এবং সে কাউকে ওয়ারিশ বানাবে না। সে অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নামে জ্বলবে; কেননা সে কাফের।

যে ব্যক্তি একেবারেই নামায ত্যাগ করেছে, ভালোমত পড়ে না সে কাফের এবং মুরতাদ তথা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। তবে যে কখনো আদায় করে আবার কখনো আদায় করে না। সে কাফের নয়, বরং ফাসেক। কবীরা গুনাহকারী নিজের ওপর অনেক বড় জুলুমকারী, আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের নাফরমান।

◆ নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلَاةٍ مَا كَانَ فِيْ مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ حَتّٰى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নামাযের স্থানে বসে নামাযের অপেক্ষা করে ততক্ষণ সে নামাযেই থাকে। আর ফেরেশতাগণ বলতে থাকেন : হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তাকে দয়া করুন! এভাবে ফেরেশতাগণ তার জন্যে দু'আ করতে থাকেন। যতক্ষণ নামাযের স্থান ত্যাগ না করে বা ওজু নষ্ট না করে ফেলে।

(বুখারী হাদীস নং ১৭৬ মুসলিম হাদীস নং ৬৪৯)

◆ **পবিত্র অবস্থায় মসজিদে নামাযের উদ্দেশ্যে গমনের ফযীলত**

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى اِلٰى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ اِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْاُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বাড়িতে ওযু করে অতঃপর আল্লাহর কোন ঘরের দিকে গমন করে তাঁর ফরজ আদায়ের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তির এক ধাপ তার গুনাহ মিটিয়ে দেয় এবং অপর ধাপ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। (মুসলিম হাদীস নং ৬৬৬)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يَنْصِبُهُ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلٰى اَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ.

২. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় নিজ বাড়ি থেকে কোন ফরজ নামাযের জন্য বের হয়, ঐ ব্যক্তির সাওয়াব ইহরাম অবস্থায় আছে এমন হজ্ব পালনকারীর সওয়াবের মতো। আর যে ব্যক্তি চাশতের তাসবিহ (নামাযের)-এর জন্য বের হয় এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বের হয়নি, তার সওয়াব উমরা পালনকারীর ন্যায়। আর এক নামাযের পরে অপর নামায যার মধ্যে কোন প্রকার অনর্থক কথা নেই তা ইল্লিয়িনে লিখিত হয়।" (হাদীসটি হাসান আবূ দাউদ হাদীস নং ৫৫৮)

◆ **যা দ্বারা নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় :** নামাযে একাগ্রতা কতগুলো জিনিসের মাধ্যমে অর্জিত হয় তন্মধ্যে–

১. মনকে হাজির করা।

২. যা পড়ছে বা শুনছে তা বুঝা ও অনুধাবন করা।

৩. আল্লাহর সম্মান, আর তা অর্জিত হবে দু'টি জিনিসের মাধ্যমে–

ক. আল্লাহর বড়ত্বের পরিচয় লাভ করা।

খ. নিজের নগন্যতার পরিচয় লাভ করা। যার দ্বারা আল্লাহর জন্য নিজেকে ছোট করা সম্ভব হবে এবং তার জন্য একাগ্রতা সৃষ্টি হবে।

৪. ভীতি, আর এটা সম্মানের চেয়ে উর্ধ্বতন বিষয়। আল্লাহর কুদরত (শক্তি বা ক্ষমতা) ও তার সম্মানের এবং আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে বান্দার অবহেলা থেকে এই ভীতির উৎপত্তি হয়।

৫. আশা-ভরসা, আর তা হলো নামাযের দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট সাওয়াবের আশা করা।

৬. **লজ্জাবোধ :** আল্লাহর নিয়ামতের পরিচয় এবং আল্লাহর বিষয়ে বান্দার অবহেলা থেকে এটা সৃষ্টি হয়।

◆ আল্লাহকে হাজির নাযির জানা

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

অর্থ : তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তাকে দেখতে না পাও। (সেই স্তরে তুমি পৌঁছতে না পার) তবে অন্তত এ ধারণা রাখ যে, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে দেখছেন।

(বুখারী, মুসলিম)

◆ এমন ফযীলত যা ইবাদতের মূলের সাথে সম্পৃক্ত যেমন

নামাযে খুশূ' (অন্তরের ভয়) ও খুযূ' (বাহ্যিক ভয়) তার সংরক্ষণ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ফজীলতের চেয়ে। তাই একাগ্রতা ঠিক রাখার জন্য এমন স্থানে নামায আদায় করবে না যেখানে ভিড় ইত্যাদি বেশি। জুমুআর নামাযের পরের সুন্নাত স্থান পরিবর্তন করে পড়া বিধি সম্মত। অন্যান্য সাধারণ নফল নামায পড়ার ক্ষেত্রে নিরিবিলি স্থানে বা একাগ্রতা নষ্ট হবে না এমন স্থান খুঁজে নিবে, কারণ নামাজে একাগ্রতা তার মূল জিনিস।

◆ আদেশ-নিষেধের সূক্ষ্ম জ্ঞান

মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞাত। তিনি কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুর নির্দেশ করেন না এবং যার মধ্যে বিপর্যয় আছে শুধুমাত্র তা থেকেই নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশাবলি, প্রবৃত্তির চাহিদা, ওয়াজিবসমূহ ও

হারাম বস্তু দ্বারা কে তাঁর আনুগত্য করে, আর কে নাফরমানি করে তার মাঝে পার্থক্য করার জন্য পরীক্ষা করেন। অতএব, নির্দেশাবলি যেমন : ওয়াজিব ও মুস্তাবসমূহ এবং নিষেধাবলি যেমন : হারাম ও মকরূহসমূহ। এর মধ্যে যেগুলো নির্দেশ সেগুলো খাদ্য তুল্য যার দ্বারা শরীর দাঁড়িয়ে থাকে। আর নিষেধগুলো বিষের মতো যা শরীরকে ধ্বংস করে ফেলে। তাই যে ব্যক্তি এটি একিন করতে পারবে তার অন্তর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং নির্দেশ পালনে আত্মা খুশি হয়ে যাবে। আর আল্লাহর ভালোবাসা ও মহত্বের জন্য এবং তিনি যা পছন্দ করেন তা দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় নিষেধাবলি থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু যখন ঈমান দুর্বল হবে তখন মানুষ টালবাহনা, বিদায়াত ও পাপের দিকে ঝুকে পড়বে এবং সৎকর্ম করতে অলসতা প্রদর্শন করবে। এ ছাড়া নির্দেশ ও নিষেধের ব্যাপারে অবহেলা এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। আর ছোট ও বড় মুনাফেকি একত্র করবে এবং তার পদস্খলন ঘটে জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহর বাণী–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا - اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَايُظْلَمُوْنَ شَيْئًا.

অতঃপর তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের ওপর কোন জুলুম করা হবে না।

[সূরা ১৯–মারইয়াম : আয়াত-৫৯-৬০]

◆ **যে সকল সময় আল্লাহর নিকট আমল পেশ করা হয়**

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا

إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়। অতঃপর যেসব মুসলিম বান্দা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে না তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু ঐ যে ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের মাঝে হিংসা রয়েছে তাকে ছাড়া। বলা হবে : অপেক্ষা করো এদের দুজনের মাঝে যতক্ষণ মীমাংসা না হয়। অপেক্ষা করো এদের দুজনের মাঝে যতক্ষণ মীমাংসা না হয়। (মুসলিম হাদীস নং ২৫৬৫)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ পরস্পরা আগমন করেন। আর আসর ও ফজরের সালাতে একত্রিত হয়। অতঃপর যারা তোমাদের নিকট রাত্রি যাপন করে তারা উপরে উঠে যায়। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি বেশি অবগত। তোমরা আমার বান্দাদেরকে কিরূপ ছেড়ে আসলে? তখন ফেরেশেতাগণ বলে : তাদেরকে সালাতরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং সালাতরত অবস্থায় তাদের নিকট গিয়েছিলাম। (বুখারী হাদীস নং ৫৫৫ ও মুসলিম হাদীস নং ৬৩২)

২. আজান ও একামত

আজান : আজান হলো আল্লাহর ইবাদত, যা বিশেষ শব্দের মাধ্যমে নামাজের সময় প্রবেশ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়।

শরিয়তে আজান শুরু হয়েছে হিজরীর প্রথম বছর থেকে।

◆ ইসলামে আজানের বিধিবিধানের হেকমত

১. আজান নামাজের সময় ও স্থানের ঘোষণা এবং নামাজ ও জামাতের দিকে আহবান, যাতে অনেক মঙ্গল নিহিত আছে।

২. আজান গাফেলদের সতর্কবাণী ও যারা নামাজ আদায়ের কথা ভুলে যায় তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম। নামাজ সবচেয়ে বড় নিয়ামত, যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটতম করে দেয়। এটাই কামিয়াব। আর আজান মুসল্লিদের জন্য আহবান, যাতে করে এই নিয়ামত তাদের হাত ছাড়া না হয়।

একামত : এটি আল্লাহর ইবাদত যা বিশেষ শব্দের দ্বারা নামাজ কায়েমের ঘোষণা দেয়া হয়।

◆ আজান ও একামতের বিধান

শুধুমাত্র পুরুষদের উপর ফরজে কেফায়া। এমনকি সফর অবস্থাতেও। আজান ও একামত শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমার নামাজের জন্য দেয়া হবে। (ফরজে কেফায়া এমন ফরজকে বলা হয় যা কিছু সংখ্যক মানুষ আদায় করলে সবার ফরজ আদায় হয়ে যায়। যেমন : জানাযার নামাজ ইত্যাদি। আর যদি কেহই আদায় না করে তবে সবাই ফরজ ত্যাগের গুনাহে শামিল হবে।

◆ নবী করীম ﷺ-এর মুয়াজ্জিনের সংখ্যা চারজন

১. বিলাল ইবনে রবাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে নববীতে।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে নববীতে।

৩. সা'দ আল কুরয (রা) কুবা মসজিদে।

৪. আবু মাহযূরা (রা) মক্কার মসজিদুল হারামে।

আবু মাহযূরা (রা) আজানে তারজী' ও একামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলতেন। আর বিলাল (রা) আজানে তারজী' করতেন না ও একামতের শব্দগুলো বেজোড় বলতেন। (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার ও ক্বদকা–মাতিসসালাহ্ দুবার করে এবং বাকি বাক্যগুলো শুধু একবার করে বলতেন।

◆ আজানের ফযীলত

আজানের শব্দ উচ্চশব্দে হওয়া বিধিসম্মত, কেননা মুয়াজ্জিনের আজানের শব্দ যত দূর যাবে ততদূরের মধ্যে যে কোন মানুষ, জ্বীন বা যে কোন বস্তু এই শব্দ শুনবে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। মুয়াজ্জিনের শব্দ যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যে কোন জীব ও জড় পদার্থ তার শব্দ শুনবে, তাকে সর্মথন দেবে বা সত্যায়িত করবে। যত মানুষ তার সাথে তার আজানের দ্বারা নামাজ পড়বে তাদের সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব তারও হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি মানুষ জানত আজানে ও নামাজের প্রথম সারিতে কি আছে এবং লটারী ছাড়া তা অর্জন সম্ভব না হতো, তাহলে লটারী করে হলেও তা অর্জনের চেষ্টা করত।

(বুখারী হাদীস নং ৬১৫ মুসলিম হাদীস নং ৪৩৯)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি লম্বা ঘাড় হবে মুয়াজ্জিনদের।" (মুসলিম হাদীস নং ৩৮৭)

◆ সহীহ হাদীসে বর্ণিত আজানের নিয়মাবলি

১৫, ১৯, ১৭ ও ১৩ বাক্য দ্বারা আযানের চারটি নিয়ম−

প্রথম নিয়ম : এটি হচ্ছে বিলাল ﷺ-এর আজান। তিনি এভাবে নবী করীম ﷺ-এর সময়ে আজান দিতেন। আর তা পনেরোটি বাক্যের সমন্বয়ে।

১. আল্লাহু আকবার	৯. হাইয়া 'আলাসসলাহ্
২. আল্লাহু আকবার	১০. হাইয়া 'আলাসসলাহ্
৩. আল্লাহু আকবার	১১. হাইয়া 'আলালফালাহ্

৪. আল্লাহু আকবার
৫. আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
৬. আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
৭. আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
৮. আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
১২. হাইয়া 'আলালফালাহ্
১৩. আল্লাহু আকবার
১৪. আল্লাহু আকবার
১৫. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৯৯, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৭০৬)

দ্বিতীয় নিয়ম : আবু মাহযূরা (রা)-এর আজান। তার আজানে রয়েছে উনিশটি (১৯) বাক্য। আজানের শুরুতে ৪টি তাকবীর এবং তারজী' (তথা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দুবার ছোট শব্দে বলার পর আবার দুবার করে উঁচু শব্দে ও লম্বা করে বলা।

(সুনানে আবু দাউদ প্রথম খণ্ড হাদীস নং-৪৭৫)

তৃতীয় নিয়ম : আবু মাহযূরা (রা)-এর আজানের মতই, তবে প্রথমের তাকবীর মাত্র দুবার অর্থাৎ আল্লাহু আকবার ২ বার ফলে সর্বমোট বাক্য হবে সতেরটি (১৭টি)। (মুসলিম হাদীস নং ৩৭৯)

চতুর্থ নিয়ম : আজানের সকল বাক্যই দুবার করে, তবে শেষে কালেমা তাওহীদ একবার। ফলে সর্বমোট বাক্য হবে তেরটি (১৩টি)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـى) قَالَ : كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً : اِلَّا اَنَّكَ تَقُوْلُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় আজান দুবার করে ছিল এবং একামত ছিল একবার করে। তবে তুমি একামতে অতিরিক্ত বলবে ক্বদ ক্বা-মাতিস্‌সলাহ্ ক্বদ ক্ব-মাতিসলাহ্।

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ৫১০, নাসাই হাদীস নং ৬২৮)

উপরোক্ত সকল নিয়মেই আজান দেয়া সুন্নাত। বিভিন্ন সময় ও স্থানে বিভিন্নভাবে দিবে যেন সুন্নাত সংরক্ষিত হয় এং আজানের বিভিন্ন সুন্নাতি পদ্ধতি ও নিয়ম বহাল থাকে। তবে এটা তখনই প্রয়োগ হবে যখন ফিতনার ভয় থাকবে না।

মুয়াজ্জিন ফজরের আজানে "হাইয়া 'আলালফালাহ"-এর পরে–

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ .

"আস্সালাতু খাইরুম মিনাননাউম, আস্সালাতু খাইরুম মিনাননাউম" বাক্য দুটি অতিরিক্ত বলবে। পূর্বে উল্লিখিত সকল নিয়মের আজানে এ বাক্যদ্বয় ফজরের আজানে সংযোজন করবে। (ইবনে খুজায়মা-১/২০২)

◆ **আজান শুদ্ধ হওয়ার শর্ত**

আজানের শব্দগুলো ধারাবাহিকভাবে একের পরে এক হতে হবে। নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পর আজান দিতে হবে। মুয়াজ্জিন যেন মুসলিম, পুরুষ, বিশ্বাসী, আজান আরবী ভাষায় হতে হবে যেভাবে হাদীসে এসেছে। একামতও আজানের মতোই।

মধুরসুরে উচ্চ শব্দে আজান দেয়া সুন্নাত। 'হাইয়া 'আলাস্সালাহ' বলার সময় ডানে এবং 'হাইয়া 'আলালফালাহ' বলার সময় বাম দিকে দৃষ্টি ফিরাবে। অথবা দুই বাক্যের প্রতেক্যটি একবার ডানে ও একবার বামে দৃষ্টি ফিরাবে তা সুন্নাত।

মুয়াজ্জিনের জন্য সুন্নাত হলো : তিনি উচ্চধ্বনিবিশিষ্ট ও সময় সম্পর্কে জানেন এমন ব্যক্তি হওয়া। পবিত্রাবস্থায় দাঁড়িয়ে আজান দেয়া সুন্নাত। আজানের সময় দুই আঙ্গুল দুই কানে রেখে উঁচু জায়গায় উঠে আজান দেয়া সুন্নাত।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সবগুলোতে সময় হওয়ার আগে আজান দিলে তা আদায় হবে না। ফজরের একটু পূর্বে (তাহাজ্জুদের) আজান দেয়া সুন্নাত। এর ফলে নফল নামাজ শেষ করে ঘুমন্ত ব্যক্তি রোজা রাখতে চাইলে জাগ্রত হয়ে সেহরী খেতে পারে। আর যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ছে, সে তা শেষ করে যিকির করতে পারে। এরপর ফজরের সময় হলে ফজরের আজান দিবে।

◆ **আজান শ্রবণকারী যা বলবে**

পুরুষ ও নারী যেই হোক না কেন আজান শুনলে তার জন্য সুন্নাত হলো–

১. মুয়াজ্জিন যা বলবে হুবহু তাই বলবে যেন তার সমতুল্য সওয়াব পায়। তবে 'হাইয়া 'আলাস্সালাহ ও হাইয়া 'আলালফালাহ'-এর উত্তরে শ্রোতা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে।

২. আজান শেষে মুয়াজ্জিন ও শ্রোতা উভয়েই চুপে চুপে দরূদ পাঠ করবে।

৩. এর পরে আজানের দু'আ পড়া সুন্নাত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ- حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি আজান শুনে এই দু'আ বলবে :

"আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত্তা–ম্মাহ্, ওয়াস্সলাাতিল ক্ব–য়িমাহ্, আতি মুহাম্মানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাহ্, ওয়াব'আছহু মাক্ব–মাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহ্।" তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে।"

(বুখারী হাদীস ৬১৪)

৪. মুয়াজ্জিনের আজান শেষে নিচের শাহাদাতাইন বলবে–

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ .

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বলবে : "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ্। ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহ্। রাযীতু বিল্লাহি রব্বা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রসূলা, ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনা। তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"(মুসলিম হাদীস নং ৩৮৬)

৫. অতঃপর নিজের জন্য ইচ্ছামত দু'আ করবে।

◆ আজানের প্রতি উত্তরের ফযীলত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ (رضى) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ عَلَىَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِى الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ لِى الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যখন আজান শুনবে তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বল। অতঃপর আমার ওপর দরূদ পাঠ কর; কারণ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট অসিলার প্রার্থনা কর; কেননা অসিলা জান্নাতের মধ্যে একটি মর্যাদার নাম। এ মর্যাদা আল্লাহর একজন বান্দা ব্যতীত অন্য কারো জন্য শোভনীয় হবে না। আমি আশাবাদী যে, সে বান্দা আমিই হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসিলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে। (মুসলিম হাদীস নং ৩৮৪)

যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে পড়তে চায় অথবা ছুটে যাওয়া নামাজসমূহ কাজা করতে চায়, সে শুধুমাত্র প্রথম নামাজের জন্য আজান দিবে এবং বাকি ফরজ নামাজগুলোর জন্য শুধুমাত্র একামত দিবে।

যদি অতি গরমের কারণে যোহরের নামাজ দেরীতে পড়তে হয় বা এশার নামাজ উত্তম ওয়াক্তে আদায় করার জন্য দেরী করে, তাহলে নামাজের ঠিক কিছু সময় আগে আজান দেয়া সুন্নাত।

যদি একাধিক মুয়াজ্জিন আজানের জন্য প্রতিযোগিতা করে তাহলে যার কণ্ঠ সর্বাধিক সুন্দর সে আজান দিবে। যদি কণ্ঠ বরাবর হয় তাহলে দ্বীন ও জ্ঞান বুদ্ধিতে বেশি উত্তম তাকে নিযুক্ত করা হবে। আর যদি তাতেও বরাবর হয়, তাহলে মসজিদবাসী যাকে বাছাই করবে। অতঃপর লটারীর মাধ্যমে নিয়োগ দিবে। একই মসজিদে দুই মুয়াজ্জিন নিয়োগ বৈধ।

◆ আজান দেয়ার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءَ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন নামাজের আজান দেয়া হয় তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিছনের দিকে পালাতে থাকে। যতদূর আজানের শব্দ শুনা যায় সে ততদূর পালিয়ে যায়। অতঃপর যখন আজান শেষ হয় তখন সামনে আসতে থাকে। আবার যখন একামত শুরু হয় তখন পিছু হটতে থাকে। আর যখন একামত শেষ হয় তখন আবার আসতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলে, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, যা পূর্বে সে স্মরণ করতে পারে নি। পরিশেষে সে বলতেই পারে না যে, সে কত রাকায়াত নামাজ পড়েছে।

(বুখারী হাদীস নং ৬০৮ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ৩৮৯)

◆ একাধিক আজানের বিধান

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য সময় হলে একবার করে আজান দিতে হবে। কিন্তু জুমার সালাতের জন্য দু'বার করে আজান দেয়ার অবকাশ রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও এক আযান দেয়া সরাসরি নবীর সুন্নাত। জুমুআর দুই আযান খলীফা উসমান (রা) কর্তৃক প্রচলিত। মদীনার জনবসতি দুরদুরান্ত ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে মসজিদে নববীর আযানের শব্দ সে পর্যন্ত না পৌছানোর দরুন মসজিদে নববী থেকে দূরবর্তী জাওরা নামক স্থানে তিনি প্রথম আযান প্রচলন করেন। যাতে করে দূরবর্তী লোকেরা জুমআর নামাযের সময় সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং যথাসময় মসজিদে উপস্থিত হতে পারে এ আযানটি ছিল মূল আযান থেকে কিছু আগে। তাই জুমার প্রথম আজান দ্বিতীয় আজান হতে এতটুকু আগে হতে হবে যাতে করে গোসল করে মসজিদে আসতে পারে। জুমার দিনে যখন দ্বিতীয় আজান হবে তখন ইমাম সাহেব খুৎবার জন্য মিম্বরের উপর বসবেন। আর যে

দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করবে কিংবা ছুটে যাওয়া একাধিক সালাতের কাজা করবে সে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আজান দেবে। এরপর প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য একামত দেবে।

◆ ইমামতী ও আজান দিয়ে বেতন নেয়ার বিধান

একজন মুয়াযিযনের দায়িত্ব শুধু আযান দেয়া যা অতি সামান্য সময়ে জন্য এই জন্য এর বিনিময়ে নিতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি আযান দেওয়ার দায়িত্বের সাথে সাথে অন্যান্য দায়িত্বে মুয়াযিযনের ন্যস্ত থাকে কিংবা তাকে আযান দেওয়ার জন্য রিজাব করে নেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে মুয়াযযিন হাদিয়া নিতে পারবেন। আর ইমামের দায়িত্ব হচ্ছে সালাতের ইমামতি করার সাথে সাথে সমাজকে পরিচালনা করার দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই এর দ্বীনের সেবা সময়ের পরিধি বিস্তৃতি তাই ইমামের জন্য ইমাতির বিনিময়ে হাদিয়া নিতে ইসলামে নিষেধ নেই। সুতরাং একজন ইমামের প্রতি ইমামতি ও তার আনুসঙ্গিত দায়িত্ব ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব ন্যস্ত নাও থাকে তবুও ইমাম তার ইমামতির বিনিময়ে হাদিয়া পারবে।

◆ আজানরত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে তার বিধান

কোন ব্যক্তি আযান চলাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে অথবা মসজিদে কিংবা তার আশেপাশে থাকলে আযানের উত্তর ও আযানের শেষে দোয়া পড়ে দু'রাকাত তাহিয়াতুল মাসজিদ আদায় করে মসজিদে বসবে।

(সহীহ বুখারী হাদীস-৮৮৮; মুসলিম, হাদীস-৭১৪; সুনান আরবায়া)

◆ আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান

আজানের পরে কোন প্রয়োজন যেমন : অসুখ এবং ওযু নবায়ন ইত্যাদি ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নেই।

عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءَ (رضى) قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَانُوْدِىَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ (رضى) فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

আবু শা'শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আযানের পর সালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে বের হলো, তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেম ﷺ-এর অবাধ্য কাজ করল।

(সহীহ্ সুনান আল নাসাঈ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৬৬০)

◆ সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী ইকামতের পদ্ধতি

তরতিবেও পর্যায়ক্রমে নিচের উল্লেখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে একামত দেয়া সুন্নাত– ১১, ১৭ ও ১০টি বাক্য সম্বলিত ইকামতে ৩ পদ্ধতি।

১. **প্রথম পদ্ধতি :** এতে এগারোটি বাক্য রয়েছে যা বেলাল (রা)-এর একামত। তিনি এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একামত দিতেন। তা হলো–

১. আল্লাহু আকবার, ২. আল্লাহু আকবার
৩. আশহাদু আন্না লা ইলাহা, ৪. আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
৫. হাইয়া 'আলাস্‌সলাহ্, ৬. হাইয়া আলালফালাহ
৭. ক্বদ ক্ব-মাতিসসলাহ্, ৮. ক্বদ ক্ব-মাতিসসলাহ
৯. আল্লাহু আকবার, ১০. আল্লাহু আকবার
১১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৯৯)

২. **দ্বিতীয় পদ্ধতি :** এতে সতেরটি বাক্য রয়েছে, যা আবু মাহযূরা (রা) এর একামত : তাকবীর (আল্লাহ আকবার) চারবার। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দু'বার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দু'বার, হাইয়া 'আলাসসলাহ, ও হাইয়া 'আলালফালাহ দু'বার করে। ক্বদ কমাতিসসলাহ দু'বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দু'বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' একবার।
(হাদীসটি হাসান ও সহীহ, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৫০২, সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ১৯২)

৩. **তৃতীয় পদ্ধতি :** এতে সর্বমোট বাক্য দশটি : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস সলাহ্, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, ক্বদ্ কমাতিসসালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"
(হাদীসটি হাসান, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৫১০, সুনানে নাসাঈ হাদীস নং ৬২৮)

আমাদের বর্তমান সমাজে আমরা বিলাল (রা)-এর আযান দেই আর আবু মাহযুরা (রা)-এর ইকামত দেই।

যদি ফিৎনার ভয় না থাকে তাহলে বিভিন্ন প্রকারের সুন্নাত জীবিত ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে, বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে একামত দেয়াই সুন্নাত।

আজান ও একামতের মাঝে দোয়া করা ও নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব।

আজান ও একামত, নামাজ ও খুৎবাতে মাইক বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা প্রয়োজন হলে বৈধ। এতে কোন আসুবিধা হলে বা অপরের সমস্যা হলে এগুলোর ব্যবহার করা যাবে না।

আজান ও একামতের দায়িত্ব একই ব্যক্তির নেয়া সুন্নাত। আজানের ব্যাপারে মুয়াজ্জিনের ক্ষমতা বেশি এবং একামতের ব্যাপারে ইমামের ক্ষমতা বেশি। সুতরাং ইমামের ইশারা বা দেখা কিংবা তাঁর দাঁড়ানো ইত্যাদি ছাড়া মুয়াজ্জিন একামত দিবেন না।

আজানের প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা করে এক নিশ্বাসে বলা সুন্নাত এবং শ্রোতারাও একইভাবে উত্তর দিবে। একামতের উত্তরের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ থেকে কোন জিকির শরিয়ত সম্মতভাবে সাব্যস্ত নেই। (যারা একামতের উত্তরের কথা বলেন তারা আজানের উপর কিয়াস করে বলেন; কারণ একামতকেও আজান বলা হয়েছে।)

অত্যাধিক শীতের সময়ে (ঠাণ্ডাতে) বা বৃষ্টির রাত্রি ইত্যাদিতে হাইয়া 'আলাসসালাহ ও হাইয়া 'আলালফালাহ্ এরপরে অথবা আজান সমাপ্ত হওয়ার পরে মুয়াজ্জিনের জন্য নিচের যে কোন একটি বাক্য বলা সুন্নাত : اَلصَّلَاةُ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ "আসসালাতু সল্লূ ফিররিহাল। অর্থ : শোন! তোমরা নিজ নিজ গৃহে নামাজ আদায় কর। অথবা বলবে : اَلَا صَلُّوْا فِى بُيُوْتِكُمْ . "আলা সল্লূ ফী বুয়ূতিকুম।" (সহীহ বুখারী হাদীস-৬৩২ ও ৯০১)

তোমরা তোমাদের বড়িতে নামাজ আদায় কর। কখনো এটা আর কখনো ওটা বলবে। আর যারা কষ্ট করে মসজিদে হাজির হতে চায় তাদের কোন অসুবিধা নেই।

◆ সফর অবস্থায় আজান ও একামত

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضى) قَالَ اَتَى رَجُلَانِ النَّبِىَّ ﷺ يُرِيْدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اِذَا اَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا.

মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : দুই ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা পোষণ করে নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলে নবী করীম ﷺ তাদেরকে বললেন : যখন তোমরা (সফরে) বের হবে, তখন তোমরা আজান দিবে। অতঃপর একামত দিয়ে তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।

(বুখারী হাদীস নং ৬৬৬ মুসলিম হাদীস নং ৬৯৩)

◆ **আজান ও একামতের দিক থেকে নামাজের চার অবস্থা**

১. এমন নামাজ যাতে আজান ও একামত আছে : আর তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমার নামাজ।

২. এমন নামাজ যাতে একামত আছে, কিন্তু আজান নেই। আর তা হলো : ঐ দুই নামাজের দ্বিতীয়টি যা সফর ইত্যাদি একত্রে আদায় করা হয় এবং কাজা নামাজসমূহ।

৩. এমন নামাজ যার জন্য বিশেষ শব্দ বা বাক্যে আজান রয়েছে। আর তা হচ্ছে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ।

৪. এমন নামাজ যার আজান ও একামত কিছুই নেই। আর তা হলো : নফল নামাজ, জানাযার নামাজ, দুই ঈদের নামাজ ও বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত ইত্যাদি।

৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়

দিন ও রাত্রিতে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।

◆ **পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময়সূচি**

১. **যোহরের সময় :** সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া থেকে শুরু করে কোন বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার ছায়া উক্ত বস্তুর সমান হওয়া পর্যন্ত। তবে অতি গরমের সময় দেরী করে আবহাওয়া কিছুটা ঠাণ্ডা হলে আদায় করা সুন্নাত। যোহরের নামাজ চার রাকায়াত।

২. **আসরের সময় :** জোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য হলুদবর্ণ হওয়া পর্যন্ত। তবে দেরী না করা সুন্নাত। আসরের নামাজ চার রাকায়াত।

৩. **মাগরিবের সময় :** সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে পশ্চিম আকাশের লালিমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তবে দেরী না করে সময়ের শুরুর ভাগে আদায় করে নেয়া সুন্নাত। মাগরিবের নামাজ তিন রাকায়াত।

৪. **এশার নামাজের সময় :** মাগরিবের লালিমা দূর হওয়া থেকে শুরু করে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত। আর জরুরি অবস্থায় সুবহে সাদিক (ফজর) পর্যন্ত আদায় করতে পারে। রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা উত্তম, যদি তা সহজে সম্ভব হয়। এশার নামাজ চার রাকায়াত।

৫. **ফজরের সময় :** সুবহে সাদিক তথা ফজর হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তবে বিলম্ব না করাই উত্তম। সুন্নাত হলো গালাস তথা অন্ধকারে নামাজ আরম্ভ করে অন্ধকার থাকতেই শেষ করা। আর কখনো অন্ধকারে শুরু করে ফর্সা হলে শেষ করা। ফজরের নামাজ দুই রাকায়াত।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী–

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং কায়েম করুন ফজরের সালাতও। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়। [সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৭৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী–

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّاوَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ.

অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে। আর অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা ।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاتِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ اَمَرَهُ فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ

السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ.

৩. বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে নামাজের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে বলেন– "আমাদের সাথে এই দুই দিন নামাজ আদায় কর। অতঃপর যখন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে গেল, তখন বেলালকে আজানের আদেশ করলে সে জোহরের আজান দিল। অতঃপর তাকে একামতের আদেশ করলে সে একামত দিল। অতঃপর আসরের ইকামতের আদেশ করলে সে একামত দিল। এ সময়ে সূর্য পরিষ্কার, সাদা ও উপরে ছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে সূর্যাস্তের সময় একামতের আদেশ করলে সে মাগরিবের একামত দিল।

অতঃপর তিনি তাকে একামতের আদেশ করলে (পশ্চিম আকাশে) লালিমা দূর হওয়ার পর সে এশার একামত দিল। অতঃপর একামতের আদেশ করলে সে ফজরের একামত দিল। আর তা ছিল ফজরের (সুবহে সাদেকের) পর। এরপর যখন দ্বিতীয় দিন আসল তখন তিনি আজান ও একামতের আদেশ করলেন। তবে জোহরের নামাজের জন্য আবহাওয়া ঠাণ্ডা করে নিলেন এবং তাতে বেশ বিলম্বে জোহর আদায় করলেন। আর সূর্য বেশ উপরে থাকতেই আসরের নামাজ আদায় করলেন। তবে পূর্বের চেয়ে দেরী করে আদায় করলেন। আর মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন পশ্চিম আকাশের সাদা লালিমা দূর হওয়ার আগেই। রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে এশার নামাজ আদায় করলেন। আর ফজরের নামাজ আদায় করলেন অন্ধকার দূর হয়ে আলোকিত হওয়ার পরে। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন : "নামাজের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিটি কোথায়? তখন ঐ ব্যক্তি বললেন : (এই তো) আমি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি ﷺ বললেন : "তোমরা দুই দিনে যা দেখলে তার মধ্যবর্তী সময় হলো তোমাদের নামাজের সময়।" (মুসলিম, হাদীস নং ৬১৩)

◆ **প্রচণ্ড গরমের সময় যখন সালাত আদায় করবে**

যদি গরম তীব্র হয় তাহলে জোহরের নামাজ বিলম্ব করে আসরের কাছে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী–

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

"গরম তীব্র হলে যোহরের নামাজ বিলম্বে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পরে আদায় কর; কারণ অতি গরম জাহান্নামের ভাপের অংশ।

(বুখারী হাদীস নং ৫৩৬ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ৬১৬)

◆ যখন নামাজের সময় অস্পষ্ট হবে তখন সালাতের সময়

যদি কেহ্ এমন দেশে বসবাস করে যেখানে গ্রীষ্মকালের সূর্য কখনো অস্তমিত হয় না এবং শীত কালে সূর্য কখনো উদিত হয় না। অথবা এমন দেশে অবস্থান করে মনে করুন ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয়, তাহলে এ ধরনের দেশের অধিবাসীরা ২৪ ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। এতে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ধারণ করবে নিকটতম কোন দেশের সময়ের সাথে মিলিয়ে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য পৃথক পৃথক সময় নির্ধারিত আছে।

৪. সালাতের শর্তাবলী ও রোকনসমূহ

নামাজের রোকনসমূহ তথা যা ছাড়া নামাজ সহীহ্ হবে না তা হচ্ছে মোট ১৪টি– সালাত শুরু করার পূর্বে এমন কতিপয় কাজ করা আবশ্যক হয় যেগুলো ছাড়া সালাত সহীহ্ হয় না। এ কাজগুলো ফিক্হের পরিভাষায় সাধারণভাবে শর্তাবলী নামে অভিহিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সালাতের করণীয় কাজগুলোর কোনটি ফরজ, আরকান, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মোস্তাহাব রাসূল বা সাহাবীগণ নির্ণয় করেননি। পরবর্তী সময়ের ইমাম ও বিশ্বস্বীকৃত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষকগণ রাসূলের কাজের ধরন, কথন, পঠন ও বাস্তবায়নের ভিত্তিতে ওয়াজিব সুন্নাত নামে কাজগুলোকে স্বতন্ত্র করেন। কাজগুলোর ধারাবাহিকতা এবং পরিচিত এরূপ–

১. সব ধরনের নাপাকী থেকে দেহ্ পবিত্র হওয়া

২. সালাত আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তির পরিধেয় পোশাক পবিত্র হওয়া।

[এসব কার্যাবলী সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত হিসেবে কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।]

ক. কুরআনে আছে– وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"অতঃপর তোমার পোশাক পরিষ্কার কর।" (মুদ্দাস্সির-৪) অপর আয়াত–

رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ .

"লোকেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসে; বস্তুত: আল্লাহ্ও পাক পবিত্র লোকদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা তাওবা : আয়াত-১০৮)

খ. হাদীস : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ

সালাতের প্রারম্ভিকা পবিত্রতা (ওযূ করা)।

বুখারী ও মুসলিমের অপর হাদীসে আছে–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرِصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُصَلِّىْ فِيْهِ -

"মহিলাদের মাসিক রক্তস্রাব যদি কাপড়ে লেগে যায়, তাহলে তা থেকে কাপড় পবিত্র করার সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেন যে, কাপড়ের ঋতিস্রাবের রক্ত গাঢ় হলে তা খুটিয়ে খুটিয়ে প্রথমে ঝরিয়ে ফেলবে। অতঃপর পানি দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করবে, অতঃপর সেই কাপড়ে নামায পড়বে। {সম্পূর্ণ কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন নেই}

৩. সালাত আদায়ের স্থান বা বিছানা পবিত্র হওয়া : ভুল বা অজ্ঞতাবশত নাপাক দেহ পোশাক বা বিছানায় সালাত আদায় করলে সালাত হয়ে যাবে, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

যদি দেহ বা পোশাকের কিছু অংশ নাপাক থাকে এবং ধৌত করার পানি না থাকে তাহলে ঐ শরীর বা কাপড় দ্বারা সালাত আদায় করা সহীহ। এমনিভাবে কাপড়ের বেশির ভাগ অংশ এমনকি সমস্ত কাপড়েও যদি নাপাক থাকে এবং কাপড় ধোয়ার পানি না থাকলে ঐরূপ কাপড়ে সালাত আদায় জায়িয হবে।

অপবিত্র মাটিতে পবিত্র বিছানা বিছায়ে সালাত পড়তে নিষেধ নেই। মাটিতে কোনো ধরনের নাজাসাত না থাকার নিশ্চয়তা থাকলে মাটি সাধারণভাবে পাক। যে কোনো ধরনের মাটি, বালি, পাথর ইত্যাদিতে সালাত আদায় করা সহীহ।

কিন্তু কবরস্থান, মাযার, আস্তাবল, টয়লেট ইত্যাকার স্থানে সালাত আদায় করা নিষেধ। এ ব্যাপারে আমাদের নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ

কবরস্থান এবং হাম্মাম (বাথ রুম) ছাড়া সমগ্র জায়গায় সালাত পড়া যাবে। এ বিষয়ের ওপর আরও কতিপয় হাদীস আছে। কবরস্থানে প্রয়োজনে জানাযার সালাত আদায় করাও জায়েয আছে।

৪. পোশাকে শরীর আবৃত রাখা : এক্ষেত্রে পুরুষের জন্য কমপক্ষে দুইস্কন্ধ ও নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং পায়ের তালু ব্যতীত সর্বাঙ্গ আবৃত রাখা।

এ বিষয়ক আয়াত হলো–

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ

হে বনী আদম! মসজিদে যাওয়ার সময় নিজেকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত কর।

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩১)

(সতরের এক-চতুর্থাংশ খোলা রেখে সালাত শুরু করলে সালাত সহীহ হবে না। পুনরায় আরম্ভ করতে হবে। আরম্ভ করার পর সতর খুলে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ঢেকে নিলে সালাতের ক্ষতি হবে না। মহিলাদের পায়ের নলা, বাহু, কান, মাথা, চুল, পিঠ, পেট, ঘাড়, বুক, স্তনের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ খোলা থাকলে সালাত জায়েয হবে না। রান সকলের জন্যেই সতরের অন্তর্গত) (বাহরুর রায়েক)।

[সম্পূর্ণ রেশম সূতায় তৈরি পোশাক দিয়ে সতর ঢাকা কিংবা ব্যবহার করা পুরুষদের জন্যে নিষেধ। নারী পুরুষ উভয়ের জন্য এমন পাতলা পোশাক পড়া নিষেধ যা সতর ঢাকার উদ্দেশ্য ব্যহত করে।]

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর পোশাকে নামাজ আদায় করা সুন্নাত। কারণ আল্লাহর জন্য সজ্জিত হওয়াই বেশি উচিত। লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি দুই পায়ের নলা ও মাংসপেশী মধ্যাংশে পরিধান করবে। আর তা না হলে দুই পায়ের গিরার উপর পর্যন্ত পরিধান করতে পারে। তবে কোন ভাবেই গিরা স্পর্শ করবে না। যে কোন পোশাক লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি গিরার উপরে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। চাই তা নামাজে হোক বা বাহিরে হোক।

◆ পুরুষ ও নারীর সতরের সীমা

নামাজে পুরুষের সতর তথা যা ঢেকে রাখা জরুরি : নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত। আর মহিলাদের সতর হলো : চেহারা ও দুই হাতের কব্জি ও দুই পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর। কিন্তু যদি নামাজ ছাড়া পুরুষের সামনে হয়, তাহলে উল্লিখিত অঙ্গসহ সমস্ত শরীর পর্দা করা জরুরি।

৫. নির্ধারিত ওয়াক্তে সালাত আদায় করা : ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে সালাত আদায় করলে সালাত সহীহ হবে না। কেহ অজ্ঞাতসারে আসরের সময় জোহর সালাত পড়লে তার সালাত হয়ে যাবে।

৬. কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় : এ বিষয়ক আয়াত হলো–

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ـ

"তারপর তোমার চেহারা মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। তোমরা যেভাবেই থাক না কেন তোমাদের চেহারা সেদিকে ফিরাবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৪৯)

আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। উপস্থিত লোকগণ সিরিয়ামুখী ছিলেন। তারা নির্দেশ পেয়ে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

কিবলা নির্ণয়ের কোনো উপায় না থাকলে মনের দৃঢ় প্রত্যয় যেদিকে সাক্ষ্য দিবে সেদিক হয়ে সালাত আদায় করলে সালাত উপস্থিত হয়ে যাবে। সালাতের অবস্থায় দিক নির্ণয় করতে পারলে তৎক্ষণাৎ সেদিকে ঘুরতে হবে।

নফল বা বিতর সালাত কোনো বাহনের উপর শুরুতে কিবলামুখী হওয়ার পর পরবর্তীতে ঘুরে গেলে সালাত সহীহ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু ফরজ সালাতে সর্বাবস্থায় কিবলামুখী হওয়া আবশ্যক। তবে অনুন্যোপায় অবস্থা স্বতন্ত্র।

উপরোক্ত শর্তগুলোর একটি শর্তও ভুলক্রমে কিংবা ইচ্ছা করে বাদ পড়লে সালাত সহীহ হবে না। পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে।]

৭. নিয়াত করা : 'নিয়ত অর্থ 'ইচ্ছা পোষণ করা' মনে মনে সংকল্প করা। সালাতী ব্যক্তি সালাতের উদ্দেশ্যে ওযূসহ যেসব কাজ সম্পাদন করে তাতেই নিয়াত আদায় হয়ে যায়। তজ্জন্য মুখে উচ্চারণ করার দরকার নেই।

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ বুখারীর এ হাদীসের আলোকে নিয়ত করা আবশ্যক।

কিন্তু আমাদের দেশের উর্দু বা ফার্সী ভাষার গ্রন্থসমূহে প্রতি ওয়াক্তের প্রতিটি ফরজ, সুন্নাত, নফল সালাতের জন্যে যেসব নিয়াত আরবি ভাষায় লিখা আছে কিংবা প্রচলিত আছে এগুলো কোনো হাদীস ভিত্তিক প্রমাণ নেই। রাসূলের সময় থেকে সলফে সালেহীনদের সময় পর্যন্ত এ জাতীয় নিয়ম না থাকায় এরূপ মৌখিক নিয়াত করা 'বিদআত'।

◆ সালাতের ফরজসমূহ

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল যেকোন ধরনের সালাত আদায় করার জন্যে কতিপয় নিয়ম ও কাজ করতে হয় যেগুলো ছাড়া সালাত আদৌ সহীহ হবে না। এগুলো ফিকাহের পরিভাষায় 'আরকান' বা স্তম্ভ নামে অভিহিত। ধারাবাহিকভাবে কাজগুলোর পরিচয় এরূপ–

১. 'আল্লাহু আকবর' বলে সালাত শুরু করা : ফিকহের পরিভাষায় এ কাজকে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়। এ কাজটিকে তাকবীরে তাহরীমা বলার তাৎপর্য

হলো, সালাতী ব্যক্তি সালাতের জন্যে নির্ধারিত কাজ ব্যতীত অন্যান্য হালাল কাজও নিজের জন্যে আল্লাহু আকবার বলে হারাম হওয়ার ঘোষণা দিলেন।
(মুসলিম, ইবনে মাযাহ)

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে নাওয়াইতুআন ... বা এ জাতীয় কিছু বলতেন বলে কোনোই প্রমাণ নেই। সলফে সালেহীন পর্যন্ত এরূপ আরবি ভাষায় نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ বলার কোনো প্রমাণ না থাকায় এরূপ করাকে বিদআত বলা হয়েছে। তাকবীরে তাহরীমার সমর্থিত হাদীস হলো-

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ ....

সালাতের চাবিকাঠি হলো পবিত্রতা আর তার তাহরীমা বা হারাম হলো আল্লাহু আকবার বলা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকিম)

২. কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। ওযর ব্যতীত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় না করলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী হলো-

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

"আল্লাহর সামনে বিনয়ী অনুগত হয়ে দাঁড়াও।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৮)

ভয়ের সময় পদাতিক কিংবা আরোহী অবস্থাতেই সালাত আদায় করা যায়।

যদি তোমরা ভয়ের আশঙ্কা কর তাহলে তোমরা পদাতিক কিংবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় কর।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا .

(সূরা বাকারাহ : আয়াত-২৩), (মুসলিম)

ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেছেন- আমি রোগে আক্রান্ত হলে সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : দাঁড়িয়ে পড়, না পারলে বসে পড়। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে এক পাশে ফিরে শুয়ে পড়। (বুখারী, আবু দাউদ, আহমদ) অপর হাদীসে আছে ফরজ সালাত দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। বসে পড়া দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক সাওয়াব, আর শুইয়ে পড়া বসে পড়ার অর্ধেক সাওয়াব পাওয়া যাবে। (আহমদ ইবনে মাজাহ, বুখারী, আবু দাউদ)

নৌযানে নৌকা ডুবির ভয় না থাকলে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে হবে। অন্যথায় বসে পড়া যায়। (বাজ্জার দারা কুতনী ও হাকিম)। নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশার শেষ লগ্নে কখনো লাঠির উপর ভর করে সালাত আদায় করেছেন।

(মুসলিম, আবু দাউদ)। রাতে তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে সালাত পড়তেন। আবার বসেও তিনি সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম ও আবু দাউদ)। এক পায়ের উপর অন্য পা আড়াআড়ি স্থাপন করে তার উপর তিনি বসতেন।

(নাসায়ী, ইবনে খুযাইমাহ, হাকিম)

বি. দ্র. ফতওয়ায়ে শামীতে আছে, মসজিদের দূরত্ব অতিক্রম করে দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জন্যে ঘরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা উত্তম। কেননা জামায়াতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আর দাঁড়িয়ে (কিয়াম) সালাত পড়া ফরজ।

৩. কিরাত পাঠ : অর্থাৎ কুরআনের একটি সূরা অথবা দীর্ঘ এক আয়াত কিংবা ছোট অন্ততঃ ৩টি আয়াত পড়তে হবে। কিরাত পাঠের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ প্রথমত সূরায়ে ফাতেহা পাঠ তৎপর অন্য সূরা মিলানের পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

কিরাত পাঠের সাধারণ নির্দেশ হলো–

فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

"কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ তা পড়।" (মুয্যাম্মিল)

সূরায়ে ফাতিহা পড়া সম্পর্কে হাদীস হলো–

لَاصَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"সূরায়ে ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না।"

(বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী, আবু আওয়ানা হাদীস গ্রন্থরাজিতে এ জাতীয় একাধিক হাদীস রয়েছে।)

৪. রুকু করা : অর্থাৎ আল্লাহর নিকট বিনয় হওয়ার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ হাত দ্বারা হাঁটুর উপর ভর করে অর্ধ-নমিত হওয়া।

এ বিষয়ে কুরআনের বাণী হলো–

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ .

"রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা বাকারা : আয়াত-৪৩)

হাদীসে আছে– ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا.

"তারপর শান্তি ও ধীর স্থীরভাবে রুকু কর"।

৫. সাজদা করা : অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে নিজকে বিনয়ী ও অনুগত হওয়ার প্রতীকস্বরূপ দু'পা, দু'হাত, দু'হাটু এবং নাক-কান এ সমস্ত অঙ্গ জমীনে বিছিয়ে দেয়া।

কুরআনের নির্দেশ–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا

"হে মু'মিনগণ! রুকু কর এবং সিজদা কর।"

এ বিষয়ে হাদীসে আছে –

اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ .

"আমি সাত অংগের উপর সিজদা করার নির্দেশ পেয়েছি (দু'হাত, দু'হাটু, দু'পায়ের পাতা কপাল ও নাক মিলে মুখমণ্ডল এ সাত অঙ্গ) বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও সিজদা করার নির্দেশ রয়েছে।

৬. কুউদে আখিরাহ : অর্থাৎ শেষ বৈঠক। তাশাহুদ পড়ার জন্যে সালাতের শেষে বসা।

শেষ বৈঠক সম্পর্কিত হাদীস হলো–

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ اِلَّا بِتَشَهُّدٍ

"তাশহুদ ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না" হাদীসটি ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাসউদ থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৭. 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফেরা।

এ বিষয়ে হাদীসটি : وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

◆ নামাজ থেকে মুক্ত হতে সালাম

অপর হাদীসে আছে–

كُنْتُ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَيَسَارِهٖ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهٖ .

নবী করীম ﷺ-কে (আমি) আলী (রা) ডানে বামে সালাম করতে দেখেছি। ... এমনকি তার গালের শুভ্রতাও দেখেছি। (আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাযাহ)

উপরিউল্লেখিত ফরজ কাজগুলোর কোনো একটি কাজ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাদ পড়লে তাতে সালাত বিশুদ্ধ হবে না। পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। সাহু সিজদা কোনো ফরজ বা শর্তের বিকল্প হবে না।

◆ **যে ব্যক্তি কোন একটি রোকন ছেড়ে দেবে তার বিধান**

১. যদি মুসল্লী ভুল করে হলেও উল্লেখিত রোকনসমূহের কোন একটি ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তাকবিরে তাহরিমা অজ্ঞতাবশত: বা ভুল করে ছেড়ে দেয় তাহলে মূলত: সে যেন নামাজই পড়ে নেই।

২. মুসল্লী এই রোকনের কোন কিছু অজ্ঞতাবশত বা ভুলে ছেড়ে দিলে সে সেখানে ফিরে যাবে এবং তা আদায় করবে। কিন্তু শর্ত হলো পরবর্তী রুকুনের স্থানে যেন না পৌছে। আর যদি পরবর্তী রুকুনের স্থানে পৌছে যায় তবে কারো মতে পরের রাকাতটি ছুটে যাওয়া রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে আর পূর্বের রাকায়াত বাতিল হয়ে যাবে। যেমন ধরুন এক ব্যক্তি রুকু ভুলে না করে সিজদার দিকে ধাবিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তার প্রতি ওয়াজিব হলো যখনই তার স্মরণ হয় সে স্থানে ফিরে যাবে। কিন্তু যদি সিজদা করে ফেলে তারপর স্মরণ হয় তবে রুকু ছুট রাকাতটি বাতিল হয়ে যাবে ও তার পরের রাকাতটিকে সেই স্থানে গণ্য করতে হবে। এ অবস্থায় তার প্রতি সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করা জরুরি হবে তবে সর্বোত্তম মত হলো এ অবস্থায় তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে, এবং প্রথম থেকে নতুন করে সলাত আদায় করবে।

৩. অজ্ঞ ব্যক্তি কোন রোকন বা শর্ত ছেড়ে দিলে সালাতের সময় থাকলে ফিরিয়ে সালাত আদায় করবে। আর যদি সময় পার হয়ে যায় তাহলে আবার আদায় করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম ও একাকী নামাজীর জন্য প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করা একটি রোকন, এ ছাড়া রাকায়াত বাতিল হয়ে যাবে। আর মুক্তাদি নি:শব্দ কেরাতের নামাজেও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কিন্তু কারো কারো মতে যে সকল সালাতে ও রাকায়াতে ইমাম সাহেব জোরে কেরায়াত করবেন সেগুলোতে মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। বরং ইমামের কেরায়াতের জন্য চুপ করে থাকবে। অবশ্যই সর্বাবস্থায় সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে এ মতটিই সবচেয়ে শক্তিশালী ও সঠিক। আর ইমাম সাহেবের জন্য উচিত নয় যে, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর মুক্তাদিগণকে পড়ার জন্য চুপ থাকবেন; কারণ এর কোন দলিল নেই।

◆ **সুন্দরভাবে সালাত আদায় এবং পূর্ণ করা ওয়াজিব**

সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন হচ্ছে : কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকু ও সিজদা। অতএব, সালাতে কিয়াম জিকির তথা কুরআন তেলাওয়াত হতে উত্তম। আর রুকু ও সিজদা আকৃতি ও কার্যাদি হতে উত্তম; কারণ এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র জন্য পূর্ণ ভয়-ভীতি। আর বেশি বেশি রুকু, সিজদা ও লম্বা কিয়াম বরাবর। কিয়ামে উত্তম জিকির হলো কুরআন তেলাওয়াত এবং রুকু ও সিজদায় উত্তম কাজ ও আকৃতি হলো পূর্ণ ভয়ভীতি। নবী করীম ﷺ-এর সালাত ছিল সর্বোত্তম সালাত। তিনি কখনো এরূপ করতেন আবার কখনো ওরূপ করতেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : يَا فُلَانُ تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ اَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّىْ اِذَا صَلّٰى كَيْفَ يُصَلِّىْ؟ فَاِنَّمَا يُصَلِّىْ لِنَفْسِهِ، اِنِّىْ وَاللّٰهِ اَبْصِرُ مِنْ وَرَائِىْ كَمَا اَبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করার পর ফিরে বসে বলেন : "হে অমুক ব্যক্তি! তুমি তোমার সালাত সুন্দর করতে পার না? মুসল্লী যখন সালাত আদায় করে তখন সে কেন তার সালাত দেখে না? কারণ সে তো তার নিজের জন্য সালাত আদায় করে। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আমি আমার পিছনে দেখতে পাই যেমনটি দেখতে পাই সামনে। (মুসলিম হাদীস নং ৪২৩)

৫. সালাতের ওয়াজিবসমূহ

◆ **সালাতের ওয়াজিবসমূহ**

সালাতের মধ্যে এমন কিছু কাজ আছে যেগুলোর কোনো একটি অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়লে সাহু সিজদা দিলে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যায়। সাহু সিজদা দিতে ভুলে গেলেও তাতে সালাত শুদ্ধ হবে। তবে ইচ্ছা করে সিজদায়ে সাহু না দিলে সালাতের ওয়াক্ত বাকি থাকলে সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। (এ বিষয়ে সাহু সিজদা পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এরূপ কাজগুলো হলো–

১. সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা : প্রত্যেক ফরজ, ওয়াজিব, নফল, সুন্নাত ও মোস্তহাব সালাতের প্রতি রাকায়াতে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ফরয। কারো মতে একাজ ওয়াজিব।

[বুখারী মুসলিম, বায়হাকী, ইবনে মাযাহ, আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে সূরায়ে ফাতেহা পড়ার সহীহ হাদীস রয়েছে। কারো সূরা ফাতিহা না জানার অপারগতায় যে কোনো আয়াত পড়লে চলবে। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারে কুতনী)]

কারো কারো মতে জামাতে মুক্তাদিগণ সূরা ফাতিহার প্রতি মনোযোগি হবে প্রকাশ্য ও স্বশব্দে তিলাওয়াত অবস্থায় সূরা ফাতিহা না পড়ে ইমাম তেরাওয়াত শুনবে হানাফি হাযহাব অনুসারে জামাতে মুক্তাদিগণ সূরা পাতিহাসহ কোনো সূরা পাঠ না করে সর্বাবস্থায় চুপ থাকবে। এবতাবস্থায় ইমামের কেরাত তাদের নিকট মুক্তাদিদের জন্য যথেষ্ট।

২. ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা দীর্ঘ ১ আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত মিলানো।

[ফাতিহার সাথে সূরা মিলানোর বিষয়ে একাধিক হাদীস রয়েছে। ফরজ সালাতের ১ম দু'রাকায়াত এমনকি শেষ দু' রাকায়াতেও আয়াত পড়ার প্রমাণ আছে। আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল আসরের ১ম দু' রাকায়াত অন্তত ১৫ আয়াত এবং শেষ দু রাকায়াত তার অর্ধেক আয়াত মিলাতেন (বিদায়াহ, ১ম খণ্ড ১২৮) বুখারী ও মুসলিমেও ফাতিহার সাথে সূরা মিলানোর কথা রয়েছে।]

মিলানো আয়াতের সংখ্যা দু'টি হলে আর আয়াত দু'টি যদি ছোট তিন আয়াতের সমান হয় তা হলে সালাত বিশুদ্ধ হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিহার পর যে নামাযে যেসব সূরা পড়তেন–

ক. ফজরে সূরায়ে কাফ থেকে পরবর্তী ৭টি সূরার যে কোনো সূরা (নাসায়ী ও আহমদ) ওয়াকেয়াহ, আত-তুর; তাকভীর, ঝিলযাল, রূম, ইয়াসিন, আল মুমেনুন, আস সাফফাত, আস সাজদাহ, আদদাহর, বাকারার-১৩৬ আয়াত থেকে قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ পর্যন্ত ১ম রাকায়াতে এবং আলে ইমরানের ৬৪ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়ার প্রমাণ আছে।

(বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমা, হাকিম)

খ. **জোহর** : সূরায়ে আত-তারিক, বুরূজ, আল-লাইল, ইনশিকাফ, আল আলা আল-গাশিয়া। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমদ, ইবনু খোযাইমা)

গ. **আসর** : জোহরের সূরাগুলো তিনি আসরেও পড়তেন। তবে জোহরের অর্ধেক পরিমাণ আয়াত পড়তেন। শেষ দু রাকায়াতে তাঁর কিরাত পড়ারও প্রমাণ আছে। তিনি এ নামাযেও সূরা আলা, সূরা লাইল, সূরা তারিখ, ও সূরা বুরুজ পড়তেন। (মুসলিম, আবু দাউদ হাদীস-৮০৫)

ঘ. **মাগরিব** : তিনি অধিকাংশ সময় ছোট সূরা পড়তেন। তিনি কখনো আত-তীন, মোহাম্মদ, আনফাল, মুরসালাত, আ'রাফ সূরাগুলো থেকে আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। তিনি পরবর্তী দু' রাকায়াত সুন্নাত সালাতে কাফিরুন এবং ইখলাস পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম, তাবারানী, আহমদ, আবু দাউদ)

ঙ. **ইশা** : তিনি মধ্যম ধরনের সূরা পড়তেন, আশ-শামস, ইনশিকাক, আত্তীন পড়তেন। একবার মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইশার সালাতে সূরায়ে আল আলাক, লাইল ও আশশামস পড়ার নির্দেশ দেন।
(বুখারী, মুসলিম, তাবারাণী, আহমদ, আবু দাউদ)

চ. **বিতর** : ১ম রাকাতে আল-আলা, ২য় রাকাতে কাফিরুন এবং ৩য় রাকাআতে কখনো নাস ও ফালাক একত্রে পড়তেন। (তিরমিযী) একবার তিনি ৩য় রাকায়াতে নিসার ১০০ আয়াত পড়েন। (নাসায়ী, আহমদ)

ছ. **ঈদ** : ১ম রাকায়াতে আল আলা, ২য় রাকায়াতে আল-গাশিয়াহ, কখনো কাফ এবং কামার পড়তেন।

জ. **রাতের সালাত** : রাতের সালাতে তিনি কিরাত লম্বা ও ছোট করতেন। হুযাইফা (রা) বলেন, আমি একবার রাসূলের সাথে রাতের সালাতে শরীক হই। তিনি সূরায়ে বাকারাহ্ দিয়ে সালাত শুরু করলেন। আমি ধারণা করলাম ১০০ আয়াতের মাথায় তিনি রুকুতে যাবেন কিন্তু না; তারপর মনে করলাম, তিনি বাকারা দুই রাকায়াতে শেষ করবেন। কিন্তু না; তিনি বাকারা শেষ করে সূরায়ে নিসা আরম্ভ করে ১ম রাকায়াতে তা শেষ করলেন। ২য় রাকায়াতে আলে-ইমরান আরম্ভ করে শেষ করলেন। (মুসলিম, নাসায়ী)

একরাতে তিনি ৭টি লম্বা সূরা পাঠ করেন; সে সময় তিনি ছিলেন অসুস্থ। (আবু ইয়ালী, হাকিম) তাঁর রাতের সালাতে পূর্ণ কুরআন পড়ার কোনো প্রমাণ নেই। (মুসলিম, আবু দাউদ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রত্যেক

রাতে সালাতে পুরা কুরআন খতম করতেন। রাসূল এরূপ করতে নিষেধ করেন। তিনি তাকে ২০ রাতে খতম করার কথা বললে ইবনে ওমর আরো কম খতম করার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন ৭ রাতে খতম কর। তিনি বললেন : অতঃপর তাকে ৩ দিনে কুরআন খতম করার অনুমতি দেন। (নাসায়ী, তিরমিযি)

৩ দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করতে নিষেধ করার তাৎপর্য হলো– ৩ দিনের কম সময়ের খতমে কুরআন শুধুই তিলাওয়াত হয় বুঝতে সক্ষম নয়। (আহমদ)

ঝ. জুমুআ : ১ম রাকায়াতে সূরায়ে জুমআ' ২য় রাকাতে মুনাফিকুন, কখনো মুনাফিকুন এর পরিবর্তে গাশিয়াহ্ পাঠ করেছেন। কখনো ১ম রাকায়াতে সূরায়ে আল আলা পড়েছেন। (মুসলিম, আবু দাউদ)

যোহরের ১ম দু' রাকাআতে ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো সুন্নাত। শেষ দু' রাকায়াতে সূরা মিলালে সালাত অশুদ্ধ হবে না।

[শুধুমাত্র ফাতিহা পড়ে দু'রাকায়াত সালাত পড়ার প্রমাণ আছে (মুয়াজ ও ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীস) আবার জোহরের ফরজ সালাত শেষ দু'রাকায়াতে সূরা মিলানোর প্রমাণ আছে। এরূপ করা ভুল নয়। (মুসলিম, আহমদ)

যে কোনো রাকায়াতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করলে সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা কিংবা আয়াত মিলানো সুন্নাত ওয়াজিব নয়। সুতরাং অন্য সূরা কিংবা আয়াত না মিলালেও সালাত শুদ্ধ হবে বাতিল হবে না। তেমনিভাবে কোনো রাকায়াতে সূরা মিলানো হয় কিংবা মিলানো হয় না তাতেও সালাত বাতিল হবে না।

৩. সূরার আগে ফাতিহা পড়া। (রাসূলের কথা, শিক্ষা ও বাস্তবতায় দেখা যায় তিনি ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করতেন।)

৪. সালাতের জন্য যেসব কাজ ফরজ সেগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। অর্থাৎ কিয়াম, কুউদ, রুকু, সিজদা করার যে সময় ও নিয়ম আছে তা যথার্থ ও নিয়ম মোতাবিক আদায় করা। এ কাজকে তারতীব বলে।

৫. দু'রাকায়াত পূর্ণ করার পর বসা। এ বসাকে কুউদে উলা বা প্রথম বৈঠক বলে।

৬. প্রথম এবং ২য় উভয় বৈঠকেই তাশাহুদ পড়া।

[রাসূলুল্লাহ ﷺ সাবাহীগণকে কয়েক ধরনের তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন– যা সামনে আসছে]

৮. রুকু সিজদা ধীর স্থীরে আদায় করা : রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকুর জন্য দু হাত হাটুতে জড়িয়ে ধরার মতো হাঁটুতে স্থাপন করতেন। পিঠ সোজা রাখতেন এবং মাথা পিঠের বরাবর রাখতেন। উঁচু বা নীচু করে রাখতেন না। রুকুতে ১০ বার তাসবীহ পড়ার মতো সময় কাটাতেন। সিজদায়ও তিনি এরূপ দীর্ঘ সময় সিজদারত থাকতেন। (ইবনে খুযাইমাহ, হাব্বান) তিনি সিজদায় দুই হাত দুই পাঁজর থেকে পৃথক রাখতেন। (নাসায়ী, দারা কুতনী)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা রুকু সিজদা পূর্ণ কর। আল্লাহর শপথ, আমি পিছনে তোমাদের রুকু সিজদা দেখে থাকি। (বুখারী, মুসলিম)

মুসনাদে আবু ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনু আসাকীর, ইবনে খুযাইমাতে আছে, যে ব্যক্তি রুকু পূর্ণ করে না এবং সিজদায় ঠোকর মারে সে এমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায় যে ২/১টি খেজুর খায় যাতে তার ক্ষুধা মিটে না।

রুকু সিজদা সঠিকভাবে আদায় না করা ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূল সর্বনিকৃষ্ট চোর বলেছেন। (ইবনে আবি শাইবা, তাবারানী, হাকিম)

৯. ফজর, জুমু'আ, ইসতিসকা ও ঈদের সালাতের উভয় রাকায়াতে এবং মাগরিব ও ইশার ১ম দু' রাকায়াতে সূরায়ে ফাতিহা এবং মিলানো আয়াত শব্দ করে পড়া। জোহর, আসর ও নফল সালাতে ফাতিহা ও সূরা নিঃশব্দে পাঠ করা।

[ইমাম নববী (র) বলেছেন, সর্বযুগের আলেমগণ এ বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে আছে, তিনি এতটুকু আওয়াজে পড়তেন যে নিকটবর্তী লোকজন শুনতেন।]

১০. বিতর সালাতে দুআয়ে কুনুত পড়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। (ইবনু আবু শাইবাহ, আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমদ, বায়হাকী)

বুখারী ও আবু দাউদে আছে, রুকু থেকে মাথা উঠাবার পর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলার পর তিনি কুনুত পড়তেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে দোয়ায়ে কুনুত পড়া সংক্রান্ত আনাস (রা) থেকে ব্যাখ্যা মূলক বর্ণনা এসেছে যেখানে বলা হয়েছে নবী (সা) শুধু কুনুতে নাযেলাতে (বিপদাপদে কোনো) এক মাস রুকু থেকে উঠে দোয়ায়েকুনুত পড়েছেন বা কি অন্যান্য কুনুতে তিনি রুকুর পূর্বে ও কিরাত শেষে দোয়ায়েকুনুত পড়তেন যদিও আজকাল উম্মতের মাঝে সব রকম কোনো রুকুর পড়ে পড়া অধিক প্রচলিত।

১১. ঈদের সালাতে ১২ তাকবীর বলা।

ঈদের সালাতে তাকবীর বলা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আহমদ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থে আমর ইবনে সুয়াইব (রা) এবং আয়েশা (রা) থেকে তাকবীর সম্পর্কিত হাদীস রয়েছে। তবে রিওয়ায়াতসমূহে তাকবীরের সংখ্যার তারতম্য রয়েছে। দু' রাকায়াতে ১২ (১ম রাকায়াতে ৭, ২য় রাকায়াতে ৫) আবার ৬ তাকবীরের কথাও রয়েছে।] সরাসরি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা ৬ তাকবীর মোটেও প্রমাণিত নয় এটা মূলত জোড়াতালি দিয়ে প্রমাণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা ১২ তাকবীর নিশ্চিত প্রমাণিত। সুতরাং ৬ তাকবীরের প্রতি ধাবিত হওয়া উত্তম নয়।

(মুয়াত্তা-ইমাম মালেক, সালাত অধ্যায় ইরওয়াউল গালীল হাদীস-৩/১১০)

১২. জানাযার সালাতে ৪ তাকবীর বলা।

মুসলিম, দারা কুতনীতে জানাযায় তাকবীর বলার রিওয়ায়েত আছে। তবে তাকবীরের সংখ্যায় বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। ৪, ৫, ৬ এর বর্ণনাও আছে।

◆ যে সালাতের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেবে তার বিধান

যদি ইচ্ছা করে মুসল্লী কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুল করে ছেড়ে তার স্থান থেকে পার হয়ে যায় এবং তার পরের রোকনে না পৌঁছে তবে ফিরে গিয়ে তা পূরণ করবে। অতঃপর তার নামাজ পূরণ করে দু'টি সাহু সেজদা দেয়ার পর সালাম ফিরাবে।

(মুসলিম হাদীস-৫৭১; আহমদ হাদীস-৩৯৬; নাসায়ী হাদীস-১২৩৮, ১২৩৯; আবু দাউদ হাদীস-১০২৪; ইবনে মাজা হাদীস-১২০৮)

আর যদি পরের রোকনে পৌঁছার পরে স্মরণ হয়, তবে তা বাদ পড়ে যাবে ও যথাস্থানে ফিরে যাবে না; বরং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সিজদা করে তারপর সালাম ফিরাবে। (আহমদ হাদীস-১০৬৯৮; মুওয়াত্তা হাদীস-২১৪)

◆ রোকন ও ওয়াজিবের মাঝে পার্থক্য

বিশুদ্ধ মতে সহীহ সুন্নাহর আলোকে যেকোনো ভাবেই রোকন ছাড়া পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যায়। তবে পূর্ণ রাকাআত ছাড়া পড়লে অথবা ছাড়া পড়া সন্দেহ হলে রাকাআত পূর্ণ করে সাহুসিজদা দিবে। কিংবা রাকাআত বেশি হয়ে গেলেও সাহুসিজদা দিবে। অন্য দিকে সালাতের মধ্যে কোনো ওয়াজিব ছাড়া পড়লে অন্য রোকন আসার পূর্বেই যদি তা স্মরণ হয়ে যায় তাহলে তা পূরণ করে নিবে। এক্ষেত্রে সাহুসিজদার প্রয়োজন নেই। যদি অন্য রোকন এসেছে যায় তাহলে তার পরিবর্তে সাহুসিজদা দিয়ে তা পূরণ হবে এবং কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে তার কারণে সালাত বাতিল হয় না।

সাহুসিজদা কখন দিতে হবে এ বিষয়ে বিশেজ্ঞদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তবে এ সংক্রান্ত বর্ণিত সমগ্র হাদীসকে একত্রিত করে সুক্ষ্ম দৃষ্টি নিবন্ধন করলে যেটা পাওয়া যায় তা হলো সালাম ফিরানোর পূর্বেই যদি ভুল সম্পর্কে মুসল্লি অবগত হয়। তাহলে সালাম ফিরানোর পূর্বেই সাহুসিজদা দিতে হবে। রাকাআত সংখ্যা কম হোক অথবা বেশি হোক। আর যদি মুসল্লি সালাম ফিরানোর পর ভুল সংক্রান্ত অবগত হয় তবে সালাম ফিরানোর পর সাহুসিজদা দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরাবে অথবা সেখান থেকেই নামায সমাপ্ত করবে উভয় হাদীদ দ্বারা প্রমাণিত।

৬. সালাতের সুন্নাতসমূহ

রোকন ও ওয়াজিব ছাড়া নামাজের বিবরণে যা কিছু রয়েছে তা সবই সুন্নাত যা করলে সাওয়াব আছে এবং ছেড়ে দিলে কোন শাস্তি নেই। এটি কিছু সুন্নাতে কাওলী তথা কথা-বাণী আর কিছু রয়েছে ফে'লী তথা কাজ-কর্ম।

কাওলী (কথার) সুন্নাত যেমন : ইস্তিফতা ও ছানার দোয়া, আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ, আমীন বলা ও সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা ইত্যাদি।

ফে'লী (কাজের) সুন্নাত যেমন : পূর্বে উল্লেখিত স্থানসমূহে দুই হাত উত্তোলন করা, দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা, পা বিছানো, তাওয়াররুক করা ইত্যাদি।

১. তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবর) বলার সময় উভয় হাত উপরে উঠানো।
২. তাকবীর বলার সময় হাতের আংগুলি ঠিকভাবে কেবলামুখী করে রাখা এবং আংগুল বেশি ফাঁক কিংবা বেশি মিলায়ে না রাখা।
৩. বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভির উপরে কিংবা বুকে হাত বাঁধা।
৪. হাত বাঁধার পর সূরায়ে ফাতিহা শুরু করার আগে দোয়া পড়া।
৫. তা'আউয (আয়ূযুবিল্লা) ও তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ্) পাঠ করা।
৬. ফরয সালাতের ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াতে শুধুমাত্র ফাতিহা পাঠ করা।
৭. 'ফাতিহা' পাঠের পর 'আমীন' বলা।
৮. কিয়াম অবস্থায় মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।
৯. তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাওয়া এবং রুকুর তাসবীহ পাঠ করা।
১০. রুকু সিজদার তাসবীহ ৩, ৫, ৭ বা ততোধিক বিজোড় সংখ্যা পাঠ করা।

১১. রুকু করার সময় মাথা ও পিঠ সমান তালে বরাবর রাখা এবং দুই হাত দিয়ে দু'হাটু জড়িয়ে ধরা।

১২. রুকু থেকে উঠার সময় তাসবীহ্ পাঠ করা।

১৩. তাকবীর বলে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদার তাসবীহ্ পাঠ করা।

১৪. সিজদায় প্রথমে নাক, পরে কপাল রাখা। সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল এবং পরে নাক উঠানো।

১৫. রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদায় যাওয়ার প্রাক্কালে দু' হাত উঠানোর পদ্ধতি সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এ কাজটি করা সুন্নাত, না করা সুন্নাতের পরিপন্থী।

১৬. সিজদায় ব্যবহৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

১৭. পেট হাঁটু থেকে এবং বগল কনুই থেকে পৃথক রাখা। সিজদার সময় পেট মাটি থেকে এমন পরিমাণে উঁচু রাখতে হবে, যাতে একটি ছাগলের ছানা যাতায়াত করতে পারে।

১৮. হাত ও পায়ের আঙ্গুলিসমূহ কিবলামুখী রাখা। হাতের তালুর উপর ভর করা এবং এবং বসাবস্থায় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখা।

১৯. দুই হাতের কব্জি মাটিতে কাঁধ বা কান বরাবর রাখা।

২০. আল্লাহ্ আকবার বলে প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে বসা এবং তাসবীহ পড়া। অর্থাৎ সিজদা থেকে উঠে শরীরের প্রত্যেক জোর স্বাভাবিকভাবে নিজ স্থানে যেন ফিরে যায়। দুই সেজদার মাঝে এতটুকু করা সালাতের রোকন হিসেবে গণ্য। রোকন তরককারী সালাত বাতিল হয়ে যায় যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

২১. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক কিছুটা দীর্ঘ করা।

২২. 'তাশাহুদ' পাঠের সময় 'শাহাদত' আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা।

২৩. রাতের সালাতে (তাহাজ্জুদ বা অন্য নফল সালাত) এবং সালাতে কুসূফ ও খুসূফ অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাতে কিরাত রুকু সিজদা দীর্ঘ করা।

২৪. প্রথম দুই রাকায়াত এবং রাকায়াতে কিরাত কিছুটা লম্বা করা।

২৫. দ্বিতীয় রাকায়াত আদায়ের জন্যে সিজদা থেকে হাতে ভর দিয়ে উঠা।

২৬. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠের পর 'দরূদ' পাঠ করা। তবে কোনো কোনো হাদীস দ্বারা আরো দুটি পরবর্তী দোয়ায়েমাসূরা পাঠ করা ওয়াজিব। তা হলো–

১. اللهم انى ظلمت نفس ....

২. الهم انى اعوذبك من عذب القبر ....

২৭. দরূদ পাঠের পর হাদীস সম্মত অন্যান্য দোয়া পড়া।

২৮. প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরায়ে সালাত শেষ করা।

◆ **নামাজের মধ্যে নিয়ত পরিবর্তন করার বিধান**

১. প্রতিটি আমলের জন্য নিয়ত আবশ্যক। কোন নির্দিষ্ট নামাজের নিয়ত অপর নির্দিষ্ট নামাজের জন্য পরিবর্তন করা নাজায়েয। যেমন : আসরের নামাজের নিয়তকে যোহরের নামাজে পরিবর্তন জায়েয হবে না। এমনিভাবে কোন অনির্দিষ্ট নামাজের নিয়তকে কোন নির্দিষ্ট নামাজে পরিবর্তন করাও নাজায়েয। যেমন : কোন ব্যক্তি নফল নামাজ আদায় করছে, অতঃপর সে তার এই নফলকে ফরজ নামাজে পরিবর্তন করে দিল, এমনটি করা বৈধ নয়।

২. কোন মুসল্লি একাকী বা ইমামের পিছনে (মুক্তাদি হয়ে) নামাজ আদায় করছে, এমতাবস্থায় তার জন্য ইমাম হওয়ার নিয়ত করা জায়েয (যদি কোন মুসল্লি তার পিছনে এসে তাকে ইমাম বানিয়ে নেয়)। এভাবে ইমামের পিছনে মুক্তাদির নামাজের নিয়ত পরিবর্তন করে (ইমাম সালাম ফিরানোর পর) একাকী নামাজের নিয়ত করতে পারে।

৩. মুসল্লি সালাতের ভিতরে তার নিয়ত ভেঙ্গে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে এবং তার প্রতি ওয়াজিব হবে প্রথম থেকে আরম্ভ করা।
* মুসল্লি তার শরীরকে কা'বামুখী এবং অন্তরকে আল্লাহমুখী করবে।

◆ **যে কিবলা জানে না সে যেভাবে সালাত আদায় করবে**

কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করা ফরজ। তবে যদি কিবলার দিক বুঝতে না পারে, তাহলে গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করে কিবলার অনুমান করে নামাজ আদায় করে নিবে। এতে যদি পরে জানতে পারে যে, তার কিবলার দিক ভুল ছিল, তাতে পুন:রায় নামাজ পড়তে হবে না।

◆ **জুতা ও সেন্ডেল পরা অবস্থায় সালাত আদায়ের বিধান**

১. যদি জুতা বা মোজা পবিত্র হয় তাহলে তা পায়ে পরিধান করে নামাজ আদায় করা সুন্নাত। কখনো কখনো খালি পায়ে নামাজ আদায় করবে। আর যদি মসজিদ নোংরা হয় অথবা মুসল্লিরা কষ্ট পায় তবে খালি পায়ে নামাজ পড়বে।

২. মুসল্লি যদি তার জুতা বা মোজা খুলে রাখতে চায়, তাহলে তা তার ডান পার্শ্বে রাখবে না; বরং দুই পায়ের মধ্যখানে রাখবে, অথবা বাম পার্শ্বে কেউ না থাকলে বাম পার্শ্বে রাখবে। প্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান শুরু করা এবং খোলার সময় বাম পা প্রথমে খোলা সুন্নাত। এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটবে না।

◆ উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায়ের পদ্ধতি

যাদের পরিধানের কোন কাপড় নেই উলঙ্গ অবস্থায় আছে নামাজ আদায়ের সময় যদি অন্ধকারে হয় এবং তাদেরকে কেউ না দেখে তাহলে তারা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে এবং ইমাম তাদের সামনে দাঁড়াবেন। আর যদি আলোতে হয় অথবা তাদের আশেপাশে অন্য মানুষ থাকে, তাহলে তারা বসে নামাজ আদায় করবে এবং ইমাম তাদের মধ্যখানে দাঁড়াবেন। আর যদি পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রকার মানুষ বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকে তাহলে পুরুষরা আলাদা ও মহিলারা আলাদা নামাজ আদায় করবে।

◆ ভুলে ওযু ছাড়া নামাজ পড়লে তার হুকুম

শরীয়তের কোন আদেশ ত্যাগের ব্যাপারে অজ্ঞতা ও ভুলে যাওয়া ওজর গ্রহণযোগ্য। সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ অথবা ভুলবশতঃ ওযু ছাড়াই নামাজ পড়ে ফেলে এবং তার স্মরণ না আসে তাতে সে গুনাহগার হবে বরং নামাযের দায় থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে তবে তার যদি ওযু ছাড়ার বিষয়টি স্মরণ হয়ে যায় তাহলে তাতে সে গুনাহগার হবে না। তবে যদি তার ওযু ছুটে যাওয়াটা স্মরণ হয়ে যায় তাহলে ওযু করে পুনঃরায় নামাজ আদায় করা তার জন্য ফরজ। এভাবে অন্যান্য আদেশাজ্ঞা পালন না করলেও তাই হবে। তবে যদি নিষেধাজ্ঞা হয় সেক্ষেত্রে অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ লঙ্ঘন হলে ওজর গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন : কোন ব্যক্তি না জেনে এমন কাপড় পরিধান করে নামাজ আদায় করছে যাতে নাপাক বস্তু ছিল অথবা সে জানত যে, উক্ত কাপড়ে নাপাকি আছে। অতঃপর সে ভুলে গিয়ে তা পরিধান করে নামাজ আদায় করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তার যদি সেই ভুল সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে পুনরায় তাকে নামায পড়তে হবে। আর যদি স্মরণ না আসে তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

◆ বিভিন্ন নামাযের কাজার পদ্ধতি

কতগুলো এমন আছে যেগুলোর ওজর দূর হওয়ার পরে কাজা করতে হয়, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। আর কিছু এমন আছে যা ছুটে গেলে তার হুবহু কাজা নেই, কিন্তু বদলি আছে; যেমন জুমার নামাজ ছুটে গেলে তার বদলে যোহর আদায়

করতে হয়। আবার কিছু নামাজ এমনও রয়েছে যা ছুটে গেলে সেই নামাজের সময়ের মধ্যে সুযোগ পাওয়া ছাড়া পরে তার কোন কাজা নেই; যেমন ঈদের নামাজ।

১. **বিশেষ কারণবশত :** কয়েক ওয়াক্তের নামাজ কাজা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তারতীব অনুযায়ী কাজা করা ফরজ। তবে কাজা নামাজের তারতীব বাদ হয়ে যাবে যদি ভুলে যায় কিংবা অজ্ঞতা বা কোন ওয়াক্তের নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার ভয় অথবা জুমা ছুটে যাওয়ার ভয় হয়।

২. কোন ব্যক্তি কোন ফরজ নামাজ শুরু করার পরে যদি তার স্মরণ হয় যে, সে পূর্বের ফরজ নামাজটি আদায় করেনি, তাহলে সে তার নামাজ পরিপূর্ণ করার পরে পূর্বের ছুটে যাওয়া নামাজের কাজা করবে। যদি কোন ব্যক্তি আসরের নামাজ আদায় করতে পারেনি সে মসজিদে প্রবেশ করে দেখল যে, মাগরিবের একামত দেয়া হয়েছে, তাহলে সে মাগরিবের নামাজ জামায়াতে ইমামের সাথে আদায়ের পরে আসরের কাজা করবে।

◆ সফরে ঘুমের কারণে ফজর সালাত ছুটে গেলে যেভাবে কাযা করবে

সফরে যাদের ঘুমের কারণে সূর্য উঠার পর ঘুম ভাঙবে, তাদের জন্য সুন্নাত হলো : সে স্থান থেকে অন্যত্র সরে যাবে। অতঃপর ওযু করে তাদের একজন আজান দেবে। এরপর ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করে একামত দিয়ে ফরজ সালাত আদায় করবে।

◆ বিবেক লোপ পাওয়া ব্যক্তি যেভাবে সালাত কাযা করবে

যে ব্যক্তির ঘুম অথবা নেশার কারণে জ্ঞান লোপ পায় এবং ফরজ নামাজ ছুটে যায় তাকে অবশ্যই সেই নামাজের কাজা করতে হবে। এভাবে যদি কোন বৈধ কাজের জন্য জ্ঞান লোপ পায়। যেমন : অনুভূতিনাশক পদার্থ ও ঔষধ সেবন করলে তাহলেও ছুটে যাওয়া নামাজের কাজা তার জন্য জরুরি। তবে যদি কার অনিচ্ছায় জ্ঞান লোপ পায় যেমন : বেহুঁশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি তাহলে তাকে নামাজে কাজা করতে হবে না।

◆ ঋতুবতী নারী ও বীর্যপাতজনিত অপবিত্র ব্যক্তি যেভাবে সালাত কাযা করবে

যদি কোন ঋতুবতী মহিলার নামাজের সময় থাকতেই মাসিক বন্ধ হয়ে যায় এবং নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই গোসল সম্ভবপর হয়, তাহলে সে গোসলের পরেই নামাজ আদায় করবে যদিও নামাজের নির্দিষ্ট সময় চলে যায়। এমনিভাবে যদি কারো ওপর গোসল ফরজ হয় এবং ঘুম থেকে জাগার পর গোসল করতে সূর্যোদয় হয়ে যায়, তাহলে সে গোসলের পরেই নামাজ আদায় করবে। কারণ, ঘুমন্ত ব্যক্তির নামাজের সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরেই।

◆ ঘুমের জন্য সালাত ছুটে গেলে বা ভুলে গেলে তার বিধান

যদি কোন ব্যক্তি কোন ফরজ নামাজের আগে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তা আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّرَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

যদি কোন ব্যক্তি কোন নামাজ আদায় করতে ভুলে যায় অথবা তা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার কাফফারা হলো স্মরণ হওয়ার পরে (বিলম্ব না করে) তা আদায় করে নেয়া। (বুখারী হাদীস নং ৫৯৭ মুসলিম হাদীস নং ৬৮৪)

৭. মসজিদের আদব

মুসলিমের জন্য শান্তভাবে ও গাম্ভীর্যের সাথে মসজিদে গমন করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِيْ صَلَاةٍ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "নামাজের জন্য আহবান করা হলে, তোমরা দৌড়ে তার দিকে ধাবিত হয়ো না, শান্তভাবে নামাজে আস। যতটুকু নামাজ পাও তা আদায় করা, আর যা ছুটে যায় তা পুরা কর। কারণ, তোমাদের কেউ যখন নামাজের জন্য রওয়ানা করে তখন সে নামাজ অবস্থায় থাকে।" (বুখারী হাদীস নং ৯০৮ মুসলিম হাদীস নং ৬০২)

১. মসজিদে প্রবেশের সময় মুসলিমের জন্য সুন্নাত হলো, নিচের দোয়াটি পাঠ করত : ডান পা প্রথমে প্রবেশ করানো–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

"আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিক্।" (মুসলিম হাদীস নং ৭১৩)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِفْتَحْ – খুলে দিন, لِيْ – আমার জন্য, أَبْوَابَ – দরজাসমূহ, رَحْمَتِكَ – আপনার রহমতের।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার দয়ার দরজাসমূহ খুলে দাও।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"আ'উযুবিল্লাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্ব–নিহিল ক্বদীম, মিনাশ শায়ত্ব–নির রাজীম।"

শাব্দিক অর্থ : أَعُوْذُ – আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, بِاللّٰهِ – আল্লাহর নিকট, اَلْعَظِيْمُ – মহান, وَ – এবং , بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ – তার করুণাময় চেহারার মাধ্যমে, وَ – এবং سُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ – সর্বকালীন রাজত্বের, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – বিতাড়িত শয়তান থেকে।

অর্থ : মহান আল্লাহ্ নিকট তাঁর করুণাময় চেহারার এবং তাঁর সর্বকালীন রাজত্বের মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৬৬)

২. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে নিচের দোয়াটি পড়ে বের হবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক্।" (মুসলিম হাদীস নং ৭১৩)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ - নিশ্চয়ই আমি, اَسْاَلُكَ - আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, مِنْ فَضْلِكَ - আপনার করুণার।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার কৃপা ও করুণা প্রার্থনা করছি।

◆ মুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে যা করবে

মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের মধ্যে অবস্থানকারী সকলের প্রতি সালাম দিবে। অতঃপর দুই রাকায়াত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে। উত্তম হলো, যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবে ততক্ষণ আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও নফল নামাজে একামত হওয়া পর্যন্ত লিপ্ত থাকবে। ইমামের ডান পার্শ্বে প্রথম সারিতে বসার চেষ্টা করবে।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ـ

আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তোমাদের কেহ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন যেনো আর বসার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়ে।

◆ **মসজিদে ঘুমানোর বিধান**

কোন আগন্তুক ও ফকির যার কোন ঘর নেই এ ধরনের মুখাপেক্ষীদের জন্য কখনো কখনো মসজিদে ঘুমানো বৈধ। তবে মসজিদকে রাত দিন সর্বদা ঘুমানোর স্থান বানিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ইতেকাফকারী ও আরামকারী বা এ ধরনের কেউ এ নিষেধের আওতাভুক্ত হবে না।

◆ **নামাজ আদায়কারীকে সালাম দেয়ার বিধান**

কোন নামাজীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সালাম দেওয়া উম এবং নামাজরত ব্যক্তিও নিজ আঙ্গুল, হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করে সালামের উত্তর দিবে; কথা বলে নয়।

عَنْ صُهَيْبٍ (رضى) قَالَ : مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلٰى إِشَارَةٍ .

সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজরত অবস্থায় তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাঁকে সালাম দেই। অতঃপর তিনি ইশারা করে আমাকে উত্তর দেন।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৯২৫, তিরমিযী হাদীস নং ৩৬৭)

◆ **মসজিদের কোন স্থান বুকিং বা নির্দিষ্ট করে রাখার বিধান**

নিজে মসজিদে আগে আগে আসা সুন্নাত। যদি কেউ জায়নামায ইত্যাদি বিছিয়ে জায়গা দখল করে রাখে এবং সে দেরী করে আসে তাহলে সে দুই দিক থেকে শরিয়ত লংঘন করল।

১. আসতে দেরী করেছে অথচ আগে আসার জন্য তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।

২. মসজিদের কিছু জায়গা সে জবরদখল করেছে এবং অন্য কাউকে সেখানে

নামাজ আদায়ে বাধা সৃষ্টি করেছে। যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে কোন কিছু বিছিয়ে রেখে দিয়ে দেরীতে আসে, তাহলে আগে যে আসবে তার জন্য উক্ত বিছানো জিনিস উঠিয়ে ফেলা এবং সেখানে নামাজ আদায় করা বৈধ। এতে তার কোন গুনাহ্ হবে না।

৮. সালাত আদায়ের পদ্ধতি

দিন ও রাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। আর তা হলো : জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর। যে ব্যক্তি নামাজের ইচ্ছা করবে সে ওযু করে কিবলার দিকে মুখ করে সুতরার নিকটে দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়ানোর স্থান হতে সুতরার দূরত্ব তিন হাত বা কম-বেশি পরিমাণ হবে। সেজদার স্থান থেকে সুতরার দূরত্ব হবে একটি ছাগল অতিক্রম করার জায়গা পরিমাণ। নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রম না করা নামাজ আদায়কারী হোক বা ইমাম হোক কোনভাবেই তার ও সুতরার মাঝে কোন কিছুকে বা কাউকে অতিক্রম করার সুযোগ দিবে না। মুসল্লি ও সুতরার মাঝে অতিক্রমকারী (কবীরা) গুনাহগার হবে।

قَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهٗ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

আবু জুহাইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত তার গুনাহ্ কত বড়! তাহলে মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ বছর দাড়িয়ে থাকা তার জন্য (অপেক্ষা করা) উত্তম হতো। (বুখারী হাদীস নং ৫১০ ও মুসলিম হাদীস নং ৫০৭)

◆ **তাকবীর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত নবী করীম ﷺ-এর সালাতের পদ্ধতি**

নামাজে দাঁড়ানোর পরে মনে মনে নামাজের নিয়ত করে তাকবীরে তাহরিমা (আল্লাহু আকবার) বলবে। তাকবীরের সাথে সাথে দুই হাত উঠানো (রফউল ইয়াদাইন করবে) কখনো কখনো তাকবীরের পরে দুই হাত উত্তোলন করবে, আর কখনো তাকবীরের পূর্বে। দুই হাত উঠানোর নিয়ম হল : দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পূর্ণভাবে খুলে হাতের ভিতরের অংশ কিবলার দিকে করবে এবং

তারপর দুই কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, কখনো কখনো তা দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে। শরীয়ত সম্মত সহীহ্ তরিকার আমল এবং সুন্নাতকে জীবিত করার লক্ষ্যে, কখনো এটি আমল করবে আবার কখনো অপরটি করবে।

অতঃপর ডান হাত বাম হাতের তালুর উপরের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপরে রেখে দুই হাত বুকের উপরে রাখবে। আর কখনো কখনো ডান হাত দ্বারা বাম হাত (আঁকড়ে) ধরে তা বুকের উপরে রাখবে। এমতাবস্থায় একাগ্রতার সাথে সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে। (সহীহ বুখারী হাদীস-৭১৭; মুসলিম হাদীস-৪৩৬; আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

◆ সানা পড়া

অতঃপর সহীহ কোন দোয়া (ছানা) দ্বারা নামাজের ভিতরের কাজ শুরু করবে। সুন্নত দোয়াসমূহের মধ্যে নিচের কিছু উল্লেখ করা হলো–

١. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

১. সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়াতাবারকাসমুকা, ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুক্।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৭৭৫ ও তিরমিযী হাদীস নং ২৪৩)

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَكَ - আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, وَبِحَمْدِكَ – আর আপনার প্রশংসার সাথে وَتَبَارَكَ – আর বড়ই বরকতময় হয়েছে, اسْمُكَ – আপনার নাম, وَتَعَالٰى – আর উপরে উঠেছে, جَدُّكَ – আপনার মর্যাদা, وَلَا اِلٰهَ – আর কোন মা'বুদ নেই, غَيْرُكَ – আপনি ছাড়া।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদা মহান এবং আপনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই।

٢. اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

২. **উচ্চারণ :** আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনি ওয়া বাইনা খত্বা-ইয়াইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব্, আল্লাহুম্মা নাক্বক্বিনী মিন খত্বা-ইয়াইয়া কামা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আবইয়াদু মিনাদ্দানাস, আল্লাহুম্মাগসিলনী মিন খত্বা-ইয়াইয়া বিছছালজি ওয়ালমায়ি ওয়ালবারাদ্।"

(বুখারী হাদীস নং ৭৪৪ মুসলিম হাদীস নং ৫৯৮)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! بَاعِدْ - দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও بَيْنِىْ - আমার মধ্যে, وَبَيْنَ خَطَايَاىَ - এবং আমার গোনাহের মধ্যে, كَمَا بَاعَدْتَّ - যেভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ, بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! نَقِّنِىْ - আমাকে পবিত্র করে নাও, مِنَ الْخَطَايَا - গোনাহসমূহ থেকে, كَمَا يُنَقَّ - যেভাবে পবিত্র করা হয়, الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ - সাদা কাপড়, مِنَ الدَّنَسِ - ময়লা থেকে, اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ - হে আল্লাহ! তুমি ধুয়ে দাও, خَطَايَاىَ - আমার গোনাসমূহ, بِالْمَاءِ - পানি দিয়ে, وَالثَّلْجِ - বরফ দিয়ে, وَالْبَرَدِ - ও শিশির দিয়ে।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে এত দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মাঝে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও, যেমনভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ধুয়ে ফেল, পানি, বরফ ও হিমশিলা দ্বারা।

٣. اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ، اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

৩. আল্লাহুম্মা রব্বা জিবর-ঈলা ও মীকাঈলা ও ইসরা-ফীল, ফাত্বিরাস সামাওয়াতি ওয়ালআরদ, 'আলিমালগইবি ওয়াশশাহাদাহ, আন্তা তাহকুমু বাইনা 'ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফূন। ইহ্দিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্বি বিইযনিক, ইন্নাকা তাহ্দী মান তাশাউ ইলা সির-তিম মুস্তাকীম।

(মুসলিম হাদীস নং ৭৭০)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, رَبَّ - প্রতিপালক, جِبْرَائِيْلَ - জিবরাইলের, وَمِيْكَائِيْلَ - এবং মিকাঈল, وَاِسْرَافِيْلَ - এবং ইসরাফীলের, فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ - আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ - আপনি হুকুম দেন আপনার বান্দাদের মাঝে, فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - তাদের মতানৈক্যের বিষয়ে, اِهْدِنِيْ - আমাকে পথ দেখান, لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ - মতানৈক্যের বিষয়ে, مِنَ الْحَقِّ - সত্যের ব্যাপারে, بِاِذْنِكَ - আপনার অনুমতিতে, اِنَّكَ تَهْدِيْ - নিশ্চয়ই আপনি হেদায়াত দান করেন, مَنْ تَشَاءُ - যাকে ইচ্ছা, اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - সঠিক পথের দিকে।

অর্থ : হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাত! আপনি আপনার অনুমতিতে তাদের (কাফেরদের) মতানৈক্যের বিষয়ে আমাকে হক (সত্যের) পথ দান করুন (হেদায়েত করুন)। কারণ, আপনি যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত তথা সঠিক পথ দান করেন।

৪. অথবা বলবে–

٤. اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا.

"আল্লাহু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাওঁ ওয়াআসীলা।" (মুসলিম হাদীস নং ৬০১)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ - আল্লাহ সবচেয়ে বড়, كَبِيْرًا - অনেক বড়, وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ - আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, كَثِيْرًا - অনেক বেশি, وَسُبْحَانَ اللّٰهِ - আর আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا - সকাল এবং বিকালে।

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়, তিনি মহান এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অনেক প্রশংসা এবং সকাল বিকালে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

৫. অথবা বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

"আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরান ত্বইয়িবান মুবারকান ফীহ্।"

শাব্দিক অর্থ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, حَمْدًا – প্রশংসা, كَثِيْرًا – অনেক বেশি, طَيِّبًا – পবিত্র, مُبَارَكًا – বরকতপূর্ণ, فِيْهِ – এর মধ্যে।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অনেক প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতপূর্ণ।

(মুসলিম হাদীস নং ৬০০)

সুন্নাতকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন প্রকার সুন্নাতের আমল করার জন্য উপরোল্লিখিত দোয়াগুলো একেক সময়ে একেকটা পড়বে।

অতঃপর চুপে চুপে বলবে–

◆ **আউযুবিল্লাহ–**

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্ব–নির রাজীম।"

শাব্দিক অর্থ : اَعُوْذُ – আমি আশ্রয় চাই, بِاللّٰهِ – আল্লাহর কাছে, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – বিতাড়িত শয়তান থেকে।

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

◆ **বিসমিল্লাহ পড়া**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শাব্দিক অর্থ : بِسْمِ اللّٰهِ - শুরু করছি আল্লাহর নামে, الرَّحْمٰنِ – যিনি পরম করুণায়, الرَّحِيْمِ – অতি দয়ালু।

অথবা বলবে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

আ'উযু বিল্লাহিস সামী'উল 'আলীমি মিনাশ শায়ত্ব–নির রাজীম, মিন হামজিহী ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহি।"

অর্থ : আমি ঐ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত, বিতাড়িত শয়তান থেকে, তার কুমন্ত্রণা থেকে, তার গর্ব (অহমিকা) থেকে এবং তার ফুঁক (যাদু) থেকে। (হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ৭৭৫ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং ৭০১, তিরমিযী হাদীস নং ২৪২, সহীহ সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ২০১, ইররাউল গালীল দ্রঃ হাদীস নং ৩২১)

অতঃপর চুপে চুপে বলবে : "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(বুখারী হাদীস নং ৭৪৩, মুসলিম হাদীস নং ৩৯৯)

এরপর প্রতি আয়াতে থেমে থেমে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আর যে সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার কোন নামাজই হবে না। নিঃশব্দে কেরাতের নামাজে প্রতিটি রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। কিন্তু ইমামের স্বশব্দে কেরায়াতের নামাজে ও রাকাতসমূহে ইমামের কেরায়াত শুনার জন্য চুপ থাকবে। সকল মাজহাবের মুহাক্কিক বিদ্বানগণের মতো হলো : স্বশব্দে কেরায়াতের সময়ও মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। এর অতিরিক্ত আর কিছু পাঠ করতে পারবে না।

◆ সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের গুরুত্ব

১. উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ব্যক্তির সালাত হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।

(বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল- ৩০২)

২. এক বর্ণনায় আছে, সে ব্যক্তির সালাত যথেষ্ট নয়, যে তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। (দারাকুত্বনী, ইবনে হিব্বান, ইরওয়াউল গালীল- ৩০২)

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোনও সালাত আদায় করে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ঐ সালাত (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلٰثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ اقْرَأْبِهَا فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَّمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ

فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ -

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ না করে সালাত পড়বে, তার সালাত অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ। তখন আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন, তুমি মনে মনে পড়বে। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ বলেন, আমি সালাতকে ভাগ করেছি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করে। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চাবে। যখন বান্দা বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। যখন বান্দা বলে, 'আররাহ্মানির রাহীম,' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন ব্যক্ত করল এবং যখন বান্দা বলে, 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন' তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল এবং যখন বান্দা বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈন', তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি (ইবাদত আমার জন্য এবং সাহায্য তার জন্য) এবং আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে চেয়েছে এবং যখন বান্দা বলে, 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন', তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার জন্য রয়েছে। (মুসলিম-৩৯৫, আবু দাউদ, তিরমিযী, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত-৮২৩)

◆ ইমামের পিছনে জোরে 'আমীন' বলার বিশেষত্ব

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওলাদ-দোয়া-ল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বল। কারণ যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাগণের 'আমীন' বলার সাথে একীভূত হয়, তার পিছনের সকল পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায়।

(মালেক, বুখারী- ৭৮০, মুসলিম- ৪১০, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইমাম 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ-দোয়া-ল্লীন', বললে তোমরা 'আমীন' বল। তাহলে (সূরা ফাতিহায় উল্লেখিত দুআ) আল্লাহ তোমাদের জন্য মঞ্জুর করে নেবেন। (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব- ৫১৩)

৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইহুদীরা কোন কিছুর ওপর তোমাদের অতটা হিংসা করে না, যতটা সালাম ও 'আমীন' বলার পর করে।
(ইবনে মাজাহ, খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব- ৫১২)

◆ সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

যখন সূরা ফাতিহা পড়া শেষ হয়ে যাবে তখন ইমাম, মোক্তাদী ও একাকী নামাজ আদায়কারী সবাই টেনে "আ-মীন" বলবে এবং উচ্চস্বরে তিলাওয়াতের নামাজসমূহে ইমাম ও মুক্তাদি সবাই একত্রে স্বশব্দে "আ-মীন" বলবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ اِبْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ.

শাব্দিক অর্থ : اَلْحَمْدُ – সকল প্রশংসা, لِلّٰهِ – আল্লাহর জন্য (যিনি), رَبِّ الْعَالَمِيْنَ – বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – খুবই দয়ালু, অতিশয় মেহেরবান, مَالِكِ – মালিক, يَوْمِ الدِّيْنِ – বিচার দিনের, اِيَّاكَ – কেবল তোমারই, نَعْبُدُ – আমরা ইবাদত করি, وَاِيَّاكَ – আর কেবল তোমারই কাছে, نَسْتَعِيْنَ আমরা সাহায্য চাই। اِهْدِنَا – আমাদেরকে দেখিয়ে দিন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ – সরল সঠিক পথ, صِرَاطَ الَّذِيْنَ – ওদের পথ, اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ – যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ – ওদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনি রাগান্বিত হয়েছেন, وَلَا الضَّالِّيْنَ – এবং ওদের পথও নয় যারা বিপথগামী হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ বলেন : "যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল। কারণ, যার আমীন ফেরেশতাগণের আমীনের

সাথে মিলে যাবে, তার বিগত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব (এই হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমীন বলতেন।

(বুখারী হাদীস নং ৭৮০ মুসলিম হাদীস নং ৪১০)

সূরা ফাতিহার পর প্রথম দুই রাকায়াতে যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে অথবা কুরআন থেকে তার নিকট যা সহজ মনে হয় তা থেকে কিছু তিলাওয়াত করবে। কখনো দীর্ঘ সূরা পাঠ করবে, আর কখনো সফরকালে, অসুস্থতা, বাচ্চাদের কান্নাকাটি ইত্যাদি কারণে তিলাওয়াত সংক্ষেপ করবে। অধিকাংশ সময়ে পূর্ণ একটি সূরা পাঠ করবে এবং কখনো কখনো দুই রাকায়াতে একটি সূরা ভাগ করে পাঠ করবে। আবার কখনো দ্বিতীয় রাকায়াতে পুনঃরায় সূরার শুরু থেকে পাঠ করে তা শেষ করবে। আর কখনো কখনো একই রাকায়াতে দুই বা তার অধিক সূরা পাঠ করবে। তেলাওয়াত বিশুদ্ধভাবে ও সুন্দর কণ্ঠে করবে।

ফজরের নামাজে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকাতে সশব্দে তিলাওয়াত করবে। যোহর, আসর এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকায়াত ও এশার শেষের দুই রাকায়াতে চুপে চুপে তিলাওয়াত করবে। প্রত্যেক আয়াত পাঠের পূর্বে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

◆ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে সুন্নাত মোতাবেক কেরাত

সূরা ক্বফ থেকে কুরআনুল কারিমের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সূরাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমত : তেওয়ালে মুফাসসাল তথা দীর্ঘ সূরাসমূহ আর তা হলো : সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাবার পূর্ব পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত : আওসাতে মুফাসসাল তথা মাঝারি সূরাসমূহ। সেগুলো হলো : সূরা নাবা থেকে সূরা দুহার পূর্ব পর্যন্ত।

তৃতীয়ত : কেসারে মুফাসসাল তথা ছোট সূরাসমূহ। সেগুলো হচ্ছে : সূরা দুহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত। উপরে বর্ণিত সূরাগুলোর পরিমাণ চার পারার চেয়ে কিছু বেশি।

১. **ফজরের নামাজ :** এতে সূরা ফাতিহার পরে প্রথম রাকায়াতে তেওয়ালে মুফাসসাল সূরাসমূহ যেমন : সূরা ক্বফ ইত্যাদি থেকে পড়বে। কখনো কখনো আওসাতে মুফাসসাল সূরাসমূহ যেমন : সূরা শামস ইত্যাদি এবং কেসারে মুফাসসাল সূরাসমূহ যেমন : সূরা জিলজাল ইত্যাদি পাঠ করবে। আবার কখনো এগুলোর চেয়ে দীর্ঘ সূরা থেকে পাঠ করতে পারে। প্রথম রাকায়াতের তিলাওয়াত দীর্ঘ করবে এবং দ্বিতীয় রাকায়াত তার চেয়ে কম করবে। জুমার দিনে ফজরের নামাজের প্রথম রাকায়াতে সূরা সাজদাহ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ইনসান (দাহার) পড়বে।

২. **যোহরের নামাজ :** জোহরের প্রথম দুই রাকাতের প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা পাঠ করবে। তবে এতে প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকায়াতের চেয়ে দীর্ঘ হবে। যোহরের প্রথম দুই রাকায়াতে ত্রিশ (৩০) আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে। কখনো কখনো কিরাত দীর্ঘায়িত করবে। আবার কখনো ছোট সূরাসমূহ থেকে পাঠ করবে। যোহরের শেষের দুই রাকায়াতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। যোহরের শেষের দুই রাকায়াতে কখনো সূরা ফাতিহার পরে প্রথম দুই রাকায়াতের অর্ধেক পরিমাণের সূরা বা আয়াত পাঠ করবে। (আহমদ, মুসলিম, মিশকাত হাদীস-৮২৯; আবু দাউদ হাদীস-৮০৫-৮০৬)

৩. **আসরের নামাজ :** আসরের প্রথম দুই রাকায়াতের প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা পড়বে। এতে দ্বিতীয় রাকায়াতের সূরার চেয়ে প্রথম রাকতের সূরা দীর্ঘ হবে। আসরের প্রথম দুই রাকায়াতে পনেরো (১৫) আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে। এতেও কোন কোন সময় ইমাম মুসল্লিদেরকে কোন কোন আয়াত শুনিয়ে পাঠ করবে। (মুসলিম, আবু দাউদ হাদীস-৮০৫)

৪. **মাগরিবের নামাজ :** সূরা ফাতিহার পরে এতে কখনো কখনো কেসারে মুফাসসাল সূরাসমূহ থেকে পাঠ করবে। আবার কখনো তেওয়ালে মুফাসসাল বা আওসাতে মুফাসসাল সূরা পাঠ করবে। আবার কোন কোন সময় দুই রাকায়াতে সূরা আ'রাফ ও কখনো সূরা আনফাল থেকে পড়বে। আর তৃতীয় রাকায়াতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।
(সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাদীস-৫৯৬ ও ৮৫৩)

৫. **এশার নামাজ :** এতে প্রথম দুই রাকায়াতে ফাতিহার পরে আওসাতে মুফাসসাল সূরাসমূহ থেকে পাঠ করবে। কিরাত (কুরআন পাঠ) শেষ হলে সেকতা করবে অর্থাৎ একটু অপেক্ষা করবে। অতঃপর দুই হাত দুই কাঁধের অথবা দুই কান বরাবর উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু করবে। রুকুতে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখবে যেন ধরে আছে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখবে। আর হাতের দুই কনুই শরীরের দুই পার্শ্ব থেকে দূরে রাখবে। এমন ভাবে রুকু করবে যেন পিঠ ও মাথা এবং নিতম্ব বরাবর হয়। (তিরমিযী হাদীস-৩০৯; নাসায়ী, মিশকাত হাদীস-৮৩৩, ৮৩৪)

◆ রুকুর দোয়া

রুকুতে ধীর-স্থির এবং শান্ত হয়ে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করবে। রুকুর ও রুকু থেকে উঠে তাসবীহ অতঃপর রুকুর বিভিন্ন প্রকারের দোয়া ও জিকির থেকে পড়বে। তন্মধ্যে নিম্নের কিছু উল্লেখ্য করা হলো–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

১. "সুবহানা রাব্বিইয়াল 'আযীম।" তিন বা তার অধিক বার বলবে।

(মুসলিম হাদীস নং ৭৭২, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৮৮৮)

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَ – আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি, رَبِّيَ الْعَظِيْمِ – আমার মহান প্রভুর।

অর্থ : আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

২. অথবা তিনবার বলবে–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

"সুবহানা রাব্বিইয়াল 'আযীম ওয়াবিহামদিহি।"

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَ – আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি, رَبِّيَ الْعَظِيْمِ – আমার মহান প্রভুর, وَبِحَمْدِهِ – এবং তাঁর প্রশংসা। (হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৮৭০, দারাকুতনী: ১/৩৪১ শাইখ আলবানী (রহঃ সিফাতুসসলাহ কিতাবে পৃঃ১৩৩ সহীহ বলেছেন।)

অর্থ : আমার মহান রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি।

৩. অথবা বলবে–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফির লী।" এটি রুকু ও সিজদায় উভয় স্থানে পড়া যায়। (বুখারী হাদীস-৭৯৪, মুসলিম হাদীস-৪৮৪)

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَكَ – আমি পবিত্রতা ঘোষণা করছি, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! وَبِحَمْدِكَ – এবং তোমার প্রশংসার সাথে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ – হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

অর্থ : মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।

৪. অথবা বলবে–

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

"সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।" (মুসলিম হাদীস নং ৭৭১)

শাব্দিক অর্থ : سُبُّوْحٌ - পবিত্র, قُدُّوْسٌ - মোবারক, رَبُّ الْمَلَائِكَةِ - তিনি হলেন ফেরেশতার প্রতিপালক, وَالرُّوْحِ - এবং জিবরাঈলের।

অর্থ : আল্লাহ পবিত্র ও মোবারক তিনি সকল ফেরেশতা ও জিবরাঈলের রব।

৫. অথবা বলবে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ.

"আল্লাহুম্মা লাকা রাক'তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। খশা'আ লাকা সাম'য়ী ওয়া, বাসারী, ওয়া মুখখী, ওয়া 'আযমী, ওয়া 'আসাবী।"

(মুসলিম হাদীস নং ৪৮৭)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, لَكَ - আপনার জন্য, رَكَعْتُ - আমি রুকু করেছি, وَبِكَ اٰمَنْتُ - আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, وَلَكَ اَسْلَمْتُ - আপনার জন্য আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ - আমার কান আপনার জন্য বিনীত হয়েছে, وَبَصَرِيْ - এবং আমার চোখ, وَمُخِّيْ - এবং আমার মগজ, وَعَظْمِيْ - আমার হাড়, وَعَصَبِيْ - আমার স্নায়ুতন্ত্র।

হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমি রুকু করছি এবং তোমার উপর ঈমান এনেছি ও তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার কান, চোখ, বুদ্ধি বা মগজ, হাড় ও স্নায়ুতন্ত্র তোমার জন্য বিনয়ী হয়েছে।

৬. অথবা বলবে–

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

"সুবহানা যিল জাবরূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিইয়ায়ি ওয়াল আজামাহ্।"

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَ - আমি প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, ذِي الْجَبَرُوْتِ - মহাপ্রতাপশালী, وَالْمَلَكُوْتِ - এবং রাজত্ব, وَالْكِبْرِيَاءِ - এবং বড়ত্ব, وَالْعَظَمَةِ – এবং সম্মান।

অর্থ : মহাপ্রতাপশালী এবং রাজত্ব, বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারীর জন্য প্রশংসা করছি। এটি রুকু ও সিজদায় বলবে।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৮৭৩, নাসাঈ হাদীস নং ১০৪৯)

বিভিন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পড়বে যেন বিভিন্ন সহীহ হাদীসের আমল হয় এবং সুন্নাত জীবিত হয়।

অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে ও পিঠ এমনভাবে সোজা করবে যেন মেরুদণ্ডের হাড়গুলো নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসে। এরপর দুই হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কানের বরাবর উঠাবে, যার বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর দুই হাত ছেড়ে দেবে অথবা বুকের উপরে রাখবে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর ইমাম বা একাকী নামাজ আদায়কারী বলবে–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ .

"সামি' আল্লাহু লিমান হামিদাহ্।"

(বুখারী হাদীস নং ৭৩২, মুসলিম হাদীস নং ৪১১)

শাব্দিক অর্থ : سَمِعَ اللّٰهُ – আল্লাহ শোনেন, لِمَنْ حَمِدَهٗ – যে তাঁর প্রশংসা করে।

অর্থ : আল্লাহ্ তার কথা শ্রবণ করেছেন যে ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করেছে।

যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তখন ইমাম, মোক্তাদি ও একাকী নামাজ আদায়কারী সবাই বলবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

১. "আল্লাহুম্মা রব্বানাা ওয়া লাকালহামদ্।"

(বুখারী হাদীস নং ৭৩২, মুসলিম হাদীস নং ৪১১)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, رَبَّنَا - আমাদের প্রতিপালক, وَلَكَ الْحَمْدُ - এবং আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! আর তোমার জন্যই প্রশংসা।

২. অথবা বলবে–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"রব্বানা লাকাল হামদ্।"

শাব্দিক অর্থ : رَبَّنَا – আমাদের প্রতিপালক, لَكَ الْحَمْدُ – আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা তোমারই। (বুখারী হাদীস নং-৭৮৯)

৩. অথবা বলবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ।" (বুখারী হাদীস নং ৭৯৬, মুসলিম হাদীস নং ৪০৯)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, رَبَّنَا – আমাদের প্রতিপালক, لَكَ الْحَمْدُ – সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য।

অর্থ : হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সকল প্রশংসা।

সুন্নাত জীবিত করার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন আমল করার জন্য বিভিন্ন দোয়া বিভিন্ন সময়ে পড়বে।

কখনো কখনো এ অংশটুকু বেশি বলবে–

حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

"রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু হামদান্ কাছীরান্ ত্বইয়িবান্ মুবারাকান্ ফীহ্।"

শাব্দিক অর্থ : رَبَّنَا – হে আমাদের মালিক (প্রভু), وَلَكَ الْحَمْدُ – তোমাদের জন্য সকল প্রশংসা, حَمْدًا – এমন প্রশংসা যা, كَثِيْرًا – অনেক, طَيِّبًا – পবিত্র, مُبَارَكًا فِيْهِ – যাতে রয়েছে বরকত।

অর্থ : হে আমাদের রব! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, অধিক প্রশংসা-যা পবিত্র ও বরকতপূর্ণ। (বুখারী হাদীস নং ৭৯৯)

আর কখনো মিলাবে–

مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

"মিলউস সামাওয়াতি ওয়া মিলউল আরযি ওয়া মা বাইনাহুমা, ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু, আল্লাহুম্মা ত্বহহিরনী বিছছালজি ওয়ালবারাদি ওয়ালমায়িল বারিদ, আল্লাহুম্মা ত্বহহিরনী মিনাযযুনূবি ওয়ালখত্ব–ইয়া কামা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাল ওয়াসাখ্।" (মুসলিম হাদীস নং ৪৭৮)

আর কখনো এ দোয়া বৃদ্ধি করবে–

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"মিলউস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি, ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু, আহলাছ ছানায়ি ওয়াল মাজদ্, লা মানি'আ লিমা আ'ত্বইতা ওয়া লা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়া লা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিনকালজাদ্দু।" (মুসলিম হাদীস নং ৪৭৮)

আর কখনো বৃদ্ধি করবে–

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"মিলউস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি, ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু, আহলাছ ছানায়ি ওয়ালমাজদ, আহাক্কু মা ক্বা–লাল 'আব্দু, ওয়া কুললুনা লাকা আবদ্, আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'ত্বইত, ওয়া লা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।" (মুসলিম হাদীস নং ৪৭৭)

◆ রুকুতে কুরআন পড়া নিষেধ

নবী করীম ﷺ রুকু' ও সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাকে রুকু ও সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা রুকুতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর এবং সিজদায় বেশি বেশি করে দোয়া কর। সিজদা দোয়া' কবুলের উপযুক্ত জায়গা।

সুন্নাত হলো রুকুর পর উঠে দীর্ঘক্ষণ ধীর-স্থিরভাবে দাঁড়ানো। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদার জন্য ঝুকবে ও সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করবে। সাতটি অঙ্গ হলো : দু'টি হাতের তালু, দু'টি হাঁটু, দু'টি পা ও নাকসহ কপাল। আর দুই হাঁটু মাটিতে রাখার পূর্বে দুই হাত রাখবে। এরপর রাখবে নাকসহ কপাল। দুই হাতের তালুদ্বয় প্রসারিত করে তার উপর ভর দিবে। আর হাতের আঙ্গুলগুলো একটি অপরটির সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে ও কিবলার দিকে মুখ করে

রাখবে। হাত কাঁধ বা কান বরাবর রাখবে। নাক ও কপালকে মাটির সাথে লাগিয়ে রাখবে। বাহুদ্বয়কে পাঁজর হতে দূরে রাখবে। অনুরূপভাবে পেটকে উরুদ্বয় থেকে। কনুইদ্বয় ও বাহুদ্বয়কে মাটি থেকে উপরে উঠিয়ে রাখবে।

হাঁটুদ্বয় ও পায়ের আঙ্গুলগুলোকে মাটির সাথে লাগিয়ে রাখবে। আর হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথাগুলোকে কিবলার দিক করে রাখবে। পাদ্বয় খাড়া করে রাখবে ও দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রাখবে। অনুরূপ দুই উরুর মাঝেও ফাঁক রাখবে। মুসল্লি তার সেজদায় ধীর-স্থীরতা বজায় রাখবে এবং বেশি বেশি দোয়া করবে। আর রুকু ও সিজদায় কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করবে না। (সিজদার সময় পায়ের দুই গোড়ালি মিলিয়ে রাখার সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে খুযাইমা হাদীস নং ৬৫৪ হাকিম বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন ও ইমাম যাহাবী একমত পোষণ করেছেন। (দ্রঃ রাসূল ﷺ-এর নামাজ আলবানী (রহ) পৃঃ ১৪২। অনুবাদক)

◆ সিজদার দোয়া

অতঃপর হাদীসে যে সকল সেজদার দোয়া ও জিকির-আজকার বর্ণিত হয়েছে তার মধ্য হতে পড়বে। যেমন–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى .

১. "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা।" তিন বা এর অধিক বার।

(মুসলিম হাদীস নং ৭৭২, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৮৮৮)

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَ – আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি, رَبِّىَ الْاَعْلٰى – আমার মহান প্রতিপালকের।

অর্থ : আমার মহান প্রতিপালকের তাসবীহ্ পাঠ করছি।

২. অথবা বলবে–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَبِحَمْدِهٖ .

"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা ওয়াবিহামদিহি।" (হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৮৭০, দারাকুতনী ১/৩৪১ আলবানী (রহ:) সিফাতুস সালাত কিতাবে-১৩৩ সহীহ বলেছেন)

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَ – আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি, رَبِّىَ الْاَعْلٰى – আমার মহান প্রতিপালকের, وَبِحَمْدِهٖ – এবং আপনার প্রশংসার সাথে। তিনবার।

অর্থ : আমার মহান প্রতিপাকের তাসবীহ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি।

৩. অথবা বলবে–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ.

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফির লী"।
(বুখারী হাদীস নং ৭৯৪ ও মুসলিম হাদীস নং ৪৮৪)

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَكَ – হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, رَبَّنَا – আমাদের প্রতিপালক, وَبِحَمْدِكَ – আপনার প্রশংসার সাথে, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اغْفِرْلِىْ – আমাকে ক্ষমা করে দিন।

অর্থ : আমার মহান প্রতিপালকের তাসবীহ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি! হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

৪. অথবা বলবে–

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

"সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ্।" (মুসলিম হাদীস নং ৪৮৭)

শাব্দিক অর্থ : سُبُّوْحٌ – সমস্ত তাসবীহের মালিক, قُدُّوْسٌ – পূত ও পবিত্র, رَبُّ الْمَلَائِكَةِ – ফেরেশতাদের রব, وَالرُّوْحِ – এবং জিবরাঈলের মালিক।

অর্থ : আল্লাহ পবিত্র ও মোবারক এবং তিনি সকল ফেরেশতা ও জিব্রাঈলের রব।

৫. অথবা বলবে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

"আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু, ওয়া বিকা আমান্তু, ওয়া লাকা আসলামতু, ওয়া আনতা রাব্বী সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহু, ফাআহসানা দুরাতাহু ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু, তাবারকাল্লাহু আহসানুল খ-লিকীন।" (মুসলিম হাদীস নং ৭৭১)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, لَكَ سَجَدْتُ – আমি সেজদা করেছি, তোমার জন্য وَبِكَ اٰمَنْتُ – এবং আমি আপনার ঈমান এনেছি, وَلَكَ اَسْلَمْتُ – এবং কেবল আপনার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি, اَنْتَ رَبِّيْ – আপনি আমাদের রব, سَجَدَ وَجْهِيْ – আমার চেহারা সেজদা করেছে, لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ – ঐ সত্তার জন্য যে তাকে সৃষ্টি করেছে, وَصَوَّرَهٗ – এবং তাকে আকৃতি দান করেছে, فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهٗ – তার আকৃতি সুন্দর করেছেন, وَشَقَّ سَمْعَهٗ – এবং তাকে শ্রবণশক্তি দিয়েছে, وَبَصَرَهٗ – তাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ – আল্লাহ তায়ালা অতি সুউচ্চ তিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।

৬. অথবা বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ.

"আল্লাহুম্মাগফির লী যামবী কুল্লাহ্, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহ্, ওয়া আওওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহ্, ওয়া 'আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহ্।" (মুসলিম হাদীস নং ৪৮৩)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اغْفِرْلِيْ – আমাকে ক্ষমা করে দিন, ذَنْبِيْ – আমার গুনাহ, كُلَّهٗ – সকল, دِقَّهٗ – সূক্ষ্ম, وَجِلَّهٗ – বাহ্যিক وَاَوَّلَهٗ – তার শুরু, وَاٰخِرَهٗ – তার শেষ, وَعَلَانِيَتَهٗ – তার গোপন, وَسِرَّهٗ – তার প্রকাশ্য।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গোপন প্রকাশ্য, শুরু শেষ সূক্ষ্ম বাহ্যিক সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন।

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

"আল্লাহুম্মা আ'উযু বিরিদ-কা মিন সাখাত্বিক্, ওয়া বিমু'আফাতিকা মিন 'উকূবাতিক্, ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা লা উহসী ছানাআন 'আলাইক্, আন্তা কামা আছনাইনা 'আলা নাফসিক্।" (মুসলিম হাদীস নং ৪৮৬)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اَعُوْذُ – আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, بِرِضَاكَ – আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, مِنْ سَخَطِكَ – আপনার রাগ থেকে,

وَبِمُعَافَاتِكَ - - এবং আপনার ক্ষমার দ্বারা, مِنْ عُقُوْبَتِكَ - আপনার শাস্তি থেকে, وَاَعُوْذُ بِكَ - আপনার নিকট আশ্রয় চাই, مِنْكَ - আপনার থেকে, لَا اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ - - আপনার প্রশংসা গুণে শেষ করতে পারবে না, اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ - যেমন আপনি আপনার জন্য প্রশংসা নির্ধারণ করেছেন।

৮. অথবা বলবে–

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

"সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।"

(মুসলিম হাদীস নং ৪৮৫)

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَكَ - আপনার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, وَبِحَمْدِكَ - এবং আপনার প্রশংসা, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

৯. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِى بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِى نَفْسِىْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا -

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার অন্তর, জিহবা, কান, চোখ, নিচে, উপরে, ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছে এবং দেহে নূর (আলো) দান কর এবং আমার নূরকে মহান করে দাও।

সুন্নাতকে জীবিত করার লক্ষ্যে একবার এটা পড়বে আবার অন্যবার অন্যটা পড়বে। বর্ণিত দোয়া হতে বেশি বেশি দোয়া পাঠ এবং সিজদাকে শান্তভাব দীর্ঘ করবে।

◆ সিজদা অবস্থায় কুরআন পড়া নিষিদ্ধ

রাসূলাল্লাহ ﷺ রুকু ও সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। বরং তিনি সিজদায় অধিকতর দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে একটি হাদীস রুকু অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বলেছেন, বান্দার সিজদাহ অবস্থায় আল্লাহ বেশি নিকটবর্তী হয়। তোমরা সিজদায় বেশি বেশি করে দোয়া কর।

এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদা হতে মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে এবং ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে বসবে। ডান হাত ডান উরু বা হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম উরু বা হাঁটুর উপর রাখবে। আর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো হাঁটুর উপর প্রসারিত করে রাখবে।

আবার কখনো কখনো এ বসাটি 'ইক'আ' করে তথা পায়ের আঙ্গুলগুলো খাড়া রেখে গোড়ালীর উপর বসবে। এ বৈঠকে ধীর-স্থিরতা বজায় রাখবে যাতে করে সোজাভাবে বসে যায় এবং প্রত্যেকটি হাড় তার আপন স্থানে পৌছে যায়।

অতঃপর দুই সিজদার মাঝে হাদীসে বর্ণিত দোয়া ও জিকির-আজকার হতে পড়বে। যেমন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ. أَوْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ.

১. [আল্লাহুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়া'আফিনী ওয়াহদিনী, ওয়ারজুকনী] অথবা [রব্বিগফির লী ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়ারফা'নী, ওয়াবযুকনী ওয়াহদিনী]

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ – হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, وَارْحَمْنِيْ – আমার প্রতি দয়া করুন, وَعَافِنِيْ – আর আমাকে নিরাপদ রাখুন, وَاهْدِنِيْ – আর আমাকে সঠিক পথ দেখান, وَارْزُقْنِيْ – আর আমাকে রিযিক দান করুন।

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৮৫০, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৮৯৮)

২. "রব্বিগফির লী।" رَبِّ اغْفِرْلِيْ.

শাব্দিক অর্থ : رَبِّ – হে আমার প্রতিপালক, اِغْفِرْلِيْ – আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

একাধিক বার পড়বে। (হাদীসটি সহীহ, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৮৯৭)

এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে। প্রথম সিজদায় যা যা করেছে অনুরূপ এ সিজদাও করবে।

◆ বিশ্রামের বৈঠক

অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে বাম পায়ের উপর এমন হয়ে বসবে যাতে করে প্রত্যেকটি হাড় তার আপন স্থানে ফিরে যায়। এ বসাকে "জালসাতুল ইস্তারাহ্" তথা আরামের বৈঠক বলে। এ বসাতে কোন প্রকার দোয়া বা জিকির নেই। (সহীহ বুখারী হাদীস-৮০১; মুসলিম হাদীস-৪৭১; তিরমিযী হাদীস-২৭৯; ইবনে মাজা হাদীস-৯৭৯; আহমদ হাদীস-১৫৭১)

রাসূলে করীম ﷺ দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে সোজা হয়ে বাম পায়ের উপর বসতেন এবং প্রত্যেক হাড় তার স্ব স্ব স্থানে বহাল হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন।

এরপর মাটিতে ভর করে দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়াবে। আর প্রথম রাকায়াতে যা যা করেছে তাই এ রাকায়াতে করবে। কিন্তু এ রাকায়াতকে প্রথম রাকায়াত হতে কিছু সংক্ষেপ করবে এবং দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা পাঠ করবে না।

অত:পর তিন বা চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামায হলে দ্বিতীয় রাকাতের পর প্রথম বৈঠকের জন্য ইফতিরাশ তথা বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। আর হাত ও আঙ্গুলগুলো যেমনটি দুই সিজদার মাঝে করেছিল অনুরূপ করবে। কিন্তু ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলগুলো মুঠ বেঁধে রাখবে এবং শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইঙ্গিত করবে। এ আঙ্গুলটি উঠিয়ে রাখবে এবং দোয়া করত: নড়াতে থাকবে। অথবা নড়ানো ছাড়াই উঠিয়ে রাখবে এবং সালাম ফিরানো পর্যন্ত তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকবে। আর যখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে তখন বৃদ্ধা আঙ্গুলি মধ্যমা আঙ্গুলির উপর রাখবে। আর কখনো এ দু'টি দ্বারা হালকা তথা বৃত্তকার করবে। আর বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখবে। (মুসলিম হাদীস-৫৭৯; আবু দাউদ হাদীস-৯৮৮-৯৮৯)

এরপর যে সকল শব্দ দ্বারা তাশাহহুদ বর্ণিত হয়েছে তা হতে মনে মনে পড়বে। যেমন– তাশাহুদ মোট ৫টি যা ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু মুসা, আশআরী ও উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। এখানে দুটি উল্লেখ করছি।

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর তাশাহহুদ যা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর তা হচ্ছে–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্বয়্যিবাত, আস্‌সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস্‌সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস স-লিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহ্।" (বুখারী হাদীস নং ৩৩৭০ ও মুসলিম হাদীস নং ৪০৬)

শাব্দিক অর্থ : اَلتَّحِيَّاتُ - সকল সম্মান, لِلّٰهِ - আল্লাহর জন্য, وَالصَّلَوَاتُ - সকল প্রার্থনা, وَالطَّيِّبَاتُ - সকল পবিত্র বাণীসমূহ (সবই আল্লাহর জন্য) اَلسَّلَامُ - শান্তি, عَلَيْكَ - আপনার প্রতি, اَيُّهَا النَّبِيُّ - হে নবী! وَرَحْمَةُ اللّٰهِ - আর আল্লাহর রহমত, وَبَرَكَاتُهُ - এবং তাঁর সকল বরকত (আপনার উপর বর্ষিত হোক), اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا - শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর, وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ - আর আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের উপর, اَشْهَدُ - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنْ لَّا اِلٰهَ - কোন মা'বুদ নেই, اِلَّا اللّٰهُ - আল্লাহ ছাড়া, وَاَشْهَدُ - আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, اَنَّ مُحَمَّدًا - অবশ্যই মুহাম্মদ, عَبْدُهٗ - তাঁর বান্দা, وَرَسُوْلُهٗ - এবং তাঁর রাসূল।

অর্থ : যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

২. অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর তাশাহহুদ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শিক্ষা দান করেছিলেন–

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

"আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস সালাওয়াতুত ত্বয়্যিবাতু লিল্লাহ্, আসসালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্, আসসালামু

'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস স-লিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু।" (মুসলিম হাদীস নং ৪০৩)

কখনো এটি দ্বারা আর কখনো ওটি দ্বারা তাশাহহুদ পড়বে যাতে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত জীবিত থাকে এবং সুন্নতী পন্থায় আমল জারি থাকে।

◆ সালাত ও সালাম

এরপর নিঃশব্দে নবী করীম ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। এ ব্যাপারে অনেকগুলো সালাত ও সালাম হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা ২/৩টি উল্লেখ করছি। দরুদের সুসাব্যস্ত শব্দগুলোর মধ্য হতে যেমন–

١- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

১. "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

(বুখারী হাদীস নং ৬৩৬০ ও মুসলিম হাদীস নং ৪০৭)

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত নাযিল করুন, যেভাবে রহমত নাযিল করেছেন, ইবরাহীম এবং তাঁর পরিবারের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেভাবে বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (বুখারী, মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ – হে আল্লাহ! আপনি রহমত নাযিল করুন, عَلٰى مُحَمَّدٍ – মুহাম্মদের উপর, وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ – এবং মুহাম্মদের পরিবারবর্গের উপর, كَمَا صَلَّيْتَ – যেভাবে রহমত নাযিল করেছেন, عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ – ইবরাহীমের উপর, وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ – এবং ইবরাহীমের পরিবারের উপর, اِنَّكَ – নিশ্চয়ই আপনি, حَمِيْدٌ – প্রশংসিত, مَّجِيْدٌ – মহিমান্বিত, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ –

হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন, عَلٰى مُحَمَّدٍ – মুহম্মাদের উপর, وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ – এবং মুহাম্মদের পরিবার বর্গের উপর, كَمَا بَارَكْتَ – যেভাবে বরকত নাযিল করেছেন, عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ – ইবরাহীমের উপর, وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ – এবং ইবরাহীমের পরিবারের উপর, اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ – নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

২. অথবা বলবে–

٢. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, কামা বারকতা 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

কখনো এটা বলবে আর কখনো ওটা বলবে যাতে করে সকল প্রকার সুন্নাতের পুনর্জীবন ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির হেফাজত হয়।

এরপর যদি নামাজ তিন রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন : মাগরিবের নামাজ অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন : যোহর, আসর ও এশার নামাজ তাহলে প্রথম দু'রাকাতের পর প্রথম তাশাহহুদ পড়বে এবং যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সে দরূদও পাঠ করবে। অতঃপর তৃতীয় রাকাতের জন্য "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় দু'হাতে ভর করে উঠবে এবং তাকবীরের সাথে সাথে দু'হাত দুই কাঁধ বা কান বরাবর উত্তোলন করবে। আর হাতদ্বয় পূর্বের ন্যায় বুকের উপর বাঁধবে। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং রুকু ও সিজদা করবে

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মাগরিব নামাজের জন্য তৃতীয় রাকায়াতের পর শেষ তাশাহহুদের জন্য বসবে।

আর যদি নামাজ চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তাহলে চতুর্থ রাকাতের জন্য "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। আর জালসাতুল ইস্তারাহার জন্য বাম পায়ের উপর সোজা হয়ে বসবে যাতে করে প্রতিটি হাড় তার আপন স্থানে ফিরে যায়। এরপর দু'হাত জমিনের উপর ভর করে উঠে সোজা দাঁড়াবে। আর চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষের দু'রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তবে বিশেষ করে যোহরের নামাজে কখনো কখনো সূরা ফাতিহার সঙ্গে কিছু আয়াতও পাঠ করবে বা অন্য সূরা মিলাবে। আর কখনো শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করবে।

অতঃপর যোহর, আসর ও এশার নামাজের চতুর্থ রাকাত ও মাগরিবের তৃতীয় রাকাতের পর শেষ বৈঠকের জন্য নিচের যে কোন একটি 'তাওয়াররুক' পদ্ধতিতে বসবে।

১. ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছাবে এবং বাম পাটি ডান পায়ের উরু ও নলার নিচ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসবে। (বুখারী হাদীস-৮২৮)

২. বাম নিতম্ব জমিনে রাখবে এবং পাদ্বয় এক পার্শ্বে বের করে দিবে। আর বাম পাটি তার উরু ও নলার নিচে করবে।

(মুসলিম হাদীস নং ৫৭৯ ও আবূ দাউদ হাদীস নং ৭৩১)

সুন্নাতের অনুসরণ ও বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির পুনর্জীবনের জন্য কখনো এটা আর কখনো ওটা করবে।

অতঃপর পাঠ করবে পূর্বে উল্লেখিত তাশাহহুদ এবং এরপর নবীর প্রতি দরূদ পড়বে যেমনটি প্রথম তাশাহহুদে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু মিন 'আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযাবিল ক্ববর, ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহ্ইয়া ওয়ালমামাত্, ওয়ামিন শাররি ফিৎনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল।" (মুসলিম হাদীস নং ৫৮৮)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اِنِّىْ - নিশ্চয়ই আমি, اَعُوْذُ - আশ্রয় প্রার্থনা করছি, مِنْ - থেকে, عَذَابِ - শাস্তি, جَهَنَّمَ - জাহান্নামের, وَمِنْ - এবং থেকে,

عَذَابِ الْقَبْرِ - কবরের শাস্তি, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا - জীবনের ফিতনা, وَالْمَمَاتِ - মৃত্যুর, وَمِنْ شَرِّ - আর অনিষ্ট থেকে, فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ - মাসেহ দাজ্জালের ফেতনা।

এরপর নিচের দোয়াগুলোর পছন্দমত পড়বে। একবার এটি অন্যবার অপরটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

১. "আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরা, ওয়া লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন 'ইন্দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম।" (বুখারী হাদীস নং ৮৩৪ মুসলিম হাদীস নং ২৭০৮)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اِنِّىْ – নিশ্চয়ই আমি, ظَلَمْتُ – অন্যায় করছি, نَفْسِىْ – আমার নিজের উপর, ظُلْمًا كَثِيْرًا – অনেক অন্যায়, وَّلَا يَغْفِرُ – আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না, الذُّنُوْبَ – গুনাসমূহ, اِلَّا اَنْتَ – আপনি ছাড়া, فَاغْفِرْلِىْ – অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন, مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ – আপনার ক্ষমার গুণে, وَارْحَمْنِىْ – আর আমার উপর দয়া করুন, اِنَّكَ اَنْتَ – নিশ্চয়ই আপনি, الْغَفُوْرُ – অত্যন্ত ক্ষমাশীল, الرَّحِيْمُ – পরম দয়ালু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং তুমি নিজ ক্ষমা দ্বারা আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (বুখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

২. "আল্লাহুম্মা আইইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়াশুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিক্।"

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ! اَعِنِّىْ – আমাকে সাহায্য করুন, عَلٰى ذِكْرِكَ – আপনার স্মরণ করতে, وَشُكْرِكَ – আপনার শুকরিয়া আদায় করতে, وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ – এবং উত্তম ইবাদত করতে।

(হাদীসটি সহীহ, বুখারী তাঁর আদাবুল মুফরাদে হাদীস ৭৭১, আবূ দাউদ হাদীস নং ১৫২২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৩. "আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আউযুবিকা মিনালজুবনি, ওয়া 'আউযুবিকা আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুর, ওয়া আ'উযু বিকা মিন ফিৎনাতিদ দুন্ইয়া, ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযাবিল ক্বর্।"

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اِنِّىْ – নিশ্চয় আমি, اَعُوْذُبِكَ – আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, مِنَ الْجُبْنِ – কাপুরুষতা থেকে, وَاَعُوْذُ بِكَ – আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, اَنْ اُرَدَّ – পৌঁছানো থেকে, اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ – অপমানকর বৃদ্ধ বয়সে, وَاَعُوْذُ بِكَ – আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا – দুনিয়ার ফেতনা থেকে, وَاَعُوْذُ بِكَ – আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ – কবরের আযাব থেকে। (বুখারী হা: ২৮২২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

৪. আল্লা-হুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া আউযুবিকা মিন আযা-বিল ক্বর, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-ল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়ালমামা-ত, আল্লাহ-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরাম।

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ – হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি, اَعُوْذُ بِكَ – আপনার কাছে আশ্রয় চাই مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ – জাহান্নামের শাস্তি হতে, وَاَعُوْذُ بِكَ – আর আশ্রয় চাই, مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ – কবরের আযাব থেকে, وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ – আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে, وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ – আর আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা

হতে, وَأَعُوْذُ بِكَ – আর আশ্রয় চাই, مِنَ الْمَأْثَمِ – পাপ থেকে, وَالْمَغْرَمِ – এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি মাসীহে দাজ্জালের ফিতনা হতে, আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে, হে আল্লাহ! আমি তোমরা নিকট আশ্রয় চাচ্ছি পাপ ও ঋণ হতে।

(বুখারী, মুসলিম)

নবীর এ দু'আ শুনে একজন বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি ঋণ হতে এত বেশি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান কেন? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, মানুষ যখন ঋণী হয়, তখন সে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর ওয়াদা করলে রক্ষা করতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)

অত:পর সালাম ফিরানোর পূর্বে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

"আল্লাহুম্মাগফির লী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু, ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু, ওয়া মা আসরাফতু, ওয়া মা আন্তা আ'লামু বিহি মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিম, ওয়া আন্তাল মুয়াখখির, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।"(মুসলিম হাদীস নং-৭৭১)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اِغْفِرْلِيْ – আমাকে ক্ষমা দিন, مَاقَدَّمْتُ - যা আমি অগ্রগামী করেছি, وَمَا اَخَّرْتُ – এবং যা আমি পেছনে রেখে এসেছি, وَمَا اَسْرَرْتُ – এবং যা আমি গোপন করেছি, وَمَا اَعْلَنْتُ – এবং যা আমি প্রকাশ করেছি, وَمَا اَسْرَفْتُ – এবং যা আমি সীমা অতিক্রম করেছি, وَمَااَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ – আর আপনি আমার এ সকল ব্যাপারে, اَنْتَ الْمُقَدِّمُ – আপনি অগ্রগামী, وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ – আপনি পশ্চাতগামী, لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ – নেই কোন ইলাহ আপনি ছাড়া।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার আগের ও পরের গুনাহ, গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ, অপচয় এবং যা সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে সর্বাধিক জান সে-সকল গুনাহ ক্ষমা কর। তুমিই প্রথম এবং তুমি সর্বশেষ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

অত:পর স্বশব্দে প্রথমে ডান দিকে ফিরে বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

"আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্।"

শাব্দিক অর্থ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ – আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, وَرَحْمَةُ اللّٰهِ। – আল্লাহর অনুগ্রহে।

বলে এমনভাবে সালাম ফিরাবে যাতে করে ডান গালের সাদা অংশ দেখা যায়। অতপর আর বাম দিকে ফিরে বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

"আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্।"

শাব্দিক অর্থ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ – আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, وَرَحْمَةُ اللّٰهِ। – আল্লাহ অনুগ্রহ।

এমনভাবে সালাম ফিরাবে যাতে করে বাম গালের সাদা অংশ দেখা যায়।

(মুসলিম হাদীস নং ৫৮২ আবূ দাঊদ হাদীস নং ৯৯৬ , ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৯১৪)

কখনো প্রথম সালামে " وَبَرَكَاتُهُ ওয়া বারাকাতুহু" বর্ধিত করে ডান দিকে "আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহ" বলবে। আর বাম দিকে বলবে : "আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।"

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৯৯৭)

আর যখন ডান দিকে "আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্" বলবে তখন বাম দিকে শুধুমাত্র "আসসালামু 'আলাইকুম" বলেই শেষ করবে।

(হাদীসটি হাসান, নাসাঈ হাদীস নং ১৩২১)

◆ সালাতে নারী-পুরুষের পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই

(সালাতের পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের মাঝে সহীহ হাদীস দ্বারা কোন পার্থক্য প্রমাণিত নেই।)

নামাজে মহিলারা পুরুষের মতোই করবে; কারণ নবী করীম ﷺ-এর সাধারণ বাণী–

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ ـ

"তোমরা নামাজ আদায় কর যেমনটি আমাকে আদায় করতে দেখছ।"
(বুখারী হাদীস নং ৬৩১)

উপরে বর্ণিত নবী করীম ﷺ-এর সালাতের পদ্ধতি নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান। হাদীসে পুরুষদের সালাত থেকে মহিলাদের সালাতের কোন ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়নি। বরং তোমরা আমাকে যে পদ্ধতিতে সালাত পড়তে দেখ সে পদ্ধতিতে সালাত পড়'। নবী করীম ﷺ-এর এই হাদীস নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান। ইবরাহীম নাখঈ এই অভিমত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন : পুরুষরা সালাতে যা করে মহিলারাও তাই করবে। (ইবনে শায়বাহ সনদ সহীহ)

বোখারী আত্‌তারীখ আস্‌-সাগীর গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় সহীহ্ সনদ সহকারে প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী উম্মুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি সালাতে পুরুষের মতো বসতেন এবং তিনি ছিলেন ফকীহ।' অর্থাৎ ফিক্‌হ সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারিণী।

আবু দাউদ 'আল-মারাসীল' গ্রন্থে ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব থেকে বর্ণনা করছেন, সিজদায় মহিলারা পাঁজরের সাথে হাত মিলিয়ে রাখবে এবং এ ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের মতো নয়' এটি মুরসাল হাদীস এবং তা সহীহ নয়। (তাই এর উপর আমল না করা ভালো)

ইমাম আহমদ মাসায়েল গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় ইবনে উমর থেকে নিজ স্ত্রীদের এক পায়ের উপর অন্য পা আড়াআড়ি করে বসার আদেশসূচক যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন সেটির সনদ সহীহ নয়। কেননা, ঐ সনদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরী নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। তাই এর উপরও আমল করা ঠিক নয়।

◆ সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদির দিকে ফিরে বসার পদ্ধতি

ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদির দিকে ডান পার্শ্ব হয়ে ফিরে বসবে। আর কখনো বাম পার্শ্ব হয়ে ফিরবে। এগুলো সবই সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَمَا يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সালাম ফিরানোর পর "আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম, ওয়া মিনকাসসালাাম, তাবারক্তা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম" পড়ার পরিমাণ সময় ছাড়া বেশি বসতেন না।"

(মুসলিম হাদীস নং ৫৯২)

عَنْ هُلْبٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلٰى جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا عَلٰى يَمِيْنِهِ. وَعَلٰى شِمَالِهِ.

২. হুলব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন এবং তাঁর দুই পার্শ্ব ডান ও বাম দিয়েই ফিরতেন।

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ১০৪১, তিরমিযী হাদীস নং ৩০১)

কখনো এটা আমল করবে আর কখনো ওটা দ্বারা করবে যাতে করে সুন্নাত পুনর্জীবন লাভ করে এবং শরিয়ত সম্মত বিভিন্ন প্রকারের আমল সম্পাদন হয়।

◆ জামায়াতের সালাত আদায়ের পর ইমাম সাহেব উপস্থিত মুক্তাদীগণসহ যে মুনাজাত করে থাকেন তার শরঈ বিধান।

হাদীসে আছে- ১. اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ। দোয়াই ইবাদত। (আবু দাউদ হাদীস-১৪৭৯ সহীহ)

২. اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ 'দোয়া ইবাদতের নির্যাস। (তিরমিযী হাদীস-৩৩৭১ দুর্বল)

সহীহ হাদীসে এ কথারও উল্লেখ আছে যে, ফরজ সালাতের পর দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করে থাকেন। (আবু দাউদ হাদীস-১৪৮৮ সহীহ)

দোয়া করার ফযীলত ও গুরুত্ব আছে বলেই আল্লাহর রাসূল দোয়া করার তাকিদ দিয়েছেন এবং কখন কিভাবে কেমন করে দোয়া করতে হবে তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। সালাতে পঠিত তাশাহুদ, দরূদ, এমনকি সূরায়ে ফাতিহা যার পঠন ব্যতিরেকে সালাত সহীহ হয় না এগুলো মূলত দোয়া। উপরে সালাতে এবং পরে ফরজ সালাতের পর পঠিত দোয়া ও তাসবীহসমূহের একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায়, নবী আলাইহিস সালাম সালাতে তাশাহুদের এবং দরূদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে ১৬ ধরনের দোয়া পড়তেন।

হাদীসে আরো আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের ৭ স্থানে দোয়া করতেন। স্থানগুলো হলো-

১. তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর।

২. বিতর সালাতের ৩য় রাকায়াতে রুকুতে যাওয়ার আগে আবার কখনো রুকু করার পর দোয়ায়ে কুনূত পড়তেন। কখনো ফজর সালাতে এ দোয়া পড়তেন।

৩. রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে।

৪. রুকুতেও দোয়া পড়ার দলীল আছে।

৫. সাজদারত অবস্থায়। এ সময় তিনি অধিক পরিমাণ দোয়া করতেন।

৬. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে।

৭. তাশাহুদের পর সালামের পূর্বে।

হাদীসের আলোকে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের মধ্যেই সব ধরনের দোয়া করেছেন এবং সালাতের ভিতরই দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরায়ে তিনি যা পড়তেন এবং পড়ার জন্যে বলেছেন সেগুলো হলো তাসবীহ।

পাক-ভারত, উপমহাদেশে সালাম ফিরানোর পর কিবলার দিকে মুখ করে এবং ফজর ও আসরের সময় মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরায়ে দু'হাত উঠিয়ে আরবি, উর্দু, ফারসি ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ছন্দে যে ধরনের দোয়া বা মুনাজাত করার প্রথা চালু আছে তার কোনো প্রমাণ নেই। সহীহ্ বা হাসান হাদীসের কোনো সূত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাহাবা, তাবেঈন, তাবে' তাবেঈন এমনকি বর্তমান যুগেও অন্য কোনো দেশে এ প্রথার প্রচলন নেই। কাজেই এ জাতীয় প্রমাণহীন কাজ কখনো স্বীকৃত হতে পারে না।

সালাতের ভিতরই দোয়া করার তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেছেন—

'তাকবীরে তাহরীমা' অর্থাৎ সালাতের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত (তাসলীম) গোটা সময়টুকুই মূলত আল্লাহর সাথে 'মুনাজাত' আলাপ-আলোচনা সম্পর্ক নিবিড় ভাবে স্থাপন হয়। সালাম ফিরানোর পর এ গোপন সম্পর্কের (মুনাজাত) ধারা ছিন্ন হয়ে যায়। কাজেই গোপন ও নিবিড় সম্পর্ক অব্যাহত থাকা অবস্থায় চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা, আবেদন-নিবেদন করার মোক্ষম ও যথার্থ সময় হওয়া সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই আমাদের নবী সালাতের ভিতরেই দোয়া করেছেন এবং দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। সালাতের ভিতর দোয়া করার

তাৎপর্য এটাই। রাসূলের শিখানো পদ্ধতিতে মুনাজাত বা দোয়া করা উচিত। বস্তুত এ পদ্ধতিই সুন্নাত ও উত্তম পন্থা। সুন্নাতের খেলাফ পন্থা কখনো অনুসরণ করা যাবে না। বরং যতো তাড়াতাড়ি এ প্রথা বর্জন করা যায় ততোবেশি মঙ্গল।

জামায়াত শেষ নামাযান্তে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে সুন্নাতের খেলাফ মুনাজাত করার ফলে যে ধারণা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয় তা শরীয়ত সমর্থিত নয়। যেমন মুক্তাদীগণ মনে করেন–

ক. মুনাজাত করা সালাতের অঙ্গ। মুনাজাতের জন্যে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করা বা দীর্ঘ মুনাজাতে মুক্তাদীগণের আত্মতৃপ্ত হওয়া এর প্রমাণ।

খ. এরূপ মুনাজাত করা সুন্নাত।

গ. বিশেষত– ফজর ও আসরের পর মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরানোর ফলে মুনাজাত করা বাধ্যতামূলক ধারণা করা।

ঘ. কোনো কোনো ইমাম সাহেব এরূপে মুনাজাত করেন মুক্তাদীগণের মন রক্ষার্থে।

ঙ. কখনো তিনি এরূপ দোয়া করেন নিজেকে মুক্তাদীগণের কাছে বুজর্গ বা বাগ্মীশ কিংবা জ্ঞানীগুণীরূপে প্রকাশার্থে। এ জাতীয় ধারণা নিজের অজান্তেই মন মানসিকতায় সূক্ষ্মভাবে স্থান করে নেয়।

সালাতের দোয়া রাসূলের পদ্ধতিতেই করতে হবে। সালাতের দোয়া এবং সাধারণভাবে সালাতের বাইরের দোয়ার সাথে যুক্ত করা উচিত নয়।

মুনাজাত বা দোয়া যে কোনো সময় যে কেউ আল্লাহর সমীপে করতে পারে। যে কোনো বিষয়ে মুনাজাত করার আগে তাহমীদ, তাহলীল, তাসবীহ্, তাকবীর বলা উচিত। তারপর নবীর শিখানো জিকির এবং সালাত (দরুদ) পাঠের পর মনের গহীন কোণে আল্লাহর ভীতি ও আল্লাহর প্রীতির এক নিবিড় ও গোপন সম্পর্ক স্থাপন করার পর কাঙ্খিত বস্তুর জন্য দোয়া করা। এভাবে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন।

এখানে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমাদের নবীকে সর্ব বিষয়ে অনুসরণ করা কর্তব্য। তিনি মুনাজাতে দুহাত বুক পর্যন্ত তুলে দুহাতের আংগুল মিলিয়ে প্রসারিত করে আকুতি সহকারে কিছু চাওয়া পাওয়ার একটি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। দু'হাত দিয়ে চেহারা মুবারক মুছে তিনি মুনাজাত শেষ করেছেন এমনটি করার হাদীস ভিত্তিক কোনো প্রমাণ নেই।

৯. ফরয সালাতের পর মাসনূন দোয়াসমূহ

সহীহ্ হাদীসের আলোকে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর যে সকল দোয়া পড়তে হয়–

১. সালাত শেষান্তে সালাম ফিরানোর পর বলবে ১ বার – اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ্ অতি বড়।

(বুখারী–১১৬ পৃ., মুসলিম–২১৭ পৃ., আবূ দাঊদ ১৪৪ পৃ., নাসায়ী ১৫৯ পৃ.)

২. তারপর পড়বে ৩ বার– اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম-২১৮ পৃ., আবূ দাঊদ ২১২+২১৩ পৃ. নাসায়ী-১৫০ পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিযী ৬৬ পৃ.)

৪. তারপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اَنْتَ السَّلَامُ – আপনি শান্তিদাতা, وَمِنْكَ السَّلَامُ – এবং আপনার থেকে শান্তি আসে, تَبَارَكْتَ – আপনি বরকতময়, يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - – আপনি মহত্বের অধিকারী ও মহাসম্মানী।

হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, আর আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, আপনি মহত্ত্বের অধিকারী এবং মহা সম্মানী।

(আবূ দাঊদ-১২১ পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিযী-৬৬ পৃ., নাসায়ী-১৫০ পৃ.)

৫. অতঃপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ – হে আল্লাহ আপনি আমাকে সাহায্য করুন, عَلٰى ذِكْرِكَ – আপনার স্মরণ করতে, وَشُكْرِكَ – আপনার শুকরিয়া আদায় করতে, وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ – এবং আপনার উত্তম ইবাদত করতে। (আবূ দাঊদ-২১৩ পৃ.)

হে আল্লাহ! আপনার জিকির, আপনার শুকরিয়া আদায় এবং উত্তম ইবাদতের জন্য আমাকে সাহায্য করুন।

৩. অতঃপর পড়বে–

لَا اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَحْـدَهٗ لَا شَرِيْـكَ لَـهٗ لَـهُ الْـمُـلْكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ وَهُـوَ عَلٰـى كُـلِّ شَـيْـئٍ قَدِيْـرٌ اَللّٰـهُـمَّ لَا مَانِـعَ لِـمَا اَعْـطَيْـتَ وَلَا مُـعْـطِـىَ لِـمَا مَنَـعْـتَ وَلَا يَـنْـفَـعُ ذَا الْـجَدِّ مِـنْـكَ الْـجَدُّ ـ

শাব্দিক অর্থ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, وَحْدَهٗ – তিনি একক, لَا شَرِيْكَ لَهٗ – তার কোন শরিক নেই, لَهُ الْمُلْكُ – তার জন্যই সকল রাজত্ব, وَلَهُ الْحَمْدُ – এবং কেবল তারই জন্য সকল প্রশংসা, وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ – আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! لَا مَانِعَ – কেউ বারণ করতে পারে না, لِمَا اَعْطَيْتَ – যাকে আপনি দান করেছেন, وَلَا مُعْطِىَ – আর কেউ দিতে পারে না, لِمَا مَنَعْتَ – যাকে আপনি বারণ করেছেন, وَلَا يَنْفَعُ – আর উপকার করতে পারবে না, ذَا الْجَدِّ - মর্যাদাবানকে, مِنْكَ الْجَدُّ – আপনি ছাড়া কোন মর্যাদা।

আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক তার কোন শরীক নেই, সমুদয় প্রশংসা তারই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দিয়েছেন তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই আর আপনি যা প্রতিরোধ করেন তা ফিরিয়ে দেয়ার কেউ নেই। আপনি ছাড়া কোন মর্যাদা মর্যাদাবানকে উপকার করতে পারে না। [বুখারী–১১৬ পৃ., মুসলিম-২১৮ পৃ., আবূ দাঊদ-২১১ পৃ., তিরমিযী-৬ পৃ. নাসায়ী-১৫০ পৃ.]

৬. অতঃপর পড়বে–

لَاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَاَ شَرِيْـكَ لَهٗ لَـهُ الْـمُـلْـكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ وَهُـوَ عَلٰـى كُـلِّ شَـيْـئٍ قَدِيْـرٌ لَاَ حَـوْلَ وَلَاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِا للّٰـهِ لَاَ نَـعْـبُـدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَـهُ النِّـعْـمَـةُ وَلَـهُ الْـفَـضْـلُ وَلَـهُ الـثَّـنَـاءُ الْـحَـسَـنُ لَاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ مُـخْـلِـصِـيْـنَ لَـهُ الـدِّيْـنُ وَ لَـوْكَـرِهَ الْـكَافِـرُوْنَ ـ

শাব্দিক অর্থ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, وَحْدَهٗ – তিনি একক, لَا شَرِيْكَ لَهٗ – তার কোন শরিক নেই, لَهُ الْمُلْكُ – তার জন্যই সকল রাজত্ব, وَلَهُ الْحَمْدُ – এবং কেবল তারই জন্য সকল প্রশংসা, وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ – আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ – নেই কোনো শক্তি ও সামর্থ, اِلَّا بِاللّٰهِ – আল্লাহ ব্যতীত, لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ – আমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, لَهُ النِّعْمَةُ – সকল নিয়ামত একমাত্র তাঁরই, وَلَهُ الْفَضْلُ – এবং অনুগ্রহ কেবল তাঁরই, وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ – এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ – দ্বীন একমাত্র তাঁরই জন্য, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ – যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই এবং তার জন্যই সকল রাজত্ব। তার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমরা শুধুমাত্র তারই ইবাদত করি। সকল নিয়ামত একমাত্র তারই, সকল অনুগ্রহ তারই এবং উত্তম প্রশংসা তারই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, দ্বীন একমাত্র তারই জন্য। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

[নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২১১ পৃ.]

৭. অতঃপর পড়বে–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

শাব্দিক অর্থ : سُبْحَانَكَ – আমি আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! وَبِحَمْدِكَ – এবং আপনার প্রশংসা, وَاَسْتَغْفِرُكَ – এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ – এবং আপনার নিকট তওবা করছি।

হে আল্লাহ! আমি আপনার তাসবীহ বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর আপনারই নিকট তাওবা করছি। [নাসায়ী ১৫১ পৃঃ]

৮. অতঃপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ

وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِغْفِرْلِىْ – আমাকে ক্ষমা করে দিন, مَاقَدَّمْتُ - যা আমি অগ্রগামী করেছি, وَمَا اَخَّرْتُ – এবং যা আমি পেছনে রেখে এসেছি, وَمَا اَسْرَرْتُ – এবং যা আমি গোপন করেছি, وَمَا اَعْلَنْتُ – এবং যা আমি প্রকাশ করেছি, وَمَا اَسْرَفْتُ – এবং যা আমি সীমা অতিক্রম করেছি, وَمَااَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ – আর আপনি আমার এ সকল ব্যাপারে, اَنْتَ الْمُقَدِّمُ – আপনি অগ্রগামী, وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ – আপনি পশ্চাতগামী, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ – নেই কোন ইলাহ্ আপনি ছাড়া।

হে আল্লাহ! আমার পূর্বের ও পরের গুনাহ্, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সর্বপ্রকার পাপ মাফ করুন, এ ছাড়া আমার পাপ সম্পর্কে আপনি অধিক অবহিত। আপনিই প্রথম ও আপনিই শেষ, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। [আবু দাউদ-২১২ পৃ.]

৯. অতঃপর পড়বে– সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একবার করে।

[নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২০৬ পৃ.]

১০. অতঃপর পড়বে– আয়াতুল কুরসী ১ আয়াত মতান্তরে ২ আয়াত, মতান্তরে ৩ আয়াত। [মেশকাত-১৮৫ পৃ., নাসায়ী]

১১. ডান হাতের আঙুলি দ্বারা তাসবীহ পড়া– সুবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, অতঃপর বলবে–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

শাব্দিক অর্থ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ – নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ ছাড়া, وَحْدَهٗ – তিনি একক, لاَ شَرِيْكَ لَهٗ – তার কোন শরিক নেই, لَهُ الْمُلْكُ – তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব, وَلَهُ الْحَمْدُ – এবং কেবল তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ – আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।

[আবু দাউদ-২১১ পৃ, তিরমিযী-৯৪, নাসায়ী-১৫২ পৃ., মুসলিম-২১৯ পৃ.]

◆ **ফজরের সালাতের পর যা পড়বে**

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ يُسَلِّمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِنِّىْ – নিশ্চয়ই আমি, اَسْاَلُكَ – আমি আপনার প্রার্থনা করি, عِلْمًا نَافِعًا – উপকারী জ্ঞান, وَرِزْقًا طَيِّبًا – এবং হালাল রিযিক, وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا – গ্রহণযোগ্য আমল।

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজের সালাম ফিরানোর পর বলতেন : "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না–ফি'আ, ওয়া রিজকান ত্বইয়িবা, ওয়া 'আমালান মুতাকাব্বালা।"

হাদীসটি সহীহ, আহমদ হাদীস নং ২৭০৫৬, ইনবে মাজাহ হাদীস নং ৯২৫)

এরপর নবী করীম ﷺ বলেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ ـ وَمِنْكَ السَّلاَمُ ـ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

"আল্লাহ-হুম্মা আনতাস্ সালা-ম, ওয়ামিনকাস্ সালা-ম, তাবা-রাকতা ইয়া-যাল্‌যালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।"

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। হে সম্মান ও মহত্বের অধিকারী! আপনি বরকতময়। (মুসলিম, মিশকাত)

মু'আজ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'আজ! আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি। তখন মু'আজ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও আপনাকে ভালোবাসি। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আটি ছেড়ে দিও না।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা-যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়াহুসনি 'ইবা-দাতিকা ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র করা, শুকরিয়া আদায় করা ও উত্তম ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য কর। (আহমদ, আবু দাউদ)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمٰعِيْلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً .

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যারা আল্লাহর জিকির করে তাদের সঙ্গে বসে থাকা আমার নিকট ইসমাঈল (আ)-এর পরিবারে ৪জন গোলাম আজাদের চেয়েও প্রিয়। আর আসরের নামাজের পর থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত যারা আল্লাহর যিকির করে তাদের সঙ্গে বসে থাকা আমার নিকট ৪জন গোলাম আজাদের চেয়েও প্রিয়।"

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ৩৬৬৭, সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাদীস নং ২৯১৬)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِىْ مُصَلَّاهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا .

২. জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজ আদায় করে ভালোভাবে সূর্য না উঠা পর্যন্ত তাঁর নামাজের স্থানে বসে থাকতেন।

(মুসলিম হাদীস নং ৬৭০)

◆ জিকির ও দোয়ার স্থান

১. নফল সালাতের পর দোয়া করা শরিয়ত সম্মত নয় এবং এর কোন ভিত্তিও নেই। আর যে দোয়া করতে চায় সে ফরজ বা নফল সালাতের ভিতরে বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে দোয়া করবে। আর যদি কখনো কোন কারণবশত: ফরজ সালাতের পর (একাকী) দোয়া করতে চায় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

২. যেসব 'দুবুরুস সালাত' তথা সালাতের শেষাংশে বলে বর্ণিত হয়েছে যদি দোয়া হয় তাহলে সেগুলো সালাম ফিরানোর পূর্বে বৈঠকে। আর যদি জিকির হয় তাহলে সালামের পরে।

◆ সালাতের কিছু বিধান

সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার বিধান : নামাজে মুসল্লীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদি কিংবা একাকী হোক। আর চাই নামাজের কেরাত স্বশব্দে হোক বা নিরবে হোক। নামাজ ফরজ হোক বা নফল হোক। আর সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা ফরজ। এর থেকে মাসবূক (যে ব্যক্তির নামাজের কিছু অংশ ছুটে যায় তাকে মাসবূক বলে) যদি ইমাম সাহেবকে রুকু অবস্থায় পায় এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করতে না পারে তবে সে ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। যে নামাজে ও রাকআতে ইমামের কেরাত উচ্চ স্বরে আদায় করতে হয় সে সকল নামাজে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করাটাই উত্তম। (সকল মাজহাবের মুহাক্কিক বিদ্বানগণের মত হলো সর্বাবস্থায় মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়তে জানে না সে কুরআন থেকে যা তার জন্য সহজ সাধ্য তা তেলাওয়াত করবে। আর যদি কুরআনের কিছুই না জানে তবে বলবে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

"সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্‌।"

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ৮৩২, নাসাঈ হাদীস নং ৯২৪)

যখন মুসল্লীর নামাজের প্রথমাংশের কিছু ছুটে যায় তখন মুক্তাদি ইমাম সাহেবের সাথে যেখান হতে অংশ গ্রহণ করে সেখান থেকেই তার শুরু। আর সালামের পরে যা তার ছুটে গেছে তা পূরণ করে নিবে।

◆ নামাজরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হলে করণীয়

যদি নামাজরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হয়ে যায় অথবা মনে পড়ে যে তার ওযু নেই, তাহলে সে তার অন্তর ও শরীরসহ নামাজ হতে বের হয়ে যাবে। তার ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর কোন প্রয়োজন নেই।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَاَحْدَثَ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى اَنْفِهٖ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ۔

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : "যখন তোমাদের কারো নামাজরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হয়ে যায় তখন সে যেন তার নাক ধরে তারপর বের হয়ে যায়।"

◆ সালাতে মুসলিম ব্যক্তি যা করবে

১. সুন্নাত হলো মুসল্লী এক রাকাতে পূর্ণ একটি সূরা তেলাওয়াত করবে এবং কুরআনের তারতীবে সূরাগুলো পাঠ করবে। আর তার জন্য একটি সূরাকে দু'রাকাতে ভাগ করে তেলাওয়াত করা জায়েয। এক রাকাতে একাধিক সূরা পাঠ করাও জায়েয আছে। আবার একটি সূরা দু'রাকাতে পাঠ করাও জায়েয। কুরআনের তারতীবে পরের সূরা আগে ও আগের সূরা পরে তেলাওয়াত করাও জায়েজ আছে। তবে ইহা মাঝে মধ্যে করবে বেশি বেশি করবে না।

২. মুসল্লীর জন্য ফরজ ও নফল সালাতে সূরার প্রথমাংশ বা শেষাংশ কিংবা মধ্যমাংশ থেকে তেলাওয়াত করা জায়েয। তবে সূরার প্রথম অংশ পাঠ করা উত্তম এ জন্য যে নবী (সা)-এর অধিকাংশ কিরাআত সূরার প্রথম থেকে হত।

◆ মুসল্লীর জন্য নামাজে চারটি সেকতা (নিরবতা) রয়েছে

প্রথমটি : সানা ও কিরাআতের মাঝে অর্থাৎ সানার শেষে কিরাআত আরম্ভ করার পূর্বে।

দ্বিতীয়টি : সূরা ফাতিহার শেষে ও আমিন বলার পূর্বে। আমিন শব্দটি সূরার শেষ অংশের সাথে মিলিয়ে পড়া ঠিক নয়। কেননা যে আমিন শব্দটি কুরআনের শব্দ নয়ং বরং সেটি হাদীসের শব্দ। সুতরাং সূরা ফাতিহা শেষ করার পরে সেকতা নিয়ে তারপর আমিন বলবে।

তৃতীয়টি : আমিন বলার পরে ও অন্য সূরা আরম্ভ করার পূর্বে চতুর্থটি কিরাত শেষে এবং রুকুতে যাওয়ার পূর্বে।

ইস্তিফতা বা ছানার দোয়াগুলো তিন প্রকার–

১. সবচেয়ে উত্তম যার মাঝে আল্লাহর প্রশংসা আছে। যেমন : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা----। [হাদীসটি সহীহ , আবূ দাউদ হাদীস নং ১১১৪, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১২২২ শব্দ তারই।]

২. এর পরে যার মধ্যে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর ইবাদতের খবর রয়েছে। যেমন : ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া----।

৩. এর পরে যার মধ্যে বান্দার দোয়া রয়েছে। যেমন : আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী----।

◆ সালাত দেরী করার বিধান

কোন কারণ ছাড়া ফরজ নামাজ তার নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী করা হারাম। তবে কোন কারণে যেমন : যার (মুসাফির বা রোগীর--) জন্য একত্রে দু'ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা জায়েয বা প্রচণ্ড শীত কিংবা ভয় অথবা রোগ ইত্যাদি।

◆ মুসল্লি যা থেকে বিরত থাকবেন

মুসল্লীর জন্য এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিষেধ। তবে প্রয়োজনে যেমন ভয় ইত্যাদি কারণে জায়েয।

ক. দুই চোখ বন্ধ করা ও মুখমণ্ডল ঢাকা।

খ. কুকুরের মতো ইক'আ করে বসা। (দুই পা দুই পার্শ্বে দিয়ে দুই নিতম্বের উপরে বসা)

গ. অপ্রয়োজনে নড়াচড়া ও অনর্থক কাজ করা।

ঘ. কোমরে হাত রাখা।

ঙ. যা ভুলিয়ে দেয় এমন জিনিসের দিকে দেখা।

চ. সিজদারত অবস্থায় দুই হাত বিছিয়ে দেয়া।

ছ. পেশাব বা পায়খানা কিংবা বায়ু আটকিয়ে রাখা।

জ. খানা হাজির, ক্ষুধাও রয়েছে ও খাওয়ার সুযোগ আছে তাহলে প্রথমে আহার করবে নামাজ আদায় করা।

ঝ. লুঙ্গি বা পায়জামা কিংবা প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রেখে নামাজ আদায় করা।

ঞ. মুখমণ্ডল বা নাক ঢেকে রাখা। অনুরূপ চুল বা কাপড় জমা করে রাখা।

ট. নামাজে হাই উঠানো।

ঠ. মসজিদে থুথু ফেলা যা পাপের কাজ। এর কাফফারা হলো তা ঢেকে দেয়া।

ঢ. নামাজরত অবস্থায় কিবলার দিকে থুথু ফেলা। নামাজের বাইরেও ইহা নাজায়েয।

ড. পেশাব ও পায়খানা এবং বায়ু আটককারীদের জন্য ওয়াজিব হলো ওযু নষ্ট করে নতুন করে ওযু করে নামাজ আদায় করা। আর যদি পানি না পায় তবে ওযু নষ্ট করে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে। এটাই তার নামাজে খুশু 'খুযুর জন্য উপযুক্ত পন্থা।

◆ সালাতে এদিক-ওদিক দেখার বিধান

বান্দার নামাজে এদিক-ওদিক দেখা শয়তানের পক্ষ থেকে দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া। এদিক-ওদিক দেখা দুই প্রকার : শারীরিকভাবে যা অনুভবযোগ্য আর আন্তরিকভাবে যা দেখা যায় না। অন্তরের দৃষ্টি নিক্ষেপের চিকিৎসা হলো বাম দিকে তিন বার থুথুর ছিটা ফেলা ও বিতাড়িত শয়তান থেকে "আ'উযু বিল্লাহিমিনাশ শয়ত্ব–নির রজীম" পড়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া। আর শারীরিক নড়াচড়ার চিকিৎসা হলো একমাত্র সরাসরি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো। মুসল্লীর জন্য নামাজ অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও হারাম।

◆ নামাজের সময় সুতরা সামনে করে নেয়ার বিধান

ইমাম ও একাকী নামাজির জন্য সামনে সুতরা করে তার পিছনে নামাজ আদায় করা সুন্নাত। যেমন : দেওয়াল বা খুঁটি কিংবা পাথর বা লাঠি অথবা বল্লম ইত্যাদি। চাই নামাজী পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। বাড়িতে হোক বা সফর অবস্থায় হোক। ফরজ নামাজ হোক বা নফল হোক। আর মুক্তাদির সুতরা ইমামের সুতরা বা ইমাম সাহেবই মুক্তাদির সুতরা।

◆ নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান

১. মুসল্লী ও তার সুতরার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। নামাজির করণীয় হলো অতিক্রমকারীকে বাঁধা প্রদান করা। চাই তা মক্কায় হোক বা মদিনায় কিংবা অন্যান্য স্থানে হোক। যথাযথভাবে বাঁধা দেওয়ার পরেও যদি অতিক্রম করে তবে পাপ অতিক্রমকারীর ওপর এবং তাতে নামাজের কোন সওয়াব কম হবে না।

২. যদি ইমাম ও একাকী ব্যক্তির সামনে সুতরা না থাকে আর নামাজের সামনে দিয়ে মহিলা বা গাধা কিংবা কালো কুকুর অতিক্রম করে তাহলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এগুলোর কোন একটি মুক্তাদির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তবে তার ও ইমাম কারো নামাজ বাতিল হবে না। আর যে সুতরা সামনে রেখে নামাজ আদায় করে সে যেন সুতরার নিকটবর্তী হয়ে নামাজ আদায় করে, যাতে করে তার ও সুতরার মাঝে শয়তান অতিক্রম করতে না পারে।

◆ নামাজে দুই হাত উত্তোলনের স্থানসমূহ

عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِفْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِى الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا

حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে নামাজ তাকবীর দ্বারা আরম্ভ করতে দেখেছি। তিনি তাকবীর দেয়ার সময় দু'হাত তাঁর কাঁধ বরারব উত্তোলন করেছেন। আর যখন রুকুর জন্য তকবির দিয়েছেন তখনো অনুরূপ (দু'হাত উত্তোলন) করেন। আর যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন তখনও অনুরূপ (দু'হাত উত্তোলন) করেন এবং বলেন : "রব্বানা-ওয়ালাকাল হামদ্।" (বুখারী হাদীস-৭৩৮, শব্দ তারই মুসলিম হাদীস-৩৯০)

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رضى) كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْدِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ اِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

২. নাফে' থেকে বর্ণিত ইবনে উমর (রা) যখন নামাজে প্রবেশ করতেন তখন তাকবীর দিতেন ও দুই হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকু করতেন তখনো তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন সামি'আল্লা লিমান হামিদাহ্ বলতেন তখন দু'হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন প্রথম দু'রাকাতের পর বৈঠক করে দাঁড়াতেন তখনো দু'হাত উত্তোলন করতেন। ইবনে উমর ইহা নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী হাদীস নং ৭৩৯)

◆ নামাজরত অবস্থায় মুসল্লীর জন্য যা জায়েয

১. প্রয়োজনে নামাজরত অবস্থায় পাগড়ি বা গুতরা (মাথার বড় রুমাল) পেঁচানো, গায়ে চাদর পরা, আবা বা মাথার বড় রুমাল ধরা, আগানো ও পিছানো, মেম্বারে উঠা ও নামা, মসজিদের বাইরে হলে থুথু ডানে ও সামনে না ফেলে বাম দিকে ফেলা, মসজিদ হলে কাপড়ে (হাত রুমালে বা টিসুতে) ফেলা, সাপ ও বিচ্ছু ইত্যাদি হত্যা করা, ছোট শিশু ইত্যাদিকে উঠিয়ে নেয়া।

২. কোন ওজর যেমন প্রচণ্ড গরম ইত্যাদি থাকলে মুসল্লী তার কাপড়ে বা পাগড়িতে কিংবা মাথার রুমালের উপর সিজদা করতে পারবে।

- একাকী নামাজি যখন জোরে কেরাত পড়বে তখন 'আ-মীন' স্বশব্দে বলবে। আর যখন নিঃশব্দে কেরাত করবে তখন নি:শব্দে 'আ-মীন' বলবে।

◆ একাকী নামাজির জন্য স্বশব্দে কেরাতের বিধান

একাকী নামাজি চাই পুরুষ হোক বা মহিলা স্বশব্দে কেরাতের নামাজে কেরাত জোরে করা না করা তার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু যদি স্বশব্দে কেরাত পড়ার কারো কষ্ট হয় যেমন : ঘুমন্ত ও রোগী ইত্যাদি ব্যক্তি তাহলে আস্তে কেরাত পড়বে। অনুরূপ যদি মহিলা নামাজি গাইর মাহরাম পুরুষের (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয এমন) উপস্থিতিতে হয় তাহলে নাজায়েয।।

১০. সাহু সিজদা

'সাহু' (سَهْوٌ) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ভুলে যাওয়া কিংবা ভুল করা। ভুলক্রমে সালাতের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে এবং তা সময়ের মধ্যে পূরণ করতে না পারলে সংশোধনের জন্যে অতিরিক্ত সিজদা দেয়ার নাম শরীয়াতের পরিভাষায় 'সাহু সিজদা'।

'সাহু সিজদা' দেয়া স্থান, কাল, পাত্রভেদে ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুবাহ হয়ে থাকে। ৩টি কারণে সাহু সিজদা দিতে হয়–

ক. সালাতের কোনো অংশ বা হুকুম বাড়ালে, খ. কমালে এবং গ. সন্দেহ হলে। [মুসলিম শরীফে ইবনে মাসউদের (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

فَاِذَا زَادَ الرَّجُلُ اَوْ نَقَصَ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ـ

কোন ব্যক্তি সালাতে কম-বেশি করলে দুটি সিজদা দেয়া উচিত।]

সালাতে বহির্ভুত কথা সংযোজন করলে সাহু সিজদা দেয়া সুন্নাত। সালাতের সুন্নাত জাতীয় কোনো কাজ অনিচ্ছায় পরিত্যক্ত হলে সাহু সিজদা দেয়া মুবাহ এবং রুকু, কিয়াম, দরূদ জাতীয় ওয়াজিব কাজ ভুলক্রমে বাদ পড়লে সাহু সাজদা দেয়া ওয়াজিব। [মুসলিম]

সালাতে ভুল হওয়া প্রসংগে নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। তোমাদের মতো আমারও ভুল হয়। কাজেই কোথাও আমার ভুল হলে গেলে সেটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। [বুখারী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘটনাক্রমে সালাতে ভুল হওয়া মূলত: গোটা মুসলিম জাতির জন্যে একটি রহমত ও করুণা বৈ কি? কারণ এরূপ ভুল হওয়ার কারণেই উম্মতগণ তাদের ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়া জানতে সক্ষম হয়। আর এভাবেই ইসলামের বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

◆ সাহু সিজদার নিয়ম

সালাতের ভুল সংশোধনের জন্যে সিজদা করতে হয়। তবে সিজদা করার সময় নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে।

১. ইমাম শাফেয়ীর মতে শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করতে হবে।

২. ইমাম আবু হানীফার মতে তাশাহুদের পর শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা বিধেয়।

৩. ইমাম মালেক (রা)-এর মতে সালাতে কোনো কিছু কম করার ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে এবং কোনো কিছু বেশি করার ক্ষেত্রে সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করতে হবে। আর উভয় ধরনের ভুল হয়ে গেলে সালামের পূর্বে সিজদা করতে হবে। কেউ এরূপ না করলে তিনি তাতে বারণ করতেন না। কেননা, এ বিষয়ে মতপার্থক্য করার অবকাশ আছে।

৪. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা), ইমাম মালেকের (রা) মতের কাছাকাছি মত পোষণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : ক্ষেত্র বিশেষে সালামের পূর্বে আবার কখনো সালামের পরে সাহু সিজদা করা বিধেয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের পূর্বে ও পরে সাহু সিজদা করতেন বলে প্রমাণ আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে সালাতে যে সব ভুল হয়েছিল সেগুলোর ধরন নিম্নরূপ–

১. যোহর, আসর কিংবা ইশার ৪ রাকায়াতের স্থলে দুরাকায়াত পড়ার পর ভুলক্রমে সালাম ফিরায়ে সালাত শেষ করেন। সালাম কিরানোর পর কিছু কথাবার্তা বলার পর স্মরণ হওয়া কিংবা স্মরণ করানোর পর অবশিষ্ট দু'রাকায়াত আদায়ের পর সালাম ফিরলেন অতপর তাকবীরসহ দুটি সাহু সিজদা করেন।

২. আবু দাউদ ও তিরমিযীতে আছে, তিনি সাহাবীগণের ইমাম হয়ে সালাত পড়ানোর সময় ভুল হয়ে যায়। সালাতরত অবস্থায় ভুলের কথা স্মরণ হলে

তিনি দুটি সিজদা করেন। তারপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরান। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও গরীব বলেছেন।

৩. বুখারী ও মুসলিমে আছে, একদিন যুহরের সালাত ৫ রাকায়াত পড়ালেন। সাহাবাগণ জানতে চাইলেন, যুহরের সালাত ৫ রাকায়াত হলো কিনা? তিনি বললেন কি হয়েছে? তারা বললেন, আপনি ৫ রাকায়াত সালাত পড়িয়েছেন। একথা শুনার পর তিনি পুনরায় সালাম ফিরায়ে দুটি সিজদা করেন।

৪. একবার আল্লাহর রাসূল আসর সালাত ৩ রাকায়াত পড়ায়ে ঘরে চলে যান। একজন সাহাবী ঘরে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে জানালে তিনি রাগান্বিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে উপস্থিত সালাতীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কথা কি ঠিক? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, তখন তিনি বাকি ১ রাকায়াত পড়ানোর পর সালাম ফিরালেন। দুটি সিজদা করে আবারও সালাম ফিরালেন।

তারপর বললেন–

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ـ

আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ, তোমাদের মতো আমারও ভুল হয়। তোমাদের কেউ (সালাত) ভুল করলে দুটি সিজদা করা উচিত। (মুসলিম)

◆ সাহু সিজদা করার কারণগুলো নিম্নরূপ–

১. সালাতে ওয়াজিব জাতীয় কোন একটি বা একাধিক কাজ ভুলক্রমে আদায় না হয়ে থাকলে তজ্জন্য সাহু সিজদা করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় সিজদা না করলে সালাত সহীহ হবে না। পুনরায় সালাত পড়তে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, ওয়াজিব ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে এবং ফরজ জাতীয় কাজ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় বাদ পড়লে তজ্জন্য সাহু সিজদা দিলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না। বরং সালাত অবশ্যই পুনরায় পড়তে হবে।'

২. ভুলবশত দুই রুকু কিংবা ৩ সিজদা অর্থাৎ ওয়াজিব কাজ বর্ধিত হওয়ার কারণে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

৩. সূরায়ে ফাতিহা না পড়ে শুধুমাত্র যে কোনো সূরা পড়লে কিংবা ভুলক্রমে সূরার পর ফাতিহা পড়লে সাহু সিজদা দিলে সালাত শুদ্ধ হবে। কেননা,

এক্ষেত্রে সূরা পড়ার যে ফরজ কাজ তা সম্পন্ন হয়েছে। ওয়াজিব ছুটে যাওয়ায় সাহু সিজদা দিতে হবে।

৪. ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেভাবেই হোকনা কেন সূরা ফাতিহা ছাড়া পড়লে নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং উমরায় নামায পড়তে হবে। তবে অন্য সূরা কিংবা অন্য সূরার কোনো অংশ না পড়লে কিংবা ছাড়া পড়লেও নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৫. যে কোনো সালাতে সূরায় ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা না মিলালেও অথবা ছাড়া পড়লেও সাহুসিজদা দিতে হবে না।

৬. সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য কোনো সূরা মিলাতে দেরি হলে সাহুসিজদা লাগবে না।

৭. ৩ বা ৪ রাকায়াত ফরজ সালাতের ১ম বৈঠকে তাশাহুদ দু'বার পড়লে কিংবা তাশাহুদ পড়ার পর দরূদ পড়ার সময় স্মরণ হওয়ার পর দাঁড়ালে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব। 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা' দরূদের এ পর্যন্ত পড়লে সিজদা দেয়া ওয়াজিব নয়। সুন্নাত ও নফল সালাতের ১ম বৈঠকে তাশাহুদ, দরূদ, দোয়া পড়া জায়িয। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাহু সিজদা করার দরকার নেই। তবে তাশাহুদ দুবার পাঠ করলে সিজদা দিতে হবে।

৮. তাশাহুদের বৈঠকে তাশাহুদ না পড়ে ভুলক্রমে দরূদ, সানা, দোয়া, ফাতিহা পড়লে তজ্জন্য সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

৯. তাকবীরে তাহরীমার পর সুবহানাকা ছাড়া অন্য কোনো দোয়া পড়লে সাহু সিজদার দরকার হবে না। (বরং এ সময়ে অন্তত: ৭/৮ ধরনের দোয়া পড়ার প্রমাণ আছে।) অনুরূপভাবে ফরজ সালাতের ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াতে ফাতিহার পরিবর্তে 'তাশাহুদ' বা 'সানা' বা তাশাহুদের পর সূরা পড়লে তাতে সালাত শুদ্ধ হবে। সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব নয়।

১০. ফরজ সালাত ৩ কিংবা ৪ রাকায়াত সম্পন্ন হলে ১ম বৈঠক করা ওয়াজিব। ভুলক্রমে না বসে তৃতীয় বা ৪র্থ রাকায়াতের জন্যে দাঁড়াতে উদ্যত হলে শরীরের নিম্নঅংশ সোজা না হলে বসে পড়তে হবে। নিম্নাংশ সোজা হলে দাঁড়াতে হবে এবং সাহু সিজদা দিতে হবে। সোজা হওয়ার পর বসে পড়লেও সাহু সিজদা দেয়া সাপেক্ষে সালাত বিশুদ্ধ হবে।

১১. শেষ বৈঠকে বসতে ভুলে গিয়ে দাঁড়াতে উদ্যত হলে দেহের নিম্নাংশ সোজা হওয়ার আগে স্মরণ হলে বসে পড়তে হবে। তাশাহুদ, দরূদ পড়ে যথারীতি

সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হবে। সিজদা দিতে হবে না। সম্পূর্ণ সোজা হওয়া এমনকি রুকু করার পরও যদি স্মরণ হয় তাহলে বসে পড়তে হবে এবং তাশাহুদ দরূদ পড়ে সালাত শেষ করতে হবে। এমতাবস্থায় সাহু সিজদা দিতে হবে। আর যদি সিজদা দেয়ার পর স্মরণ হয় তা হলে ৩য় বা ৫ম রাকায়াত পূর্ণ করত্ব আরো এক রাকায়াত অর্থাৎ ৪ কিংবা ৬ রাকায়াত পূর্ণ করতে হবে। এ অবস্থায় সাহু সিজদা দেয়ার দরকার নেই। তবে উক্ত ৪ বা ৬ রাকায়াত সালাত নফল হয়ে যাওয়ার কারণে ফরজ সালাতের আদায় করার বিষয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে ফরজ সালাত পুনরায় পড়তে হবে। আর যদি ৪র্থ কিংবা ৬ষ্ঠ রাকায়াত যোগ না করা হয় তাহলে ৩য় ও ৫ম রাকায়াত (১ রাকায়াত সালাত পড়ার বৈধতা না থাকার কারণে) বাতিল হয়ে যাবে। ২ বা ৪ রাকায়াত নফল রূপে গণ্য হবে। ফরজ সালাত হলে পুনরায় পড়তে হবে।

১২. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে সিজদা দেয়ার আগে স্মরণ হলে তাৎক্ষণিকভাবে বসে তাশাহুদ না পড়ে একদিকে সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করত: পুনরায় তাশাহুদ ও দরুদ পড়ে সালাতের ইতি টানতে হবে। আর সাজদা করার পর ভুলের কথা মনে পড়লে আরো এক রাকায়াত মিলিয়ে : ৪ কিংবা ৬ রাকায়াত জোড় সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। এমতাবস্থায় সাহু সিজদা দিতে হবে। শেষ বৈঠক করার কারণে ফরজ সালাত পুনরায় পড়তে হবে না। অতিরিক্ত দুরাকায়াত নফলরূপে গণ্য হবে। ৩ বা ৫ রাকায়াত পড়লে ১ রাকায়াত বাতিল রূপে গণ্য হবে।

১৩. ওয়াজিব সাহু সিজদা আদায় করতে ভুল হলে স্মরণ হতেই সিজদা করা উচিত। সালাতের জায়নামাযে দীর্ঘক্ষণ বসে তাসবীহ তাহলীল কিংবা সালাত ভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ না ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে সাহু সিজদা দিলে সালাত জায়েয হয়ে যাবে। কথা বা কোনো কাজ করলে সালাত পুনঃ পড়তে হবে। (বেহেশতি জেওর)

[এরূপ অবস্থায় কথা বললেও সালাত পুনরায় পড়তে হবে না। বরং সাহু সিজদা দিলেই সালাত শুদ্ধ হবে। সহীহ মুসলিমে আছে, নবী করীম ﷺ-এর ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে এসেছেন। কথা বলেছেন, তারপর পরিত্যক্ত এক রাকায়াত পড়িয়ে সাহু সিজদা করেছেন।]

১৪. ৩ বা ৪ রাকায়াত বিশিষ্ট সালাতের ১ম বৈঠকে সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট রাকায়াতের কথা মনে পড়তেই দাঁড়িয়ে বাকি সালাত আদায় করতে হবে এবং সাহু সিজদা দিতে হবে।

১৫. সালাতের সুন্নাত জাতীয় কাজ যেমন সানা পড়া, রুকু সিজদার তাসবীহ পড়া, দুরুদ পড়া, তাকবীরে তাহরীমের হাত উঠানো, রুকু সিজদা করতে তাকবীর বলা ইত্যাদি যে কোনো ধরনের ভুল হলে তজ্জন্য সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব নয়।

১৬. সুন্নাত, নফল এবং যুহর ও আসরের ফরজ সালাতে কিরায়াত নিঃশব্দে পড়তে হয়। এসব সালাতে সূরা কিরাত ভুলক্রমে সশব্দে পড়লে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব। দু এক শব্দ উচ্চারিত হলে তা ধর্তব্য নয়। অনুরূপভাবে ফজর মাগরিব ও ইশার সালাতে ইমামকে উচ্চস্বরে ফাতিহা ও সূরা পড়তে হয়। ইমাম ভুলে চুপিসারে কিরাত পড়লে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব। অবশ্য একাকী সালাত আদায়কারীর বেলায় এরূপ ভুলের জন্যে সাহু সিজদা দেয়ার প্রয়োজন নেই।

[কারো কারো মতে মুনফারিদ (একাকী) হয়ে সালাত পড়লে নিঃশব্দে কিরাত পড়ার স্থলে সশব্দে কিরাত পাঠ করলে সাহু সিজদা দিতে হবে।]

১৭. ফরজ সালাতের ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াতে সূরায়ে ফাতিহার পর আয়াত, দোয়া, সানা পড়লে তাতে সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না এবং সাহু সিজদাও ওয়াজিব নয়। একই রাকায়াতে একাধিক সূরা পড়া যায়। সূরা পড়া অবস্থায় ইমাম যদি কোথাও আটকে যায় এবং লোকমার সাহায্য নেয়াও সম্ভব না হয়, তা হলে ইমাম অন্য সূরা পড়তে পারেন এবং তজ্জন্য সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব নয়।

১৮. সালাতের আরকানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলে কিংবা রুকন বার বার আদায় করলে সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

১৯. সালাতের শুরুতেই ফাতিহা না পড়ে অন্য সূরা পাঠ করতে থাকলে স্মরণ হওয়া মাত্র ফাতিহা পড়ে অন্য সূরা মিলিয়ে সালাত শেষ করতে হবে। এমতাবস্থায় সাহু সিজদা করা ওয়াজিব। আর ভুলে ফাতিহা আদৌ না পড়লেও সাহু সিজদা সাপেক্ষে সালাত শুদ্ধ হবে।

২০. তা'দিলে আরকান অর্থাৎ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে সুস্থির হয়ে বসা ওয়াজিব কার্য লংঘিত হলে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

২১. বিতরের ১ম কিংবা ২য় রাকায়াতে ভুলক্রমে দোয়ায়ে কুনুত পড়লে তা বৃথা যাবে। ৩য় রাকাতে কুনুত অবশ্যই পাঠ করতে হবে এবং সাহু সিজদা করতে হবে।

২২. বিতর সালাতে ভুলক্রমে দোয়ায়ে কুনুতের পরিবর্তে সানা বা অন্য কিছু পড়া অবস্থায় স্মরণ হওয়া মাত্র কুনুত পড়লে সালাত শুদ্ধ হবে। সাহু সিজদা দিতে হবে না।

২৩. ভুলক্রমে বিতর সালাতে দোয়ায়ে কুনুত না পাঠ করলে কিংবা ৩য় রাকায়াতের তাকবীর না বলে দোয়া পড়লে তাতে সাহু সিজদা দিতে হবে।

২৪. সালাতে একাধিক ভুলের জন্যে একবার মাত্র সাহু সিজদা করতে হবে।

২৫. ঈদের সালাতের ৬ তাকবীরে পরিত্যক্ত হলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

২৬. ইমামের ভুলের জন্যে মোক্তাদীকেও সাহু সিজদা দিতে হবে। ইমাম ১ম বা ২য় রাকায়াতে ভুল করলে ৩য় বা ৪র্থ রাকায়াতে কিংবা তাশাহুদে অংশ গ্রহণ করলে এমতাবস্থায় মোক্তাদীকেও সাহু সিজদা দিতে হবে। অর্থাৎ মোক্তাদীর ভুলে অংশ গ্রহণ করা শর্ত নয়।

২৭. মাসবুক (বিলম্বে শামিল মোক্তাদী) ইমামের সাথে সাহু সিজদা দেয়ার পূর্বে দাঁড়িয়ে গেলে বাকি সালাত আদায়ের পর তাকে সাহু সিজদা দিতে হবে।

২৮. ওয়াজিব সিজদা ভুলে আদায় না করে সালাম ফিরানোর পর মনে পড়তেই সাহু সিজদা দিলেই চলবে। সালাম ফিরানোর পর সালাত ভঙ্গের কোনো কাজ করলে সালাত পুনরায় পড়তে হবে।

◆ সাহু সিজদায় যা বলবে

সাহু সিজদাতে নামাজের সেজদার মতোই দোয়া পড়বে। নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি ভুলে সালাম ফিরিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা স্মরণ হয়, তাহলে বাকি অংশ পূরণ করে আবার সালাম ফিরাবে। অতঃপর সাহু সিজদা করবে। আর যদি কখনো সাহু সিজদা করতে ভুলে যায় এবং সাহু সিজদা ছাড়াই সালাম ফিরিয়ে নামাজ বিরোধী কোন কাজ, যেমন : কথাবার্তা বলা ইত্যাদি করে ফেলে, তাহলে প্রথমে সাহু সিজদা করবে, তারপর সালাম ফিরাবে।

যদি দু'টি সাহু সিজদা করা জরুরি হয় যার একটি সালামের পূর্বে আর অপরটি সালামের পরে তাহলে এমতাবস্থায় শুধুমাত্র সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করবে।

◆ **মাসবূক (যার সালাতের কিছু অংশ ছুটে গেছে) মুসল্লি যখন সাহু সিজদা করবে :** মুক্তাদি সর্বদা ইমামের সাথে সাহু সিজদা করবে। কিন্তু যদি মুক্তাদি মাসবূক হয় এবং ইমাম সাহেব সালামের পরে সাহু সিজদা করেন এমন হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যে ভুলের কারণে সাহু সিজদা করছেন তা মাসবূক নামাজে অংশ গ্রহণ করার আগের ভুল না পরের ভুল? অংশ গ্রহণ করার পরের ভুলের কারণে সাহু সেজদা হলে সালামের পর মাসবূক সাহু সিজদা করবে। আর যদি অংশ গ্রহণ করার আগের ভুলের কারণে সাহু সিজদা হয়, তাহলে মাসবূক তার বাকি নামাজ পূর্ণ করবে তার প্রতি সাহু সিজদা করা জরুরি নয়।

১১. জামাতে নামায আদায়

◆ **জামাতে নামায বিধি-বিধানের হেকমত :** জামায়াতে নামাজ আদায় ইসলামে অন্যতম মহান দৃশ্য যা ফেরেশতাগেণর সারিবদ্ধ হয়ে ইবাদতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটা মানুষের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, পরিচয় লাভ, সহনশীলতার একটি কারণ এবং মুসলমানদের সম্মান, শক্তি ও একতার একটি নিদর্শন।

◆ **মুসলমানদের সবচেয়ে বড় জামায়েত**

আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলিমদের জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিত হওয়ার বিধান দান করেছেন। সাপ্তাহিক জমায়েত জুমার জন্য সমবেত হওয়া। কিছু জমায়েত আবার বছরে দু'বার প্রতিটি দেশেই হয়ে থাকে যেমন : দুই ঈদে। আর কিছু সম্মিলন আছে যা বছরে একবার সমগ্র বিশ্বের মুসলিমের জন্য। যেমন : আরাফার ময়দানে হাজিগণের বিশ্বসম্মেলন। আবার কখনো কখনো সম্মিলিত হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তনের সময়, যেমন বৃষ্টি প্রার্থনার ও চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের নামাজে সমবেত হওয়া।

◆ **জামায়াতে নামায আদায় করার বিধান**

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুসলিম যার মসজিদে যাওয়ার শক্তি আছে তার জন্য মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। আর এই জামায়াতে নামাজ আদায়ের বিধান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য; তা সফর অবস্থায় হোক বা বাড়িতে থাকা অবস্থায় হোক, নিরাপদ অবস্থায় হোক বা ভয়ের মধ্যে হোক।

◆ **মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায়ের ফযীলত**

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً : وَفِىْ رِوَايَةٍ : بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "একাকী নামাজের চেয়ে জামাতের নামাজের ফযীলত সাতাশ গুণ বেশি।" অন্য বর্ণনাতে "পঁচিশ গুণ বেশি।" (বুখারী হাদীস নং ৬৪৫, মুসলিম হাদীস নং ৬৫০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى اِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ اِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْاُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ফরজ আদায়ের জন্য ঘরে ওযু করে আল্লাহর কোন ঘরের (মসজিদ) দিকে রওয়ানা হয়, তার প্রতিটি দুই ধাপের বা কদমের প্রথমটি দ্বারা একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং অপরটির দ্বারা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। (মুসলিম হাদীস নং ৬৬৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا رَاحَ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি সকালে বা বিকালে মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির (অতিথির সেবার) ব্যবস্থা করেন যখন সে সকালে বা বিকালে গমন করে।" (বুখারী হাদীস নং ৬৬২ ও মুসলিম হাদীস নং ৬৬৯)

◆ যেখানে জামায়াতবদ্ধ সালাত আদায় করবে

নিজের আবাস স্থানের মহল্লার মসজিদে নামাজ আদায় করাই মুসলিমের জন্য উত্তম। এবং ওয়াক্তিয়া মসজিদ থেকে পাড়ার বা গ্রামের জুমুআর মসজিদে নামায পড়া উত্তম। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা এই তিন মসজিদ ব্যতীত অধিক নেকির উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ বা কোথাও যাত্রা শরীয়াতে নিষিদ্ধ। সুতরাং গ্রামের মসজিদ ছেড়ে বড় জামায়াতে শামীল হয়ে নেকির উদ্দেশ্যে অন্য কোনো মসজিদে নামায পড়তে যাওয়া শরীয়ত সম্মত নয়। এ ছাড়া মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম, নবী করীম ﷺ-এর মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা (ফিলিস্তিনের বাইতুল মাকদিস মসজিদ)। এ তিনটি মসজিদে নামাজ আদায় করা সর্বাবস্থায় উত্তম।

মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াতে সালাত আদায় করা জায়েয। সীমান্তের প্রহরীদের জন্য কোন এক মসজিদে সবাই মিলে সালাত আদায় করা উত্তম। তবে একত্রিত হওয়াতে যদি শত্রুদের আক্রমনের ভয় হয়, তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে সালাত আদায় করে নিবে।

◆ মহিলাদের মসজিদে গমনের বিধান

মহিলাদের জন্য মসজিদে নামাজে হাজির হওয়া বৈধ, যদি তা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও পরিপূর্ণ পর্দার সাথে হয়। জুমুআ ও দুই ঈদ অর্থাৎ ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আযহা ব্যাতীত পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে মহিলাদের জামায়াত করা জায়েয। এক্ষেত্রে মহিলা ইমাম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যদি মহিলারা তোমাদের নিকট মসজিদে গমনের অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দাও।"

(বুখারী হাদীস নং ৮৬৫, মুসলিম হাদীস নং ৪৪২, হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের)

◆ জামায়াতের জন্য সর্বনিম্ন লোক সংখ্যা

জামায়াতের সবচেয়ে কম সংখ্যা হচ্ছে দুই জন। আর যখন জামায়াতের লোক সংখ্যা বেশি হবে তখন তার নামাজের জন্য অধিক পরিশুদ্ধকারী ও আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় হবে।

◆ যে একাকী সালাত আদায়ের পর জামায়াত পাবে তার বিধান

যে ব্যক্তি নিজ স্থানে ফরজ নামাজ আদায়ের পর মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লিগণকে নামাজরত অবস্থায় পাবে তার জন্য সুন্নাত হলো : তাদের সাথে নামাজে শরিক হওয়া। এ নামাজ তার জন্য নফল হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে মসজিদে জামায়াত করে নামাজ আদায়ের পর অন্য কোন মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লিদের নামাজরত অবস্থায় পেলে তার বিধানও অনুরূপ।

ফরজ নামাজের একামত হয়ে গেলে ফরজ নামাজ ছাড়া আর অন্য কোন সালাত পড়া যাবে না। যদি কারো নফল নামাজ আদায় করার সময় একামত হয়ে যায়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে নফল সালাত ছেড়ে দিয়ে তাকবীরে তাহরীমায় শামীল হবে। সে নফল পড়ার ফযীলত পেয়ে যাবে। তবে যদি শেষ তাশাহুদের শেষ

প্রান্তে এসে যায় ও সাবেকভাবেই ইমামের সাথে তাকবীরে উলা পেয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকে তাহলে অতটুকু পূর্ণ করে নেওয়া যায়।

◆ **জামায়াতে সালাত আদায় করা থেকে দূরে থাকার বিধান**

কেউ যদি মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় করা থেকে পিছে পড়ে যায় আর সে কোন মা'যূর ব্যক্তি তথা তার ওজর থাকে যেমন : রোগ কিংবা ভয় ইত্যাদি, তাহলে যে জামায়াতে নামায পড়েছে তার সমপরিমাণ তাকে সওয়াব দেয়া হবে। আর যদি কোন ওজর ছাড়াই জামায়াত ত্যাগ করে একাকী নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ সঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে বিশাল সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার কবীরা গুনাহও হবে।

◆ **জামাত ও প্রথম তাকবীরের ফযীলত**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَ الْأُوْلٰى كُتِبَتْ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে প্রথম তাকবীরসহ চল্লিশ দিন জামায়াতসহ সালাত আদায় করবে তার জন্যে দু'টি নিষ্কৃতি লিখা হবে। জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি ও মুনাফেকী থেকে নিষ্কৃতি।"

(সমস্ত সনদসহ হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাদীস নং ২৪১, সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাদীস নং ২৬৫২)

১২. ইমামতির আহকাম

ইমামতির ফযীলত : ইমামতির ফযীলত অনেক বেশি। এ জন্য নবী করীম ﷺ নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পরে তাঁর চার খলিফা ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইমামের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব, তিনি জিম্মাদার। সুতরাং সঠিক ও সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলে অনেক বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন।

◆ **ইমামকে অনুসরণের বিধান**

সালাতের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ ফরজ। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ ـ

ইমামকে তার অনুসরণের জন্যই নিয়োগ করা হয়। অতএব, ইমাম যখন রুকু করে তখন তোমরাও রুকু কর, যখন 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা 'রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ' বল, যখন ইমাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, আর যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করে (ইমামতি করে) তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় কর।

(বুখারী হাদীস নং ৭২২ ও মুসলিম হাদীস নং ২৬৫২)

◆ ইমামতির জন্য বেশি হকদার ও অগ্রাধিকার

কুরআনুল কারীম যিনি সবচেয়ে বেশি মুখস্ত করেছেন এবং সাথে সাথে সালাতের আহকামও জানেন, এমন ব্যক্তিকে ইমামতির অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এরপর যিনি হাদীস ও সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। তারপর হলেন আগে হিজরতকারী ব্যক্তি। এরপর আগে ইসলাম গ্রহণকারী। এরপর সার্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি। আর এতে সবাই সমান হলে লটারীর মাধ্যমে ইমামতির অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হবে। উপরোক্ত মাসয়ালা ঐ সময়ের জন্য যখন সালাতের সময় হয়ে যাবে এবং মুসল্লিগণ কাউকে সামনে ইমামতির জন্য পেশ করতে চাবে। কিন্তু যদি মসজিদে ইমাম নির্ধারিত থাকেন এবং সময়মত উপস্থিত হন তাহলে ইমাম সাহেবই ইমামতির অগ্রাধিকার রাখেন।

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِذَا كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِلْمًا ـ

আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "গোত্রের ইমামতি করতে সর্বাধিক কুরআন মুখস্থকারী, যদি তাতে সমান হয় তাহলে সুন্নাত (হাদীস) সর্ম্পকে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যদি তাতেও সমান

পর্যায়ের হয়, তাহলে আগে হিজরতকারী। আর তাতেও সমান পর্যায়ের হলে আগে ইসলাম গ্রহণকারী।" (মুসলিম হাদীস নং ৬৭৩) .

বাড়ির মালিক এবং মসজিদের ইমাম ইমামতির বেশি হকদার। ইসলামী সরকারের কোন প্রতিনিধি থাকলে তিনি বেশি অগ্রাধিকার পাবেন।

◆ ফাসেক ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায়ের বিধান

সর্বোত্তম ব্যক্তি ইমামের জন্য সামনে পেশ করা ফরজ। তবে যদি ফাসিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে ইমামতির জন্য পাওয়া না যায়, তাহলে তার পিছনে সালাত (সহীহ) হয়ে যাবে। যেমন : দাড়ি মুণ্ডনকারী, ধূমপায়ী ইত্যাদি এমন ব্যক্তি।

ফাসেক : যে ব্যক্তি কুফুরি নয় এমন কবিরা গুনাহ বা বারবার ছগিরা গুনাহ করে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে।

◆ ইমামের আগে কিছু করলে তার বিধান

সালাতে ইমামের আগে কোন কাজ করা হারাম। যে ব্যক্তি সালাতে কোন কাজ জেনে বুঝে ইমামের আগে করবে সে গুনাহগার হবে। ভুলে যাওয়া, অমনযোগী হওয়া বা ইমামের শব্দ শুনতে না পারা ইত্যাদি ওজরের কারণে যদি ইমামের অনুসরণ থেকে পিছনে পরে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করে পরে ইমামের অনুসরণ করবে। এতে তার সালাতের কোন অসুবিধা হবে না।

◆ ইমামের সাথে মুক্তাদির চার অবস্থা

১. **ইমামের আগে কিছু করা :** আর তা হলো তাকবীর, রুকু, সিজদা, সালাম ইত্যাদি মুক্তাদি ইমামের আগে করা। এ ধরনের কাজ নাজায়েয। কেউ বিনা ওযরে এমন করলে পুনরায় ইমামের পরে আবার ঐ কাজটি করে নিবে। আর যদি না করে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার নামায ত্রুটিপূর্ণ রয়ে যাবে।

২. **ইমামের সাথে সাথে করা :** আর তা হলো তাকবীর, রুকু ইত্যাদি এক রুকন থেকে অপর রুকনে যাওয়ার সময় ইমামের সাথে চলে যাওয়া। এতে সে গুনাহগার হবে না তবে পূর্ণ একতেদা ও অনুস্বরণ প্রকাশ পেল না।

৩. **ইমামের অনুসরণ করা :** আর তা হলো কোন আমল ইমাম সাহেব করার পর তার পিছনে পিছনে করা। আর এটাই মুক্তাদির কাজ এবং এর দ্বারাই শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমামের অনুসরণ হবে।

৪. **ইমামের অনুসরণ না করে অনেক পরে করা :** আর তা হলো মুক্তাদির ইমামের অনুসরণ না করে এত বিলম্ব করা যে ইমাম অন্য রুকনে চলে যায়। এমনটি করা জায়েয নেই; কারণ এতে অনুসরণ হয় না।

মসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখে (নির্দিষ্ট) ইমাম প্রথম জামায়াত সমাপ্ত করে ফেলেছেন, তাহলে যারা পিছে পড়েছেন তাদের নিয়ে দ্বিতীয় জামায়াত করা জায়েয। তবে এই দ্বিতীয় জামায়াতের ফযীলত প্রথম জামায়াতের ফযীলতের মতো হবে না।

◆ মাসবূকের অবস্থা

১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকায়াত পেল, সে জামাত পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকু পেল সে ঐ রাকায়াত পেয়ে গেল। সুতরাং মুক্তাদি প্রথম দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমার তাকবীর বলবে, এবং এরপর ইমামের তাকবীরের কাছাকাছি সময়ে শামীল হতে পারলে সে তাকবীরও বলবে।

২. যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে দাঁড়ানো কিংবা রুকু অথবা সিজদা বা বসা যে কোন অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই ইমামের সঙ্গে সালাতে অংশ গ্রহণ করবে। ইমামের সর্বশেষ সেজদা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জামাআতে শামীল হতে পারলে জামাতের ফযীলত পেয়ে যাবে। তবে তাকবীরে উলায় শরীক হওয়ার বিশেষ ফযিলত রয়েছে অনুরূপভাবে যে যত আগে জামাআতে শরীক হতে পারবে ততধিক সওয়াব পাওয়ার সে যোগ্য হবে। কেউ যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পায় তাহলে ইমামের সাথে রুকুতে শামীল হতে পারলে সেটি তার পূর্ণ রাকাআত হিসেবে গণ্য হবে। তবে রুকু না পেলে রাকায়াত পাওয়া ধরা হবে না। আর তাকবীরে উলা (তাহরিমার তাকবীর) ইমামের সঙ্গে পেতে হলে মুসল্লিকে ইমামের সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে তাকবীরে তাহরিমা বলে সালাতে প্রবেশ করতে হবে। অনেকে আরবীতে মুখে নিয়াত পড়তে গিয়ে তাকবীরে উলা হারিয়ে ফেলেন।

◆ সালাতে হালকা করার বিধান

ইমামের জন্য সুন্নাত হলো দীর্ঘ না করে পরিপূর্ণভাবে আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করা; কারণ, মুসল্লিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকতে পারে যে, দুর্বল, অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং এমন ব্যক্তি যার তাড়াহুড়া আছে ইত্যাদি। তবে একাকী কোন সালাত পড়ার সময় যত ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারে।

◆ সুন্নত তরীকায় সালাত হালকা করার পদ্ধতি

সুন্নত তরীকায় সালাতকে হালকাভাবে আদায় করার অর্থ হলো : সালাতের সকল রোকন, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ঠিক ঠিক মতো আদায়ের সাথে সালাত দীর্ঘায়িত না করা। যেমনভাবে নবী করীম ﷺ সর্বদা আদায় করতেন এবং আদায়ের নির্দেশ দান করতেন। মুসল্লিদের ইচ্ছামত ইমাম সালাত আদায় করবেন না। রুকু ও সিজদাতে যে ব্যক্তি নিজ পিঠ সোজা করে না তার সালাত হয় না।

◆ মুক্তাদিগণ যেখানে দাঁড়াবে

১. মুক্তাদিদের ইমামের পিছনে দাঁড়ানো সুন্নাত। তবে মুক্তাদি একজন হলে ইমামের বরাবর ডান পার্শ্বে দাঁড়াবে। আর মহিলা ইমাম হলে মহিলাদের সারির মধ্য ভাগে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবে।

২. মুসল্লিরা ইমামের ডান দিকে দাঁড়াতে পারে, অথবা ইমামের ডান ও বাম উভয় পার্শ্বেও দাঁড়াতে পারে। তবে কোনভাবে ইমামের সামনে দাঁড়ানো জায়েষ নেই। এভাবে ইমামের শুধু বাম দিকে দাঁড়ানো যাবে না। কিন্তু অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাম দিকেও দাঁড়ানো যেতে পারে।

◆ ইমামের পিছনে পুরুষ ও মহিলাদের লাইন হয়ে দাড়াঁনোর বিবরণ

১. ইমামের পিছনে প্রথম সারিতে প্রথমে বড় পুরুষ ও শেষ সাড়িতে ছোট বাচ্চারা দাঁড়াবে এবং পুরুষদের পিছনে মহিলাদের সারি হবে। মহিলাদের সারি পুরুষদের নিয়মেই হবে। প্রথম লাইন পূরণ হওয়ার পরে তার পরের লাইনসমূহ পূরণ করা, মুসল্লিদের মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করা, লাইন সোজা করা ইত্যাদি পুরুষদের মতোই করতে হবে।

২. যদি মহিলারা মিলে আলাদা জামাত করে, তাহলে পুরুষদের জামায়াতের মতো তাদেরও সবচেয়ে উত্তম সারি প্রথম সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি সবার পিছনের সারি। পুরুষের সরাসরি পিছনে মহিলার সারি বা মহিলাদের পিছনে পুরুষদের সারি অবৈধ। কিন্তু অতি ভিড় ইত্যাদির জন্য যদি অতীব প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে। কোন মহিলা যদি খুব ভিড় ইত্যাদির কারণে পুরুষদের সারিতে দাঁড়ায়ে সালাত আদায় করে নেয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا، وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "জামায়াতে সালাতে পুরুষদের সবচেয়ে উত্তম সারি হলো প্রথম সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি হলো শেষে সারি। আর মহিলাদের উত্তম সারি হলো শেষের সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি হলো প্রথম সারি।" (মুসলিম হাদীস নং ৪৪০)

◆ **জামায়াতে সালাতের কাতার সোজা করার নিয়ম**

১. সুন্নাত হলো ইমাম সাহেব মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবেন–

اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا .

আপনাদের কাতার সোজা করুন এবং পরস্পর মিলে দাড়ান। (বুখারী হাদীস নং ৭১৯)

২. অথবা বলবেন–

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلاَةِ .

কাতার সোজা করুন, কারণ কাতার সোজা করা সালাত কায়েমের অন্তর্ভুক্ত।
(বুখারী হাঃ নং ৭২৩, মুসলিম হাদীস নং ৪৩৩)

৩. অথবা বলবেন–

اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ، وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وصَلَهُ اللّٰهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ .

কাতার সোজা করুন, কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে সমান্তরাল করুন, কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ করুন, হাতগুলো সহজ ও স্বাভাবিকভাবে রাখুন, শয়তানের জন্য কাতারের মধ্যে খালি জায়গা রাখবেন না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তাকে মিলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। (আবু দাউদ হাদীস নং ৬৬৬, আবু দাউদের, নাসাঈ হাদীস নং ৮১৯)

৪. অথবা বলবেন–

اِسْتَوُوْا اِسْتَوُوْا اِسْتَوُوْا ـ

কাতার সোজা করুন, কাতার সোজা করুন, কাতার সোজা করুন ।

(হাদীসটি সহীহ্, নাসাঈ হাদীস নং ৮১৩)

◆ জামায়াতে কাতার সোজা করার বিধান

সালাতে কাঁধে কাঁধ ও গিঁটে গিঁট লাগিয়ে দুই জনের মাঝে ফাঁক বন্ধ করা ও কাতারগুলো প্রথম থেকে সিরিয়াল অনুসারে পূরণ করা ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন–

مَنْ سَدَّ فُرْجَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً ـ

যে ব্যক্তি দুই জনের মাঝের ফাঁক বন্ধ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন এবং এর দ্বারা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

(হাদীসটি সহীহ, আমালী মাহামিলিতে (ক্বাফ) ২/৩৬ ত্ববরানী আওসাত হাদীস নং ৫৭৯৭, সিলসিলা সহীহ হাদীস নং ১৮৯২)

পার্থক্য জ্ঞান সম্পন্ন বালকের আজান এবং ফরজ ও নফল সালাতের ইমামতি করা বৈধ এবং তা করলে আদায় হয়ে যাবে। যদি এমন কোন বালক পাওয়া যায় যে সবার মধ্যে উত্তম, তাকে ইমামতির জন্য সামনে পেশ করা ওয়াজিব।

যে সকল ব্যক্তির সালাত সহীহ্ হবে, তার ইমামতিও সহীহ (শুদ্ধ) হবে। যদি সে দাঁড়াতে বা রুকু ইত্যাদি করতে অপারগ ব্যক্তি না হয়। কিন্তু কখনো কোন মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না। নফল সালাত আদায়কারীর সাথে ফরজ সালাত আদায় করা যাবে। আসরের সালাত আদায়কারীর সাথে যোহ্রের সালাত আদায় করা যাবে, তারাবীর সালাতের সাথে এশা বা মাগরিবের সালাত আদায় করা যাবে। ইমাম সালাম ফিরানোর পরে বাকি সালাত আদায় করবে।

◆ নিয়তে বিপরীত হওয়ার বিধান

নামাজে ইমাম ও মুক্তাদির নিয়তে পার্থক্য থাকা জায়েয আছে। তবে ইমামের পূর্ণ অনুস্বরণ মুক্তাদীর জন্য জরুরি। হাদীসে রয়েছে–

اِنَّمَا جعل امام ليتم به অর্থাৎ ইমামের অনুস্বরণই মুক্তাদীর সালাত পড়ার জন্য ইসলামে ইমামের নিযুক্তি। তাই মুক্তাদীর সালাতের রাকাআত সংখ্যা ইমামের সমপরিমাণ অথবা অধিকপরিমাণ হতে হবে। যেমন– মাগরিবের সালাত আদায়কারীর ইমামের পিছনে মাগরিবের অথবা এশার, যোহর, আছরসমূহ

আদায়কারীর সালাত শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে ফযর সালাত আদায়কারী সালাত শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে এশার সালাত আদায়কারী ইমামের পিছনে যোহর, আছর সালাত আদায় করা যাবে কিন্তু মাগরিব ও ফযরের সালাত আদায় শুদ্ধ হবে না। মুক্তাদীর সালাতের রাকাআত সংখ্যা যদি ইমামের রাকাআত সংখ্যা যদি সমপরিমাণ না হয়ে বেশি হয় তবে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদী সালাতের বাকী অংশ আদায় করে নিবে। যেমনটি মুসাফির ইমামের পিছনে মুকিম ব্যক্তির সালাত আদায় করার বিধান রয়েছে অর্থাৎ মুসাফির ইমাম কসর সালাতের দু রাকাআত নামাযে সালাম ফিরাবে এবং মুকিম মুক্তাদী সালাতের বাকী অংশ পড়ে আদায় করবে। অনুরূপভাবে ইমাম মুকিম হলে মুসাফির মুক্তাদী হলো সালাত কসর না করে পূর্ণ সালাত আদায় করবে কারণ এক্ষেত্রে ইমামের পূর্ণ অনুস্বরণ হয়ে যায়।

তবে কার্যাদির মাঝে পার্থক্য জায়েয নেই। তাই মাগরিবের নামাজ আদায়কারী ইমামের পিছনে এশার নামাজ আদায় করা জায়েয। যখন ইমাম সালাম ফিরাবেন তখন দাঁড়িয়ে এক রাকায়াত আদায় করে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। আর যখন এশার নামাজ আদায়কারী ইমামের পিছনে মাগরিবের নামাজ আদায় করবে তখন চাইলে ইমাম যখন চতুর্থ রাকায়াতের জন্য দাঁড়াবেন তখন তাশাহহুদ করে সালাম ফিরাবে। অথবা ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরানোর জন্য বসে অপেক্ষা করবে।

◆ ছোট বাচ্চা ও মহিলাদের ইমামতির পদ্ধতি

যদি ইমাম সাহেব দু'জন বা তার অধিক বালকদের নিয়ে ইমামতি করেন যাদের বয়স সাত বছর হয়েছে তাদেরকে পিছনে দিবেন। আর যদি একজন হয় তবে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবেন। (বুখারী)

স্বশব্দে কেরাত নামাজে মুক্তাদি যদি ইমাম সাহেবের কেরাত শুনতে না পায় তবে সে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা পাঠ করবে চুপ করে থাকবে না।

◆ ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হলে তার বিধান

যদি নামাজ অবস্থায় ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুক্তাদিদের সালাত পড়ানোর জন্য একজনকে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে তিনি নামাজ থেকে বের হয়ে যাবেন। যদি কোন একজন মুক্তাদি সামনে যায় বা তারা কোন একজনকে সামনে করে দেয়, আর সে তাদেরকে নিয়ে নামাজ পূর্ণ করে, অথবা সবাই একাকী নিজ নিজ নামাজ পূর্ণ করে তবে সকলের নামাজ সহীহ্ হয়ে যাবে।

◆ মুক্তাদির ছুটে যাওয়া রাকাতসমূহের পূর্ণ করার পদ্ধতি

১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে যোহর বা আসর কিংবা এশার নামাজের এক রাকায়াত পেল তার প্রতি ওয়াজিব হলো ইমামের সালাম ফিরানোর পরে বাকি তিন রাকাত কাজা করা। সে দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে এরপর প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসবে। এরপর বাকি দু'রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

কিন্তু যদি যোহরের নামাজ হয় তাহলে প্রথম দু রাকাআতের মধ্যে হলে ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়বে। আর ২য় রাকাআতের মধ্যে হলে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। অতঃপর শেষ বৈঠক করার জন্য বসবে ও বৈঠক শেষে সালাম ফিরাবে। আর মাসবূক ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে যেখান থেকে পেয়েছে তাই তার নামাজের প্রথমাংশ ধরে বাকি অংশ পূর্ণ করবে।

২. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে মাগরিবের নামাজের এক রাকাত পেল সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে আদায় করে প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসবে। অতঃপর তৃতীয় রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করে রুকু সিজদাহ আদায় করে তাশাহহুদের জন্য বসবে এবং পূর্বের নিয়মে সালাম ফিরাবে।

৩. যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে ফজর বা জুমার নামাজের এক রাকাত পেল সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দ্বিতীয় রাকাত সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে আদায় করে তাশাহহুদের জন্য বসে বৈঠক শেষে সালাম ফিরাবে যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৪. যখন কেউ ইমামের শেষ বৈঠকের সময় মসজিদে প্রবেশ করে তখন সুন্নাত হলো সে যেন নামাজে শরিক হয় এবং ইমামের সালাম ফিরানো পরে তার নামাজ পূর্ণ করে।

◆ কোন ব্যক্তির লাইনের পিছনে একাকী সালাত আদায়ের বিধান

কোন পুরুষ ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়লে তার নামাজ হবে না। যদিও লাইনে কোন জায়গা না পায় তাহলেও পিছনে একাকী নামাজ আদায় করবে না এবং সামনের কাতারের কাউকে পিছনে টানবেও না। আর মহিলার লাইনের পিছনে একাকী নামাজ সঠিক হবে, যদি পুরুষদের জামায়াতে হয়। কিন্তু যদি শুধুমাত্র মহিলাদের জামায়াত হয়, তবে তার বিধান পুরুষের বিধানের ন্যায় যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হলো।

◆ নফল সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করার বিধান

বাড়িতে বা অন্য কোথাও দিনে বা রাত্রে নফল নামাজ জামায়াত করে আদায় করা জায়েয আছে।

যদি কেউ দেখে যে কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজ একাকী আদায় করছে, তবে উত্তম হলো তার সঙ্গে নামাজে শরিক হয়ে নামাজ পড়ে নেওয়া।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ وَحْدَهٗ فَقَالَ : اَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّى مَعَهٗ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষকে একাকী নামাজ আদায় করতে দেখে বললেন : "এমন কোন মানুষ নেয় যে এই ব্যক্তির সঙ্গে নামাজ আদায় করে তাকে সদকা করবে।"

◆ মুক্তাদিগণের ইমামের অনুসরণের পদ্ধতি

তাকবীর শুনতে পেলে মসজিদের ভিতরে ইমামের অনুসরণ করা সঠিক হবে যদিও ইমাম বা তার সামনে যারা তাদেরকে দেখতে না পায়। অনুরূপ মসজিদের বাইরেও অনুসরণ করা ঠিক হবে যদি তাকবীর শুনতে পায় ও লাইনগুলো একটি অপরটির সাথে মিলে থাকে।

◆ মুক্তাদিগণের দিকে ইমামের ফিরার পদ্ধতি

সুন্নাত হলো সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদিদের দিক হয়ে বসবেন। যদি জামায়াতে মহিলারা থাকে তবে একটু অপেক্ষা করবেন যাতে করে মহিলারা চলে যেতে পারে। আর জুমুআর সালাত আদায়ের পরে স্থান পরিবর্তন করে নামায আদায় করা সুন্নত।

যদি জায়গার সংকুলান না হয়, তবে ইমামের পার্শ্বে, তাঁর পিছনে, উপরে ও নিচে মুসল্লীরা নামাজ আদায় করলে জায়েয হবে।

ফরজ নামাজান্তে মুসাফাহা করা বিদ'আত। আর নামাজের পর ইমাম ও মুক্তাদিদের সবাই মিলে স্বশব্দে এক সঙ্গে দোয়া করাও বিদ'আত। সংখ্যা ও পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বৈধ হচ্ছে ঐ সকল জিকির-আজকার যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যেগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

◆ **ইমামকে বাদ দিয়ে মুক্তাদির অবস্থাসমূহ :** ইমামকে বাদ দিয়ে মুক্তাদির দু'অবস্থা–

প্রথম : ইমামকে বাদ দিয়ে একাকী হয়ে বাকি সালাত পূর্ণ করবে। যেমন : যদি ইমাম সালাত এমন দীর্ঘ করে যা সুন্নাতের বহির্ভূত অথবা এমন দ্রুত আদায় করে যার ফলে ধীর-স্থিরতা ইত্যাদির বিঘ্নতা ঘটে।

দ্বিতীয় : সালাত ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে পুনরায় আদায় করবে। মুক্তাদির এমন প্রয়োজন বা সমস্যা উপস্থিত হয় যার ফলে ইমামের অনুসরণ করা সম্ভব নয়। যেমন : পেশাব বা পায়খানা কিংবা বায়ুর চাপ অথবা নিজের বা অন্যের প্রতি ভয় ইত্যাদি যার কারণে সালাতে অব্যাহত থাকা অসম্ভব।

◆ সালাতে ইমামের শব্দ করার অবস্থাসমূহ

ইমাম নামাজে তাকবীর, আমীন, সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ্ ও সালাম ফিরানো উচ্চস্বরে বলবে। তবে এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লম্বা করে টান দেয়া থেকে বিরত থাকবে।

◆ শিরককারী ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়ার বিধান

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে ডাকে বা গাইরুল্লাহকে বিপদ মুক্তির জন্য আহ্বান করে কিংবা কবরের পার্শ্বে বা অন্য কোথাও গাইরুল্লাহর জন্য জবাই করে অথবা কবরবাসীদেরকে ডাকে তার পিছনে নামাজ আদায় করা জায়েয নেই; কারণ এসব কুফরি ও শিরক যার ফলে তার নামাজ বাতিল।

জুমার নামাজ ও জামাত ছাড়ার ওজরসমূহ : নিচের কারণগুলোর জন্য জুমার নামাজ ও জামায়াত ছাড়ার ওজর কবুল করা হবে। যেমন–

এমন রোগী যার জামায়াতে নামাজ আদায় করতে কষ্ট হয়। যার পেশাব ও পায়খানার চাপ আছে এমন ব্যক্তি। সফরসঙ্গীদের চলে যাওয়ার ভয়। যে ব্যক্তি তার নিজের বা সম্পদের কিংবা সাথীর অথবা বৃষ্টি বা কাদামাটি কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের ভয় করে। যার সামনে খানা হাজির, তার ক্ষুধাও বেশি এবং খেতেও সক্ষম। কিন্তু যেন এমনটি অভ্যাসে পরিণত না করে নেয়। অনুরূপ ডাক্তার, প্রহরী, নিরাপত্তা বাহিনী, দমকল বাহিনী ইত্যাদি। এরা মুসলমানদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত আছে, তাই নামাজের সময় তাদের কাজে থাকলে তারা তাদের

জায়গায় নামাজ পড়ে নিবে। তারা প্রয়োজন হলে জুমার নামাজের পরিবর্তে যোহরের নামাজ আদায় করবে।

যে সকল বস্তু নামাজ থেকে ভুলিয়ে রাখে বা যার মাঝে সময়ের অপচয় রয়েছে কিংবা শরীর বা বিবেকের ক্ষতি রয়েছে তা হারাম। যেমন : তাস খেলা, ধূমপান করা, হুক্কা টানা, নেশা, মাদক দ্রব ইত্যাদি। এ ছাড়া টিভি ইত্যাদির পর্দায় বসা যার মধ্যে কুফুরি ও নিকৃষ্ট জিনিসের প্রদর্শনী হয়।

◆ অপবিত্র বস্তুসহ ইমামের সালাতের বিধান

যদি ইমাম অজ্ঞতাবশত অপবিত্র বস্তু নিয়ে ইমামতী করেন এবং জামায়াত শেষে জানতে পারেন তবে তাদের সকলের নামাজ সহীহ্ হয়ে যাবে। আর যদি নামাজে জানতে পারে, তবে অপবিত্র বস্তু দূর করা বা পরিষ্কার করা সম্ভব হলে তাই করবেন এবং নামাজ পূরণ করবেন। আর যদি সম্ভব না হয়, তবে একজনকে মুক্তাদিদের নামাজ পূরণ করার প্রতিনিধি বানিয়ে তিনি নামাজ ছেড়ে চলে যাবেন।

যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠীর জিয়ারত করতে যায় সে যেন তাদের ইমামতি না করে বরং তাদেরই একজন ইমামতি করবে।

◆ সালাতের লাইনের যেসব স্থান ফযীলতপূর্ণ

জামায়াতের প্রথম কাতার দ্বিতীয় কাতারের চেয়ে উত্তম। আর লাইনের ডান দিক বাম দিকের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রথম কাতার ও লাইনের ডান দিকের ওপর রহমত বর্ষণ করেন ও তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী তাদের জন্য ক্ষমা চান। আর নবী করীম ﷺ প্রথম কাতারের জন্য তিনবার ও দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার দোয়া করেছেন।

প্রথম লাইনের হকদার কে : প্রথম লাইনে ও ইমামের নিকটে দাঁড়ানোর হকদার হচ্ছে আহলে ইলম তথা বিদ্বানদের মধ্যে যারা বিবেকবান ও তাকওয়ার অধিকারী। তাঁরাই মানুষের জন্য আদর্শ, তাই তাঁরা এটা করার জন্য অগ্রসর হবেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে কমগুণের অধিকারীগণ ইমামের নিকটে তথা দূর নিকটে দাঁড়াবেন। অতঃপর যে মসজিদে আগে প্রবেশ করবেন প্রথম কাতারে তাঁর দাড়ানোর অধিকার।

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ : اسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُولُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -

আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নামাজে আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেন : তোমরা কাতার সোজা কর, আগে পিছে হবে না; কারণ আগে পিছে হলে তোমাদের অন্তরও আগে পিছে হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা চালাক ও বিবেকবান তারা আমার নিকটবর্তী হবে। এরপর তাদের পরের দল, এরপর তাদের পরের দল। (মুসলিম হাদীস নং ৪৩২)

◆ সালাত লম্বা ও হালকা করার পদ্ধতি

সুন্নাত হলো ইমাম যখন কেরায়াত লম্বা করবেন তখন বাকি রুকনসমূহকেও লম্বা করা। আর যখন কেরায়াত হালকা করবেন তখন বাকি রুকনগুলোও হালকা করা।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضى) قَالَ : رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوْعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

বারা' ইবনে 'আজেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর নামাজ পর্যবেক্ষণ করলে এমন পাই যে, তাঁর কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, রুকুর পরে সোজা দাঁড়ানো, সিজদা, দুই সিজদার মাঝে বসা, দ্বিতীয় সিজদা, সালাম ফিরানো ও নামাজ শেষে চলে যাওয়া সবই সমান সমান।"

(বুখারী হাদীস নং ৮০১ ও মুসলিম হাদীস নং ৪৭১)

১৩. মা'জুর (অক্ষম) ব্যক্তিদের সালাত

◆ **মা'জুর তথা যাদের ওজর আছে তারা হলো :** রোগী, ভীত ও এমন ব্যক্তি যারা সাধারণভাবে নামায আদায়ে অক্ষম। আল্লাহর রহমতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এ ধরনের লোকদের প্রতি সহজ করে দিয়েছেন ও তাদের সমস্যা দূর করে দিয়েছেন। আর তাদের সাওয়াব অর্জন থেকে মাহরুম বা বঞ্চিত করে দেননি। তাই তাদেরকে তাদের ক্ষমতা অনুসারে সুন্নাত মোতাবেক নামাজ আদায়ের জন্য নির্দেশ করেছেন।

◆ **অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতার পদ্ধতি**

রোগী ব্যক্তি যদি ওযু করতে সক্ষম হয় তবে সালাতের জন্য তাঁর উপরেও ওযু করা অপরিহার্য। আর যদি ওযু করতে সক্ষম না হয় অথবা অসুখ বৃদ্ধি হওয়ার ভয় থাকে তবে সে ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। তাও যদি না পারে তবে পবিত্রতা অর্জন রহিত হবে এবং তার অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে।

ক. অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

◆ **অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের পদ্ধতি :** রোগী ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হয় তবে তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি। যদি দাঁড়িয়ে না পারে তবে চারপদ (চারজানু) হয়ে বসে বা তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় বসে। তাও যদি না পারে তবে ডান পার্শ্বের উপর হয়ে। এও যদি কষ্টকর হয় তবে বাম পার্শ্বের উপর হয়ে আদায় করবে। এভাবেও যদি না পারে তবে কিবলার দিকে পা করে চিত হয়ে শুয়ে মাথা দ্বারা বুকের দিকে ইশারা করত : রুকু ও সিজদা করবে। সিজদাকে রুকুর চেয়ে বেশি নিচু করবে। সেটাও যদি সম্ভব না হয় তবে চোখের ইশারায় সালাত আদায় করবে। বিবেক থাকা পর্যন্ত কোনক্রমে নামাজ মাফ নেই। রোগী তার অবস্থা হিসেবে উল্লেখিত পন্থায় নামাজ আদায় করবে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ : قَالَ كَانَتْ بِىْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ ـ

১. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অর্শ্ব রোগ ছিল। তাই নবী করীম ﷺ-কে এ অবস্থায় সালাত কিভাবে আদায় করব তা

জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন– দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় কর, যদি না পার তবে বসে কর, তাও যদি না পার তাহলে এক পার্শ্বের উপর আদায় কর।

(বুখারী হাদীস নং ১১১৭)

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) وَكَانَ مَبْسُوْرًا قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ : اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ، وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ.

২. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অর্শ্বরোগী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষের বসে বসে নামাজ আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন– যদি দাঁড়িয়ে সালাত কায়েম করে তবে সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে পড়বে তার সাওয়াব দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির চেয়ে অর্ধেক। আর যে ব্যক্তি শুয়ে আদায় করবে তার সাওয়াব বসে আদায়কারীর চেয়েও অর্ধেক।

(বুখারী হান নং ১১১৫)

◆ অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের আহকাম

১. যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করা অবস্থায় দাঁড়াতে সক্ষম হয় অথবা বসে আদায় করতে ছিল অতঃপর সিজদা করতে সক্ষম, অথবা পার্শ্বের উপর পড়তে ছিল এরপর বসতে সক্ষম, তাহলে যা করতে সক্ষম তাই করবে; কেননা তার উপর তাই ওয়াজিব।

২. বিশ্বস্ত ডাক্তারের পরামর্শে রোগীর চিকিৎসার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তির বসে বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ।

৩. যদি রোগী দাঁড়াতে ও বসতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকু ও সেজদা করতে অক্ষম তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় ইশারা করে রুকু এবং বসা অবস্থায় ইশারা করে সিজদা করবে।

৪. যে ব্যক্তি জমিনের উপর সেজদা করতে অক্ষম সে বসে বসে রুকু ও সিজদা করবে। সিজদাকে রুকুর চেয়ে বেশি নিচু করবে এবং হাতদ্বয় হাঁটুর উপরে রাখবে। আর বালিশ ইত্যাদির উপর সিজদা কবে না।

৫. রোগী ব্যক্তি অন্যদের ন্যায়, তাই তার উপর কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব। যদি না পারে তবে তার অবস্থা হিসেবে যে দিকে সহজ হয়, সে দিকে হয়ে আদায় করবে। আর রোগীর কোন পার্শ্ব নড়িয়ে বা আঙ্গুল ইশারা করে নামাজ সহীহ হবে না। বরং যেমনটি উল্লেখ হয়েছে সে মোতাবেক আদায় করতে হবে।

◆ রোগী যখন দুই ওয়াক্তকে জমা করে সালাত আদায় করবে

যদি প্রত্যেক নামাজ তার সময়মত আদায় করতে রোগীর প্রতি কষ্ট হয় বা অপারগ হয় তবে তার জন্য যোহর ও আসরকে এবং মাগরিব ও এশাকে কোন একটির সময়ে একত্রে জমা করে আদায় করা জায়েয।

সালাতে কষ্ট হচ্ছে : এমন কষ্ট যার দ্বারা সালাতের খুশু নষ্ট হয়ে যায়। আর খুশু হলো অন্তরের উপস্থিতি ও একাগ্রতা।

◆ রোগী ব্যক্তি যেখানে সালাত আদায় করবে

যে রোগী মসজিদে যেতে সক্ষম তার জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা জরুরি। সে সক্ষম হলে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে আর না পারলে ক্ষমতার অবস্থা বুঝে জামাতে সালাত আদায় করবে।

◆ রোগী ও মুসাফিরের আমলে যা লেখা হবে

আল্লাহ তা'আলা অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির জন্য তাদের সুস্থ ও বাড়িতে অবস্থানের সময় যা আমল করত তা এ অবস্থায় না করতে পারলেও তার সাওয়াব দান করবেন এবং রোগীকে ক্ষমা করে দিবেন।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا .

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- "যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফর করে তখন তার সুস্থ ও বাড়িতে থাকা অবস্থায় যা যা আমল করত অনুরূপ তার সাওয়াব লেখা হয়। (বুখারী হাদীস নং ২৯৯৬)

খ. মুসাফিরের সালাত

সফর অবস্থায় পঠিত সালাতকে 'কসর' বলে।

১. কসর (قصر) শব্দের অর্থ হ্রাস বা কমানো। সফরের সময় ৪ রাকায়াত বিশিষ্ট ফরজ সালাত কমিয়ে দু'রাকায়াত পড়ার বিধান রয়েছে। এ কারণেই এ ধরনের সালাতকে কসর সালাত বলা হয়।

২. **সফরের দূরত্ব** : ব্যবসা-বাণিজ্য, চিত্ত বিনোদন, দেশ ভ্রমণ, সরকারি বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্বীয় আবাসস্থল থেকে অন্য ভূমিতে পদার্পণ ও বিচারণকে সফর বলা হয়। মূলত সফরের দূরত্ব নির্ধারণ করাই

শরীয়ত সম্মত নয় যদিও বিদ্যানগণ সফরের দূরত্ব নির্ধারণে ভিন্ন ভিন্ন মতপ্রসং করেছেন। যার কোনোটিরই প্রকৃত কোনো শারীই ভিত্তি প্রাক্তনী ভিত্তি নেই এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির আবাসস্থলের অবস্থান অনুপাতে সফরের দূরত্ব কমবেশি হওয়া একান্তই স্বাভাবিক যেমন কারো আবাসস্থল অন্য দেশে সীমান্ত ঘেসা হয় এমতাস্থায় সীমান্তপাড়ের সফর তার জন্য দূরত্ব ১ মাইলেরও নিম্নে হতে পারে বিদায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে সংঘতভাবেই সীমানির্ধারণ না হওয়ারই দাবি রাখে। সফরের দূরত্ব সম্পর্কে রাসূল বা সাহাবীগণ কর্তৃক কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কতটুকু দূরে গেলে সালাত কসর করা বৈধ দু'সালাত একত্রে পড়া, রোযা স্থগিত রাখা যায় এর পরিমাণ তাঁরা নির্ধারণ করেননি। তাঁরা সকলেই কেবলমাত্র সফর শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেননা সামান্য কিছু দূরে কোনো উদ্দেশ্যে গেলেও অবস্থানের অবস্থার আলোকে তা সফর হিসেবে গণ্য হতে পারে। পক্ষান্তরে কোনো কোনো অবস্থানের অবস্থা বিবেচনায় অনেক দূরে গেলেও তা সফরে অন্তরভুক্ত নাও হতে পারে। সুতরাং সফরকারী নিজস্ব আবাসস্থলে অবস্থার উপর সফরের দূরত্ব নির্ভরশীল এর নির্দিষ্ট কোনো দূরত্ব নির্ণিয় করা যাবে না।

৩. সফরের সময়সীমা : ১৫ দিন বা তার চেয়ে কম সময় এমনকি কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে। অনুরূপভাবে সফরকারী কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নিয়াতে না থাকলে ১৫ দিনের উর্দ্ধেও সফর হতে পারে।

৪. কসর সালাত পড়ার শরয়ি হুকুম : ৪ রাকায়াত বিশিষ্ট ফরজ সালাত অর্থাৎ যোহর, আসর, ঈশার ফরজ সালাত ৪ রাকায়াতের স্থলে ২ রাকায়াত পড়া এবং এ অবস্থায় সুন্নাত সালাত না পড়ার শরঈ আইন প্রবর্তিত হয় হিজরী চতুর্থ সালে। সফর একটি কষ্টদায়ক ব্যাপার। এ সময় সালাতের সংখ্যা কম করে দেয়া আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। সহীহ মুসলিমে আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : সালাত কসর করা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সদকাহ ও অনুগ্রহ। আল্লাহর এ অনুদান তোমরা গ্রহণ কর।

এ বিষয়ে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ـ

অর্থ : আর তোমরা যখন দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বের হও, তখন সালাত কসর (সংক্ষেপ) করলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। (বিশেষত) যখন তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরের দল তোমাদের কষ্ট দিবে। কাফেররা তোমাদের চরম শত্রু। (সূরা নিসা : আয়াত-১০১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর করেছেন হিজরতের জন্যে, হজ্জের ও ওমরার জন্যে। তবে আল্লাহর বাণী প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থান ও দেশ বিদেশের সীমান্তে অধিক সফর করেছেন। এসব সফরের সময় তিনি সালাত কসর করেছেন। তার সালাত কসর করার অনেক হাদীস আছে। হাদীসগুলো বর্ণিত আছে সহীহ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে। হাদীসগুলোর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আছেন উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, ইমরান ইবনে হুসাইন, ওরওয়াহ ইবনে খুযাইর প্রমুখ (রা)। আয়েশা (রা) উদ্ধৃতি দিয়ে যারা সফরে রাসূলের ৪ রাকায়াত সালাত আদায়ের কথা বলেন, তাদের এ উদ্ধৃতি মনগড়া। একথা ইবনে তাইমিয়াহ (র) সহ আরো অনেক হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন।

একবার উমাইয়া ইবনে খালিদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-কে বললেন, কুরআনে তো আমরা কেবল মুকীম ও ভয়কালীন সালাতের কথা দেখতে পাই। সফরের সালাতের কথা তো নেই। তখন তিনি বললেন : হে আমার ভাই! আমরা তো কিছুই জানতাম না। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের জন্যে নবী বানিয়ে পাঠালেন। অতএব আমরা তাই করি যা তিনি করেছেন।

৫. সফরে সুন্নাত সালাত আদায়ের বিধান : নবী করীম ﷺ সফর অবস্থায় বিতর এবং ফজরের সুন্নাত ছাড়া ফরয সালাতের আগে পরে আর কোনো সুন্নাত সালাত পড়ছেন বলে প্রমাণ নেই। বিতর এবং ফজরের সুন্নাত তিনি সফরে ও মুকীম সর্ব অবস্থায় পড়তেন। তবে রাতের বেলায় তাঁর নফল সালাত পড়ার প্রমাণ আছে। বস্তুত: এ নফল ছিল তাঁর নিত্য রাতের নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত যে সালাত আদায় করতে তার পা ফুলে যেতো এবং যা ছিল তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হওয়ার উপাদান।

৬. সফরের সময় দুওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়া : নবী করীম ﷺ-এর নিয়ম ছিল, তিনি যদি সূর্য হেলার আগে সফরে বের হতেন তাহলে যোহর সালাতকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। অত:পর আসরের সময় যোহর ও আসর একত্রে পড়তেন। আর সূর্য হেলার পর সফরে রওয়ানা হলে তিনি যোহরের সময় যোহর ও আসর একত্রে পড়ার পর রওয়ানা হতেন। মাগরিবের সময় তাড়াতাড়ি করে রওয়ানা হলে তিনি মাগরিরের সালাত দেরী করে ইশার সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়তেন।

সফরের সময় এভাবে দুওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়ার সমর্থন ও প্রমাণ রয়েছে রাসূলের তাবুক সফর সম্পর্কীয় হাদীসে।

বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে হাদীসটি সহীহ (বিশুদ্ধ) কারো মতে হাসান (উত্তম), কারো মতে হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ।

সঠিক বিবেচনায় উপরিউক্ত বক্তব্য বিষয়ক হাদীসটিতে কোনো ত্রুটি নেই। যেমন একই বক্তব্য বিষয়ক যে হাদীস ইমাম হাকিম তাঁর রচিত মুসতাদারাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এটির সনদ সহীহ্ হওয়ার সকল শর্ত বর্তমান রয়েছে।

ইমাম হাকীম বলেছেন, আমার কাছে আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে আহমদ বালুবিয়া বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন মূসা ইবনে হারুন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন কুতাইবা ইবনে সায়ীদ, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন লাইস ইবনে সাআদ। তিনি শুনেছেন ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবীব থেকে, তিনি শুনেছেন আবু তোফাইল থেকে, তিনি মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে। মু'আয (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন : তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই (কোন মনযিল থেকে) সূর্য হেলার পূর্বে রওয়ানা করতেন তখন যোহর সালাতকে আসর পর্যন্ত বিলম্ব করে আসরের সময় যোহর ও আসর একত্রে পড়তেন।

যদি সূর্য হেলার পর রওয়ানা হতেন তাহলে যোহরের সময় যোহর ও আসর একত্রে পড়ে নিতেন। আর সূর্যাস্তের আগে রওয়ানা করলে মাগরিব বিলম্বিত করে এশার সময় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন। সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হলে এশাকে এগিয়ে এনে মাগরিবের সময় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়ার পর রওয়ানা হতেন। হাকীম বলেছেন, এ হাদীসটি একদল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ইমাম বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিতে ত্রুটি বা দুর্বলতা নেই। [হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে।

৭. সফরে একত্রে সালাত আদায়ের পদ্ধতি

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলন্ত অবস্থায় থাকলে যোহর ও আসরকে একত্রে আদায় করতেন। অনুরূপ মাগরিব ও এশার নামাজও একত্রে আদায় করতেন।" (বুখারী হাদীস নং ১১০৭)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ ـ

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলার পূর্বে সফর করলে যোহরকে আসরের সময় পর্যন্ত দেরী করতেন। অতঃপর অবতরণ করে যোহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। আর সফরের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর আদায় করে নিয়ে বাহনে আরোহন করতেন।

(বুখারী হাদীস নং ১১১২, মুসলিম হাদীস নং ৭০৪)

হজ্বরত অবস্থায় আরাফাতে যোহর ও আসরকে যোহরের সময় একত্রে কসর করে আদায় করা সুন্নাত। অনুরূপ মুযদালিফায় কসর করে মাগরিবকে দেরী করে এশার সময় একত্রে আদায় করাও সুন্নাত। যেমনটি মহানবী ﷺ করেছিলেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম মালিক (র) প্রমুখ বলেছেন, দুওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়ার বিষয়টি সাধারণভাবে সফরের সাথে সম্পর্কিত। কোনো বিশেষ ধরনের সফরের সাথে নির্দিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে দু'সালাত একত্রে পড়া শুধুমাত্র আরাফাতের জন্যে নির্ধারিত। কিন্তু সলফে সালেহীনদের প্রায় সকলেই সব ধরনের ছোট বড়, আরাম ও কষ্ট-দায়ক সফরে দু'ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়েছেন।

৮. কসর আদায়ের সূচনা : ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে নিজ আবাসস্থল থেকে রওয়ানা হলে মুসাফির বা ভ্রমণকারী হবে। ভ্রমণকারী হিসেবে সালাত কসর করা, দু'ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়া কিংবা রোযা স্থগিত হওয়ার বিধান শুরু হবে বাসা বাড়ি অতিক্রম করার পরই। এমনিভাবে সফর থেকে ফিরার সময় নিজ বাড়ী প্রবেশের আগ পর্যন্ত কসর পড়ার সুযোগ থাকে।

৯. কসর আদায়ের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় : কেউ তার কর্মস্থল বা জন্মস্থান বাড়িতে গিয়ে অবস্থান করলে সে মুসাফিররূপে গণ্য হবে না। কিন্তু পথিমধ্যে মুসাফির হিসেবে সে সালাত কসর করবে।

ক. বাড়ি থেকে ১৫ দিনের কম সময়ের নিয়ত করে সফরের দূরত্ব অতিক্রম করলে সালাত কসর করতে হবে। ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত না করে মাসের পর মাস অবস্থান করলেও সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে।

খ. মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পেছনে সালাত পড়লে সে পূর্ণ ৪ রাকায়াত সালাত পড়বে।

গ. ইমাম মুসাফির হলে ২ রাকায়াত পড়ে সে সালাম ফিরাবে। মুকীম মুক্তাদীগণ উঠে দাঁড়িয়ে বাকি যথানিয়মে সালাত পূর্ণ করবে।

ঘ. মুসাফির ইমাম হলে সালাত শুরু করার আগেই তার মুসাফির তথা সালাত কসর আদায়ের কথা বলে দেয়া উচিত। আগে না বলা হলে সালাম ফিরায়ে মুকীম মুক্তাদীগণকে সালাত পূর্ণ করার কথা বলে দিতে হবে।

ঙ. বৈবাহিক কারণে স্ত্রী শ্বশুরালয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি পিত্রালয়ে ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য যায় এবং পিত্রালয়ে আবাসস্থল যদি স্বামীর আবাসস্থলের দূরত্বের বাহিরে হয় তাহলে স্ত্রীলোকটি স্বীয় পিত্রালয়ে মুসাফিররূপে গণ্য হবে এবং সালাত কসর পড়বে।

চ. মুসাফির কসর নিয়তে সালাত আরম্ভ করতঃ ভুলক্রমে ৪ রাকায়াত ফরজ আদায় করলে তাতে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। তবে সাহু সিজদাহ দিতে হবে।

১০. যানবাহনে আরোহী অবস্থায় সালাত : বাস, মটর, গাড়ি, রেল গাড়ি, প্রাইভেট কার, নৌকা, বিমান, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাকার যে ধরনেরই যানবাহন হোক না কেন সেগুলোকে থামিয়ে বাহন থেকে নেমে মসজিদে কিংবা মাঠে সালাত আদায় করে নেয়া উত্তম। এসব যানবাহন থামানো সম্ভব না হলে যানবাহনে বসেই কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে হবে। নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, বিমান, রেলগাড়িতে দাঁড়ানো সম্ভব হলে দাঁড়াতে হবে। স্টীমার লঞ্চ ও নৌকায় জামায়াত করা সম্ভব হলে জামায়াতে সালাত আদায় করা উত্তম হবে। লঞ্চ, স্টীমার ও নৌকা, রেলগাড়ি বা অন্য যে কোনো বাহন মোড় ঘুড়ানো অত্যাসন্ন হলে মোড় ঘুরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর সালাতরত অবস্থায় বাহন ঘুরলে কোনো দোষ নেই বরং যেদিকে বাহন মোড় নেয় সেদিক হয়েই সালাত আদায় বিধিসম্মত এবং নিঃসন্দেহে পূর্ণমাত্রায় তা শুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে। হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সোয়ারী বা যানবাহনে ভ্রমণরত থাকতেন বাহনের উপরই নফল সালাত পড়তেন। বাহন যেদিকেই ঘুরতো, স্বাভাবিকভাবে তিনি সেদিক ফিরেই সালাত আদায় করতেন। এ সময় তিনি ইশারায় মাথা নুইয়ে রুকু সিজদাহ করতেন। তবে রুকুর চেয়ে সিজদায় বেশি নোয়াতেন।

আমের ইবনে রবীয়াহ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) প্রমুখ বর্ণনাকারীগণের বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী ﷺ বাহনে সালাত পড়েছেন এবং বাহন যে মুখী হতো তিনি সে মুখী হয়েই সালাত পড়েছেন।

আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকবীরে তাহরীমার সময় বাহনকে কিবলামুখী করে নিতেন। অতঃপর বাহন যেদিকে ঘুরতো সেদিক হয়েই তিনি সালাত শেষ করতেন। [এ হাদীসটি অধিকতর শুদ্ধ হয়।)

বৃষ্টির সময় এবং স্থান কাদামাটির হলে তিনি সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে ফরজ সালাত যানবাহনে পড়েছেন।

সফরের জন্য দু'ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায়ের যে প্রমাণ ভিত্তিক বিধান রয়েছে তা বাস্তবায়ন করলে সফরে সালাত কাযা কিংবা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

সফর তথা ভ্রমণ হলো নিজ বসাবাসের স্থান ছেড়ে অন্যত্র গমন করা।

সফর অবস্থায় নামাজ কসর (সংক্ষিপ্তকরণ) ও জমা তথা একত্রে আদায় করা জায়েয করা ইসলামের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট; কারণ সফরে অধিকাংশ সময় কষ্ট হয়ে থাকে আর ইসলাম দয়া ও সহজের দ্বীন।

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا: فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া বলেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে যখন বললাম, আল্লাহর বাণী : নামাজকে কসর করে আদায় করলে তোমাদের প্রতি পাপ নেই যদি ভয় কর যে, যারা কাফের তারা তোমাদেরকে ফেৎনায় ফেলতে পারে।

[সূরা নিসা : আয়াত-১০১]

তখন তিনি বললেন, তুমি যেমন আশ্চর্য হচ্ছ আমিও তেমনি আশ্চর্য হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে রাসূল ﷺ বলেন : এটি একটি দান যা আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি দান করেছেন। অতএব, আল্লাহর দান কবুল করে নাও। (মুসলিম হাদীস নং ৬৮৬)

◆ কসর (জমা) ও একত্রে সালাত আদায় করার বিধান

সফরে নিরাপদে বা ভয় উভয় অবস্থাতে কসর করা মুস্তাহাব। কসর হচ্ছে চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাজ যেমন : যোহর, আসর ও এশার নামাজ দুই দুই রাকায়াত করে আদায় করা। আর এটি সফর ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতে জায়েয নেই। আর মাগরিব ও ফজর সালাতে কসর নেই। জমা তথা একত্রে নামায আদায় করা শর্ত মোতাবেক বাড়িতে ও সফরে জায়েয।

যখন মুসাফির হেঁটে বা যানবাহনে স্থল পথে বা পানি পথে সফর করবে তখন তার জন্য চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাজকে কসর করে দুই রাকাত পড়া সুন্নাত। আর প্রয়োজনে সফর শেষ হওয়া পর্যন্ত দুই ওয়াক্তের নামাজকে কোন একটির সময়ে একত্রে আদায় করাও জায়েজ।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اَلصَّلَاةُ اَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَاَقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নামাজ প্রথমত: দুই রাকায়াত করে ফরজ করা হয়। অতঃপর সফরের নামাজ আসল তবিয়তে বহাল থেকে যায়, আর বাড়িতে থাকা অবস্থার নামাজ (চার রাকাত) পূরণ করা হয়।
(বুখারী হাদীস নং ১০৯০, মুসলিম হাদীস নং ৬৮৫)

প্রচলন ও প্রথা অনুযায়ী যাকে সফর বলা হয় তার সাথে সফরের বিধানসমূহ সম্পৃক্ত হয়। আর তা হলো সালাতের কসর ও জমাকরণ এবং রোজা না রাখা ও মোজার উপর মাসেহ করা।

মুসাফির যখন তার জনপদের বসতি এলাকা থেকে বের হওয়ার নিয়ত করে বাড়ী থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর ও একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবে। আর সঠিক মতে সফরের জন্য নির্দিষ্ট কোন দূরত্ব নেই বরং এর ফয়সালা নিজ নিজ দেশ ও এলাকার প্রথা মোতাবেক হবে। অতএব, যখনই সফর করবে এবং অবস্থান কিংবা বসবাসের নিয়ত করবে না সে মুসাফির, তার উপর সফরের সকল বিধান অর্পিত হবে যতক্ষণ সে তার নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে।

সফরে কসর করা সুন্নাত, তাই সফর যাকে বলে তাতেই কসর করবে। কিন্তু যদি কসর না করে পূর্ণ নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ সঠিক হবে।

যখন মুসাফির মুকিম (বাড়িতে অবস্থানকারী) ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবে, তখন সে পূর্ণ নামাজ পড়বে। আর যদি মুকিম মুসাফিরের পিছনে নামাজ

আদায় করে, তবে সুন্নাত হলো মুসাফির কসর করবে আর মুকিম সালামের পরে তার নামাজ পূর্ণ করে নিবে।

সুন্নাত হলো মুসাফির যখন সে স্থানের মুকিমদেরকে নিয়ে নামাজ পড়াবেন তখন দুই রাকায়াত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে বলবে : "আতিম্মু সলাতাকুম ফাইন্না কাওমু সাফার" অর্থ : তোমরা তোমাদের নামাজ পূর্ণ করে নেও আমরা মুসাফির।

সফরে তাহাজ্জুদ, বিতর ও ফজরের সুন্নাত ছাড়া সুনানে রাওয়াতিবা তথা সালাতের আগে ও পরের নামাজগুলো ছেড়ে দেয়াই সুন্নাত। আর সাধারণ নফল নামাজগুলো সফরে ও বাড়িতে আদায় করা জায়েয। অনুরূপ কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত নামাজ যেমন : ওযুর সুন্নাত, কা'বা ঘরের তওয়াফ শেষে সুন্নাত, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও চাশত ইত্যাদি নামাজ।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরের জিকিরগুলো নারী-পুরুষ সফরে ও বাড়িতে পড়া সুন্নাত।

বিমানের পাইলট বা গাড়ির চালক কিংবা জাহাজের নাবিক কিংবা রেলগাড়ির ড্রাইভার এবং যাদের সফর সর্বদা লম্বা সময় ধরে চলতে থকে, তাদের ক্ষেত্রেও মুসাফিরের হুকুমে থাকা পর্যন্ত সফরের রুখসাত গ্রহণ করা মুস্তাহাব যেমন : সালাতের কসর ও একত্রে আদায় এবং রমজান মাসে রোজা না করা ও মোজার উপর মাসেহ করা।

মুসাফিরের জন্য সুন্নাত হলো যখন সে তার বাড়িতে ফিরে আসবে তখন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে তারপর বাড়িতে প্রবেশ করা।

কসরের ব্যাপারে লক্ষণীয় হচ্ছে স্থান সময় নয়। তাই যদি মুসাফির বাড়ির নামাজ ভুলে যায় এবং সফরে স্মরণ হয় তবে তা কসর করে আদায় করবে। আর যদি সফরের নামাজ বাড়িতে আসার পর স্মরণ হয় তবে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে।

যদি মুসাফিরকে আটক করা হয় আর সে অবস্থানের নিয়ত না করে অথবা অবস্থানের নিয়ত ছাড়াই কোন প্রয়োজনে অবস্থান করে তবে সে কসর করবে যদিও তার সফর লম্বা হউক না কেন।

যদি বিমানে হয় আর নামাজ পড়ার কোন স্থান না পায়, তবে তার স্থানে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করবে। আর শক্তি অনুসারে রুকুর জন্য ইশারা করবে। এরপর সিটে বসবে ও শক্তি হিসেবে সিজদার জন্য ইঙ্গিত করবে।

যে ব্যক্তি মক্কা বা অন্য কোথাও সফর করবে সে মুকিম ইমামের পিছনে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। আর যদি ইমামের সঙ্গে নামাজ না পায়, তবে সুন্নাত হলো সে কসর করে পড়বে। আর যে ব্যক্তি কোন জনপদের পাশ দিয়ে সফররত

অবস্থায় অতিক্রম করার সময় আজান বা ইকামত শুনতে পায় আর সে নামাজ পড়েনি, তাহলে চাইলে সে অবতরণ করে জামায়াতে নামাজ পড়তে পারে অথবা তার সফরকে অব্যাহত রাখতে পারে।

যে ব্যক্তি যোহর ও আসর কিংবা মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করতে চায়, তাহলে সে আজান দিবে অতঃপর ইকামত দিয়ে প্রথম ওয়াক্ত পড়ে আবার ইকামত দিয়ে দ্বিতীয় ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। আর মুসল্লীরা সকলে জামায়াত করে আদায় করবে। যদি ঠাণ্ডা বা বাতাস কিংবা বৃষ্টি হয়, তবে তাদের বাড়িতেই নামাজ আদায় করবে।

◆ মুকিম অবস্থায় বাড়িতে একত্রে সালাত আদায়ের বিধান

বাড়িতে থাকা অবস্থায় যোহর ও আসর অথবা মাগরিব ও এশার নামাজ এমন রোগী যার যথা সময়ে পড়তে কষ্ট হয়, তার জন্য একত্রে আদায় করা জায়েয। অনুরূপ বৃষ্টিময় রাত্রিতে অথবা ঠাণ্ডা রাত্রিতে কিংবা কাদামাটি হলে বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইলে। ঐরূপ মুস্তাহাযা (প্রদর রোগিণী) মহিলা ও বহুমূত্র রোগী এবং যার নিজের বা পরিবার কিংবা সম্পদ ইত্যাদির ওপর ভয় হয় তার জন্যেও জায়েয।

গ. ভয়-আতঙ্ক অবস্থার সালাত

ইসলাম উদারতা ও সহজের দ্বীন আর ফরজ নামাজসমূহের গুরুত্ব ও উপকারিতার দিক থেকে কোন অবস্থাতে তা বাদ পড়ে না। তাই যখন মুসলমানরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকেন এবং তাদের শত্রুদের ভয় করেন, তখন তাদের জন্য বিভিন্নভাবে ভয়ের নামাজ আদায় করা জায়েয আছে। এ সালাতের প্রসিদ্ধ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে–

◆ ভয়-ভীতির সময় সালাতের পদ্ধতি

১. যদি শত্রু পক্ষ কিবলার দিকে থাকে তবে নিম্নের পদ্ধতিতে আদায় করবে– ইমাম তাকবীরে তাহরিমা দিবেন আর সেনাদল তাঁর পিছনে দুটি কাতার হয়ে দাঁড়াবে। সকলে এক সঙ্গে তাকবীর দিবে ও একই সঙ্গে রুকু করবে এবং একই সাথে উঠবে। এরপর ইমামের সাথের কাতারটি তাঁর সঙ্গে সিজদা করবে। এরা দাঁড়ালে দ্বিতীয় কাতার সিজদা করবে অতঃপর দাঁড়াবে। এরপর দ্বিতীয় লাইন সামনে আগাবে আর প্রথম লাইন পিছনে পিছাবে। অত:পর ইমাম সাহেব এদেরকে নিয়ে প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকায়াত আদায় করবেন। এরপর সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে সালাম ফিরাবেন।

২. যদি দুশমনরা কিবলার বিপরীত দিকে হয় তবে নিচের পদ্ধতিতে নামায পড়বে-

ক. ইমাম সাহেব একটি দল নিয়ে তাকবীর দিবেন আর অপর দলটি শত্রুদের সামনে হয়ে দাঁড়াবে। তাদেরকে নিয়ে এক রাকায়াত আদায় করে ইমাম দাঁড়িয়ে থাকবেন। আর এরা নিজেদের নামাজ পূরণ করে ফিরে যাবে ও শত্রু পক্ষের সামনে দাঁড়াবে। অত:পর দ্বিতীয় দলটি ইমামের পিছনে আসবে ও তিনি তাদেরকে নিয়ে বাকি রাকায়াত আদায় করবেন। এরপর তারাও নিজেরা নামাজ পূরণ করবে আর ইমাম বসেই থাকবেন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন। সেনাদলের করণীয় হচ্ছে : তারা সালাতের সময় হালকা অস্ত্র সঙ্গে রাখবে ও দুশমনদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

খ. অথবা ইমাম কোন একটি দলকে নিয়ে দুই রাকায়াত আদায় করবেন এবং এ দলটি নিজেরা সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। আর ইমাম বৈঠক করে দাঁড়াবেন। অতঃপর দ্বিতীয় দলটি আসলে ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে শেষের দুই রাকায়াত আদায় করে তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন। তাহলে ইমামের হবে চার রাকায়াত আর প্রতিটি দলের হবে দুই দুই রাকায়াত করে।

গ. অথবা প্রথম দলটিকে নিয়ে দুই রাকাতের পূর্ণ নামাজ শেষ করে সালাম ফিরাবেন। অতঃপর দ্বিতীয় দলটিকে নিয়ে অনুরূপ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবেন।

ঘ. অথবা প্রতিটি দল ইমামের সঙ্গে এক রাকায়াত করে আদায় করবে। যার ফলে ইমামের নামায হবে দুই রাকাত, আর কোন কাজা ছাড়াই প্রতিটি দলের নামাজ হবে এক রাকায়াত করে। এ সকল পদ্ধতি সহীহ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত।

৩. যখন ভয় ও আক্রমণ এবং যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে তখন দাঁড়িয়ে ও সওয়ারী অবস্থায় এক রাকায়াত নামাজ পড়বে। কিবলামুখী হোক বা না হোক ইশারায় রুকু ও সিজদা করবে। আর যদি নামাজ পড়তে সক্ষম না হয়, তবে তাদের ও শত্রুদের মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করবে। অত:পর সময়মত নামাজ কায়েম করবে।

১. আল্লাহর বাণী–

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ - فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ .

"তোমরা নামাজসমূহের হেফাজত কর। আর বিশেষ করে মধ্যের (আসরের) সালাতের হেফাজত কর। আর আল্লাহর জন্য একাগ্রচিত্তে দাঁড়াও। যদি ভয় কর তবে দাঁড়িয়ে অথবা সওয়ারীতে নামাজ আদায় কর। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন আল্লাহ যেমন শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না সেভাবে তাঁর জিকির কর।" [সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৮-২৩৯]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً .

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁর নবীর জবান দ্বারা বাড়িতে থাকা অবস্থায় নামায ফরজ করে দিয়েছেন চার রাকাত। আর সফরের জন্য দুই এবং ভয় অবস্থাতে এক রাকায়াত। (মুসলিম)

যখন মাগরিবের নামাজ হবে তখন তাতে কসর হবে না তখন ইমাম সাহেব প্রথম দলটি নিয়ে দুই রাকায়াত পড়বে আর দ্বিতীয়টিকে এক রাকাত। অথবা এর বিপরীত প্রথমটিকে এক রাকায়াত আর দ্বিতীয়টিকে দুই রাকায়াত পড়াবে।

১৪. জুমার সালাত

◆ **জুমার সালাত বিধিবিধান করার হেকমত :** মুসলমানদের মাঝে ভালোবাসা ও মহব্বতের বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ধরনের জমায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। একটি মহল্লা বা গ্রামের জমায়েতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। একটি শহরের জমায়েতের জন্য জুমা ও ঈদের নামাজ। আর বিশ্ববাসীর জমায়েতের জন্য মক্কায় হজ্ব। এগুলো মুসলমানদের ছোট, মধ্যম ও বড় জমায়েত তথা একত্রে মিলিত হওয়ার এক অনন্য মাধ্যম ও উপায়।

◆ **জুমার দিনের ফযীলত**

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ বলেছেন : সূর্য উদিত হয়েছে এমন দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। এ দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করা হয়েছে ও এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর জুমার দিন ছাড়া অন্য কোন দিনে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। (মুসলিম হাদীস নং ৮৫৪)

◆ **জুমার দিন গোসলের বিধান**

১. জুমান দিন গোসল করা (কেননা শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে এতে ফেরেশতা ও মানুষ কষ্ট পায়) ওয়াজিব।

اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ -

মহানবী ﷺ বলেছেন : জুমার দিন প্রতিটি সাবালক মানুষের প্রতি গোসল করা ওয়াজিব। (বুখারী হাদীস নং ৮৫৮ ও মুসলিম হাদীস নং ৮৪৬)

২. জুমার দিনের গোসলের পর সুন্নাত হলো পরিষ্কার হওয়া ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। আর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করা। সকাল সকাল মসজিদের দিকে যাওয়া। ইমামের পার্শ্বে বসা। আর নামাজ পড়া এবং বেশি বেশি দোয়া, দরুদ ও কুরআন তেলাওয়াত করা।

জুমার দিন যা পড়া সুন্নাত : জুমার দিনের রাত্রিতে বা দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করা সুন্নাত। আর যে সূরা কাহাফ জুমার দিনে তেলাওয়াত করবে তার জন্য দুই জুমার মাঝের সময়টা আলো দ্বারা আলেকিত করে দেয়া হবে।

◆ **জুমার দিন ফজরের সালাতে যা পড়া সুন্নাত :** জুমার দিনের ফজরের ফরজ সালাতে ইমাম সাহেবের জন্য প্রথম রাকায়াতে সূরা সিজদা ও দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা দাহার-(ইনসান) পড়া সুন্নাত।

◆ জুমার সালাতের হুকুম

জুমার নামাজ দু'রাকাত। এটি প্রতিটি মুসলিম, পুরুষ, বালেগ, বিবেকবান, স্বাধীন, ঘর-বাড়ি বানিয়ে একটি জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এমন ব্যক্তির উপর জুমার নামাজ ফরজ। জুমার নামাজ নারী, রোগী, শিশু, মুসাফির ও দাস-দাসীর উপর ফরজ নয়। এদের মধ্যে যারা জুমার সালাতে হাজির হবে তার নামাজ যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর মুসাফির যদি কোন স্থানে অবতরণ করে আর সেখানের আজান শুনতে পায় তবে তার জন্য জুমা আদায় করা জরুরি হয়ে যাবে।

জুমার সালাতের সময় : জুমার সালাতের উত্তম সময় হলো সূর্য ঢলার পর থেকে যোহরের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। তবে সূর্য ঢলার পূর্বেও আদায় করা জায়েয আছে।

জুমার আজান : উত্তম হলো জুমার সালাতের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় আজানের মধ্যে এমন সময় থাকা যাতে করে একজন মুসলিম বিশেষ করে যারা দূরে, ঘুমন্ত ও গাফেল তারা সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও জুমার আদব এবং সুন্নাতগুলো আদায় করে সালাতের জন্য যেতে পারে।

◆ জুমা কায়েম করার শর্তসমূহ

জুমার নামাজ তার সময়ের মধ্যে আদায় করা ওয়াজিব। আর জনপদের মধ্য হতে কমপক্ষে দুই বা তিন জন যেন উপস্থিত হয়। সালাতের পূর্বে দু'টি খুৎবা হতে হবে যাতে থাকবে আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর জিকির ও শুকরিয়া। আরো থাকবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও আল্লাহর তাকওয়ার অসিয়ত।

জুমার নামাজ যোহরের সালাতের জন্য যথেষ্ট। তাই জুমার পরে যোহরের নামাজ আদায় করা বিদা'আত। আর জুমার সালাতের হেফাজত করা ফরজ। যে ব্যক্তি অলসতা করে পরস্পর তিনটি জুমা ত্যাগ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

◆ **জুমার সালাতের জন্য গোসল করা ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার ফযীলত**

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَ خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ ـ

১. আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমার দিন জানাবতের গোসল করল। অতঃপর মসজিদে গেল সে যেন একটি উট কুরবানী করল। আর যে দ্বিতীয় মুহূর্তে গেল সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। আর যে তৃতীয় মুহূর্তে গেলে সে যেন একটি শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করল। আর যে চতুর্থ মুহূর্তে গেল সে যেন একটি মুরগি কুরবানী করল। আর যে পঞ্চম মুহূর্তে গেল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। অতঃপর যখন ইমাম সাহেব বের হয়ে আসেন তখন ফেরেশতাগণ জিকির শুনতে থাকেন।

(বুখারী হাদীস নং ৮৮১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাদীস নং ৮৫০)

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِىِّ (رضى) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

২. আওস ইবনে আওস শাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি জুমার দিন তার স্ত্রীকে গোসল করাল ও নিজে গোসল করল। অত:পর অন্যকে তাড়াতাড়ি করাল ও নিজেও সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে গেল এবং ইমামের নিকটে বসল ও কোন অনর্থক কাজ না করে ইমামের খুৎবা শুনলো। তার প্রতিটি চলার পদের সওয়াব রোযা ও তাহাজ্জুদ সম্মিলিত এক বছরের সমান নেকি বরাবর হবে।"

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৩৪৫, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১০৮৭)

জুমার গোসলের সময় : জুমার সালাতের জন্য গোসল করা ও যাওয়ার মুস্তাহাব সময় শুরু হয় ফজর থেকে। আর এ সময় জুমা আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে এবং জুমার জন্যে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোসল দেরী করা উত্তম।

◆ জুমারযাওয়ার উত্তম সময়

১. জুমার জন্য যাওয়ার উত্তম সময় আরম্ভ হয় সূর্য উঠার পর থেকেই। আর জুমার জন্য যাওয়ার ওয়াজিব সময় হলো ইমামের প্রবেশের পরে দ্বিতীয় আজানের সময়।

২. মুসলিম ব্যক্তি পাঁচটি মুহূর্ত জানার চেষ্টা করবে। সূর্য উঠা থেকে ইমাম বের হয়ে আসা পর্যন্ত সময়কে পাঁচ ভাগে ভাগ করবে যার দ্বার সে প্রতিটি মুহূর্ত জানতে পারবে।

◆ জুমার দিন সফর করার বিধান

কোন প্রয়োজন ব্যতীত দ্বিতীয় আজানের পরে জুমার দিনে সফর করা জায়েয নেই। প্রয়োজন যেমন : সঙ্গী বা পরিবহন গাড়ি বা জাহাজ বা বিমান ছুটে যাওয়ার ভয়।

আল্লাহর বাণী–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ছুটে আস। আর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার কর। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অবগত হতে। [সূরা জুমু'আ : আয়াত-৯]

◆ মাসবূক যখন জুমার নামাজের বিধান

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকায়াত জুমার নামাজ পাবে সে দ্বিতীয় রাকায়াত পড়ে জুমার নামাজ পূর্ণ করে নিবে। আর যে এক রাকায়াতের চেয়ে কম পাবে অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকায়াতের রুকু পাবে না সে যোহরের নিয়ত করবে এবং চার রাকায়াত নামাজ আদায় করবে।

◆ ইমাম জুমার জন্য যখন আসবেন

মুক্তাদিদের জন্য সুন্নাত হলো জুমা, ঈদ ও বৃষ্টির সালাতের জন্য সকাল সকাল আসা। আর ইমামের জন্য সুন্নাত হলো জুমা ও বৃষ্টির সালাতের জন্য খুৎবার সময় আর ঈদের জন্য সালাতের সময় আসা।

খুৎবা যেমন হবে : সুন্নাত হলো ইমাম সাহেব জুমার জন্য ছোট করে মুখস্ত খুৎবা দিবেন। আর যদি কাগজে লেখে খুৎবা দেন তবে তা তাঁর ডান হাতে ধরবেন। প্রয়োজন হলে ইমাম সাহেব লাঠি বা ধনুক কিংবা মেম্বারের দেওয়ালের উপর বাম হাত দ্বারা ঠেস বা হেলান দিবেন।

সুন্নত হলো যিনি ভালো আরবি জানেন তিনি জুমার দু'টি খুৎবা আরবিতে প্রদান করবেন। আর যদি উপস্থিত জনগণ আরবি না বুঝে, তবে তাদের ভাষা দ্বারা অনুবাদ করাই উত্তম। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে তাদের ভাষায় খুৎবা প্রদান করবেন। কিন্তু নামাজ আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় সঠিক হবে না।

মুসাফিরের প্রতি জুমা কি ওয়াজিব? যদি কোন মুসাফির এমন শহর হয়ে অতিক্রম করে যেখানে জুমা অনুষ্ঠিত হয় ও সে আজানও শুনে এবং সেখানে বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছা করে, তবে তার প্রতি জুমার নামাজ আদায় করা জরুরি হয়ে পড়বে। আর যদি তাদের নিয়ে খুৎবা দেয় ও জুমার নামাজ আদায় করে তবে সকলের নামাজও সহীহ হবে।

◆ জুমুআর 'খোৎবাহ' আরবী ভাষায় হওয়া কি অপরিহার্য? অন্য ভাষায় খোৎবাহ প্রদান জায়েয নয় কি?

কোনো কোনো গ্রন্থে 'খোৎবাহ' আরবি ভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয় বলা হয়েছে। এমনকি আরবি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা কোনো ধরনের উদ্ধৃতি দেয়াও মাকরূহ বলা হয়েছে। অন্য ভাষায় খোৎবাহ প্রদানকে মাকরূহ বলা এবং আরবি ভাষায় খোৎবাহ দেয়া অপরিহার্য বলার স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই, আছে যুক্তি অথবা প্রচলিত নিয়ম।

◆ মাতৃভাষায় 'খোৎবাহ' দান

পূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, খোৎবাহ ব্যতীত জুমুআর সালাত সহীহ হয় না। খোৎবাহ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ওয়াজিব। খোৎবা প্রদানকালে সব ধরনের কথা বলা না জায়েয। এমনকি সালাত পড়া, যিকর, তাসবীহ-তাহলীল পড়াও জায়েয নেই। খোৎবা মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রদান করতে হবে। মিম্বর না থাকলে লাঠিতে ভর করে অথবা কোনো কিছু দিয়ে একটু উঁচু করে নিতে হবে। বসে খোৎবাহ দেয়া মাকরূহ। খোৎবার উদ্দেশ্যে হলো, একজন মুসলমানের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে সতর্ক করা, নিষ্ক্রিয় ও আড়ষ্ট ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলে খিলাফতের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা। খোৎবাহ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান অপরিহার্য করার একমাত্র লক্ষ্য হলো শ্রোতাগণ বক্তার বক্তব্য নিবিষ্টমনে শুনে তদানুযায়ী আমল করা।

একজন অনারবী লোক তার ৮০ বছরের একটি জুমুআর সালাতও যদি তরক না করে থাকে এবং তার শ্রুত খোৎবার পরিমাণ যদি হয় (৮০ বৎসর ৫২ =) ৪১৬০টি। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, ৪১৬০টি খোৎবাহ্র মাধ্যমে তোমার কাছে লক্ষ লক্ষ উপদেশ নির্দেশ পৌঁছেছিল, তুমি তার কয়টি বাস্তবায়ন করেছ। লোকটি যদি আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি করে বলে, হে মহান আল্লাহ্! আমি একজন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান! ৪১৬০টি খোৎবাহ্ আমি তোমার অপার কৃপায় শুনেছি। কিন্তু খোৎবায় যে লক্ষ লক্ষ আদেশ উপদেশের কথা ইমাম সাহেব অত্যন্ত আবেগ নিয়ে আরবি ভাষায় পেশ করেছেন, তার কানাকড়িও আমি বুঝিনি। দুটি খোৎবাহ্র মাঝে মধ্যে বাংলা ভাষা বা অন্য ভাষায় ২/৪টি উদ্ধৃতি দিলেও ২/৪টি উপদেশমূলক কথা বুঝার যে সামান্যতম সুযোগ ছিল তাও মাকরূহ্ হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। আর যা আমার অজানা, অজ্ঞাত সেটা আমি কেমন করে বাস্তবায়িত করব? ঠুকনো যুক্তির ভিত্তিতে আরবি ভাষায় খোৎবাহ্ প্রদান বাঞ্ছনীয় হওয়ার প্রবক্তা যারা, তারা কৈফিয়ত প্রদানকারী ব্যক্তিকে আরবী ভাষা না শিখার জন্যে দায়ী করবেন, নাকি তাদের নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করবেন?

আশার কথা যে, আলেম সমাজের মাঝ থেকে গোঁড়ামী বা একগুঁয়েমীর প্রবণতা ধীরে ধীরে কমছে। বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে জুমুআর দিন মূল খোৎবা প্রদানের আগে ইমাম সাহেব মিম্বারে বসে ২০/২৫ মিনিটের জন্যে কিছু উপদেশের কথা বাংলা ভাষায় দিয়ে থাকেন। এই উপদেশগুলো আবার কেউ মিম্বরে না বসে মিম্বারের পাশেই দাঁড়িয়ে বলেন, এভাবে যে, তা যেনো মূল খোৎবাহ্ হওয়ার সাদৃশ্য কিংবা বিভ্রান্তি না ঘটে। এখানে লক্ষণীয় যে, উপস্থিত মুসল্লীগণ খোৎবাহ্র আগে ইমাম সাহেব যে কথাগুলো বলেন সেগুলো মাতৃভাষা বাংলা হওয়ায় হৃদয়ংগম করতে সক্ষম বিধায় তারা এগুলো অধীর আগ্রহে শুনেন। আর সালাতের খোৎবাহ্ আরবি হওয়ায় এগুলো বুঝে না। না বুঝার দরুণ খোৎবাহ্ শুনার প্রতি আগ্রহ থাকে না এবং শ্রবণ করার প্রয়োজনীয়তা ও অনুভব করে না। আর এটা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও স্বাভাবিক কথা যে, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্ভূত তার প্রতি মনোযোগ আর্কষণ করা সাময়িকের জন্য সম্ভব হলেও সব সময়ের জন্যে সম্ভব নয়।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমাম সাহেব সালাতের আগে ২য় আযানের পর যে দুটি খুৎবা মিম্বারে দাঁড়িয়ে প্রদান করেন সেটা হলো খোৎবাহ্। ইমাম সাহেব ২য় আযানের আগে মিম্বারে বসে কিংবা মিম্বারের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যে কথা বলেন,

সেটা হলো খিতাবাহ্ বা ওয়াজ নছিহত। জুমুআর খোৎবাহ্ প্রদান ওয়াজিব, খোৎবাহ্ শুনাও ওয়াজিব। পক্ষান্তরে খিতাবাহ্ বা খুৎবাহ্ পূর্ব ওয়াজ নছিহত করা ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছাধীন খিতাবাহ্ শ্রবণ করাও মুসল্লীদের জন্য ইচ্ছাধীন।

সুতরাং খিতাবাহ্ অর্থাৎ খোৎবাহ্ পূর্বে ইমাম সাহেব যে কথাগুলো বাংলা ভাষায় মুসল্লীগণের উদ্দেশ্যে পেশ করেন সেটা কখনো মূল খোৎবাহ্র বিকল্প হতে পারে না। এরূপ নিয়ম পালন করার প্রেক্ষিতে কেউ যদি মনে করেন যে, মূল খোৎবাহ্র বাংলা তরজমা হয়ে গেছে। সুতরাং আর খোৎবা দিতে হবে না, তাহলে এটা ঠিক হবে না। দ্বিতীয়ত তর্জমা শুনা ওয়াজিব যা আদৌ ঠিক নয়। শুধুমাত্র খোৎবাহ্র বাক্যগুলো শ্রবণ করাই মুসল্লীদের জন্যে জরুরি।

◆ খতিবের গুণাবলি

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুৎবা প্রদান করতেন তখন তার চক্ষু দু'টি লাল হয়ে যেত, আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর রাগ বেড়ে যেত। এমনকি যেন তিনি কোন সেনাদল থেকে ভয় প্রদর্শনকারী। তিনি বলতেন : তোমাদের সকাল ও তোমাদের বিকাল (এটা ভয় প্রদর্শনের কমান্ড)। (মুসলিম হাদীস নং ৮৬৭)

◆ ইমাম মিম্বরে আরোহণ প্রবেশ করে যা করবেন

তিনটি স্তর বিশিষ্ট মিম্বারে দাঁড়িয়ে ইমামের খুৎবা দেয়া সুন্নাত। ইমাম মসজিদে প্রবেশ করেই মিম্বারে উঠবেন এবং মুসল্লীদের সামনে করে সালাম দিবেন। এরপর মুয়াজ্জিনের আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকবেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে প্রথম খুৎবা প্রদান করবেন। এরপর বসবেন অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুৎবা প্রদান করবেন। আর কোন প্রয়োজনে খুৎবা বন্ধ করে আবার জারি রাখা জায়েয আছে।

খুৎবার পদ্ধতি : কখনো খুৎবাতুল হাজাত (বিয়ের খুৎবা) আবার কখনো অন্য খুৎবা দ্বারা আরম্ভ করবেন। খুৎবাতুল হাজাতের শব্দগুলো হচ্ছে–

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ، وَنَسْتَعِيْنُهٗ، وَنَسْتَغْفِرُهٗ، وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا،

◆ জুমার সালাতের সুন্নাত নামাজসমূহ

সুন্নাত হচ্ছে জুমার ফরজ সালাতের পর বাড়িতে দুই রাকায়াত সুন্নত নামাজ পড়া। যে ব্যক্তি মসজিদে জুমুআর নামাযের পর সুন্নত পড়তে চাইবে সে চার রাকাআত পড়বে। যদি তাড়াহুড়া থাকে তবে মসজিদে দুই রাকাআত পড়বে এবং বাড়ী গিয়ে দুই রাকাআত পড়বে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, হাদীস সহীহ) আর জুমার ফরজের পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত নেই; বরং যত রাকায়াত চাইবে তাই পড়বে।

◆ খুৎবা চলাকালীন কথা বলার বিধান

খুৎবারত অবস্থায় কথা বললে সওয়াব বিনষ্ট হবে ও পাপ সংযুক্ত হবে। সুতরাং ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় কোন প্রকার কথা বলা চলবে না। কিন্তু ইমাম ও প্রয়োজনে যিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন সে ব্যতীত। সালাম ও হাঁচির উত্তর দেয়া যাবে। উপকারার্থে খুৎবার পূর্বে ও পরে কথা বলা জায়েয। জুমার দিন ইমামের খুৎবারত অবস্থায় মানুষের কাঁধ পাড়া দিয়ে চলা হারাম। অনুরূপ ইমামের খুৎবা কালিন 'ইহতিবা' তথা পা ও পিঠ কাপড় বা হাত দ্বারা বেঁধে ঠেস দিয়ে বসা মাকরুহ। (আবু দাউদ হাদীস-১১১০; বুখারী হাদীস-৯৩৪; মুসলিম হাদীস-৮৫১)

◆ শহরে জুমার নামাজ কায়েম করার বিধান

শহরে বা গ্রামে শর্ত পূরণ হলে জুমা কায়েম করা যাবে তাতে দেশের রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতির প্রয়োজন নেই। আর একই শহরে একাধিক জুমা প্রয়োজন ছাড়া কায়েম করা জায়েয নেই। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতিক্রমে জায়েয আছে। জুমার নামাজ শহরে ও গ্রামে কায়েম করা যাবে কিন্তু বেদুঈন এলাকা ও মরুভূমিতে চলবে না।

◆ ইমামের খুৎবারত অবস্থায় কেউ প্রবেশ করলে যা করবে

জুমার দিন ইমামের খুৎবারত অবস্থায় যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে হালকা করে দুই রাকায়াত নামাজ পড়ে বসবে। আর যে মসজিদে বসা অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে তার জন্য সুন্নাত হলো স্থান পরিবর্তন করা।

(বুখারী হাদীস-৯৩০, ১১৭০; আবু দাউদ হাদীস-১১১৫, ১১১৬, ১১১৭)

◆ খুৎবা চলাকালীন দোয়া করার বিধান

খুৎবা চলাকালীন ইমাম ও মুক্তাদির জন্য দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করা জায়েয নেই। তবে ইমাম যদি বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন তবে তিনি হাত উঠাবেন ও মুক্তাদিগণও তাদের হাত উত্তোলন করবেন। আর দোয়াতে নিচু শব্দে আমীন আমীন বলা বৈধ আছে। (বুখারী হাদীস-৯৩৪; সহীহ মুসলিম হাদীস-৮৭৪)

মুস্তাহাব হলো ইমাম সাহেব তাঁর খুৎবাতে দোয়া করবেন। আর উত্তম হলো তিনি ইসলাম, মুসলমান ও তাদের হেফাজত এবং সাহায্য ও আপোষের অন্তরের মাঝে ভালোবাসা ইত্যাদির জন্য দোয়া করবেন। ইমাম সাহেব দোয়ার সময় তাঁর হাত না উঠিয়ে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবেন।

◆ দোয়া কবুলের উত্তম সময়

জুমার দিন আসরের পরে দিনের শেষভাগে দোয়া কবুলের আশা করা যায়। এ সময় বেশি বেশি দোয়া ও জিকির করা মুস্তাহাব। এ সময় দোয়া কবুল হওয়ার বড় উপযুক্ত সময়। এ মুহূর্তটি খুবই অল্প মাত্র।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ يَسْاَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ . وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ يُقَلِّلُهَا.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিনের কথা উল্লেখ করে বলেন : "জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে সময় কোন মুসলিম বান্দা দাঁড়িয়ে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দিবেন।" তিনি সে সময়ের স্বপ্ন তার প্রতি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন।"

(বুখারী হাদীস নং ৯৩৫ শব্দ তাইর ও মুসলিম হাদীস নং ৮৫২)

◆ জুমার সালাত ত্যাগ করার বিধান

যার জুমার নামাজ ছুটে যাবে সে যোহর চার রাকাত আদায় করে নিবে। যদি তার কোন ওজর থাকে তবে গুনাহগার হবে না। আর যদি কোন ওজর না থাকে তবে গুনাহগার হবে; কারণ সে জুমার সালাতের ব্যাপারে অবহেলা করেছে।

عَنْ اَبِى الْجُعْدِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ .

আবুল জা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতা করে তিনটি জুমা ত্যাগ করবে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। (হাদীসটি হাসান-সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস নং ১০৫২, তিরমিযী হাদীস নং ৫০০)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَاَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ .

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। জোহরের আগে ২ রাকায়াত পরে ২ রাকায়াত; মাগরিবের পরে ২ রাকায়াত, এশার পরে ২ রাকায়াত এবং জুমার পরে ২ রাকায়াত। তবে মাগরিব, এশা ও জুমার সুন্নাত নবী করীম ﷺ-এর সাথে তাঁর ঘরে আদায় করেছি।" (বুখারী হাদীস নং ৯৩৭ ও মুসলিম হাদীস নং ৭২৯)

২. সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা যা সর্বদা করণীয় না : আসর, মাগরিব ও এশার আগে ২ রাকাত করে। আসরের আগের ৪রাকাত নফলের হেফাজত করা সুন্নাত।

◆ সাধারণ নফল সালাতের বিধান

সাধারণ নফল রাত ও দিনে দুই দুই রাকাত করে আদায় করা বৈধ। তবে রাত্রে তা বেশি উত্তম।

◆ সর্বাধিক তাকিদযুক্ত সুন্নাত

সুন্নাত নামাজসমূহের মধ্যে সর্বাধিক তাকিদযুক্ত সুন্নাত হলো ফজরের সালাতের আগের দুই রাকায়াত সুন্নাত। তবে তা বেশি লম্বা না করে হালকাভাবে আদায় করাই সুন্নাত। প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাস পাঠ করবে।

◆ অথবা প্রথম রাকায়াতে

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ .

[সূরা বাকারা : আয়াত-১৩৬]

◆ ও দ্বিতীয় রাকায়াতে

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

[সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৬৪]

◆ আর কখনো কখনো এ আয়াত পাঠ করা সুন্নাত

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

[সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৫২]

এ সকল তাকিদযুক্ত সুন্নাত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) কোন ওজর বা কারণে আদায় করতে না পারলে তা কাযা করা সুন্নাত।

যদি কেউ ওযু করে কোন আজানের পরে মসজিদে প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ জোহরের আজানের পরে মসজিদে প্রবেশ করে এবং জোহরের আগের দুই রাকাত সুন্নাত, ওযুর সুন্নাত ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুন্নাত একসাথে নিয়ত করে শুধুমাত্র দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করে তবে তা যথেষ্ট হবে।

ফরজ নামাজ ও তার আগে বা পরের সুন্নাত সালাতের মাঝে যে কোন কথাবার্তা বলে বা স্থান পরিবর্তন করে নেয়া সুন্নাত।

এ সকল নফল নামাজগুলো মসজিদে বা ঘরে আদায় করা যেতে পারে। তবে ঘরে আদায় করাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلَاةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهٖ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ ـ

“--- হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে নামাজ আদায় কর; কেননা মানুষের উত্তম নামাজ হলো তার ঘরের নামাজ। কিন্তু ফরজ নামাজ ছাড়া।”

(বুখারী হাদীস নং ৭৩১, মুসলিম হাদীস নং ৭৮১, হাদীসের শব্দগুলো হুবহু বুখারীর)

২. আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : "নিশ্চয়ই রাত্রির শেষ অর্ধেক প্রতিপালক (আল্লাহ্) বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন। সুতরাং, যদি ঐ মুহূর্তের জিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার তবে হও; কারণ (তখনকার) সালাতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফেরেশতারা উপস্থিত ও শামিল হয় এ সময়ে।" (তিরমিযী হাদীস হাদীস-৩৫৭৯, নাসাঈ হাদীস হাদীস-৫৭২, ৫৫৭)

سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ الصَّلَاةِ اَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ : اَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

৩. নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়; ফরজ সালাতের পরে সর্বোত্তম (নফল) নামাজ কোনটি? তিনি ﷺ বলেন : "ফরজ সালাতের পরে সর্বোত্তম (নফল) নামাজ হলো মধ্য রাত্রের নামাজ।" (মুসলিম হাদীস নং ১১৬৩)

◆ রাত্রে দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ .

১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন– নিশ্চয়ই রাত্রিতে একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম ব্যক্তি সে মুহূর্তে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলকর কিছু আল্লাহ্র নিকট চাইলে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এটা প্রতিটি রাত্রেই আছে।

(মুসলিম হাদীস নং ৭৫৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِبَ لَهٗ؟ مَنْ يَسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهٗ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– প্রতিদিন রাত্রের যখন শেষের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন আমাদের রব (প্রতিপালক) দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন : কে আমার কাছে দু'আ করবে; আমি তার দু'আ কবুল করব? কে আমার কাছে কিছু চাইবে; আমি তা তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?

(বুখারী হাদীস নং ১১৪৫, মুসলিম হাদীস নং ৭৫৮, হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর)

মুসলিমের জন্য পবিত্র অবস্থায় দ্রুত এশার পরই শয়ন করা সুন্নাত; যাতে করে প্রফুল্লচিত্তে রাত্রের সালাতের জন্য জাগতে পারে। আর সুন্নাত হলো যখন মোরগের ডাক শুনবে তখন উঠবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّاَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার ঘাড়ের পিছনে শয়তান তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রত্যেক গিঁঠের স্থানে থাপ্পড় মেরে মেরে বলে, তোমার রাত অনেক দীর্ঘ, সুতরাং ঘুমাও। অতঃপর যদি সে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করে, তখন একটি গিঁঠ খুলে যায়। আর যখন ওযু করে তখন অপর একটি গিঁঠ খুলে যায়। অতঃপর যখন নামাজ আদায় করে তখন সর্বশেষ গিঁঠটিও খুলে যায়। তখন সে পবিত্র মন নিয়ে প্রফুল্লার সাথে সকাল করে। আর যদি তা না করে তাহলে খবিশ (নোংরা) মন নিয়ে অলসতার সাথে সকাল করে।" (বুখারী হাদীস-১১৪২, মুসলিম হাদীস-৭৭৬)

◆ **রাত্রির সালাতের সূক্ষ্ম বুঝ**

মুসলিমের উচিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হওয়া এবং তা ত্যাগ না করা। নবী করীম ﷺ রাত্রির কিয়াম করতেন এমনকি তাঁর পাদ্বয় ফেটে যেত।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ

سُئِلَتْ عَائِشَةُ (رضى) عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ : سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِى الْفَجْرِ -

আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রির নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন যে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ব্যতীত সাত, নয় এবং এগারো রাকায়াত।" (বুখারী হাদীস নং ১১৩৯)

৫. সুন্নাত হলো তাহাজ্জুদ নিজ ঘরে আদায় করা এবং নিজ পরিবারকেও জাগ্রত করা। আর কখনো কখনো পরিবারের সকলকে নিয়ে আদায় করা (তাদের ইমামতি করে জামায়াত করে আদায় করা।) তাহাজ্জুদ সালাতে সিজদা পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করার সময় পরিমাণ লম্বা করবে। ঘুম এসে গেলে শুয়ে পড়বে। লম্বা সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা এবং তাতে কেরাত লম্বা করা মুস্তাহাব। এক রাকায়াতে কুরআন থেকে এক পারা অথবা তার চেয়ে বেশি পাঠ করবে। কেরাত কখনো উচ্চস্বরে (স্বশব্দে) পড়বে আর কখনো চুপি চুপি (শব্দ ছাড়া) পড়বে। পড়ার সময় রহমতের আয়াত আসলে, আল্লাহর নিকট তা কামনা করবে। আর আজাব তথা শাস্তির আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে তা হতে পানাহ্ চাইবে। আর আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতার বর্ণনা হয়েছে এমন আয়াত আসলে তসবিহ পড়বে। (সুবহানাল্লাহ বলবে)।

৬. এরপর তাহাজ্জুদ নামাজ সমাপ্ত করবে বিতর নামাজ দিয়ে; কেননা, নবী করীম ﷺ বলেন–

اِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا -

তোমাদের বিতর নামাজকে রাত্রির শেষ নামাজ হিসেবে আদায় কর।
(বুখারী হাদীস নং ৯৯৮ ও মুসলিম হাদীস নং ৭৫১)

গ. বিতরের সালাত

বিতরের হুকুম : বিতর শব্দের অর্থ বিজোড়। বিতরের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (যা হাদীসের পরিভাষায় তাকিদযুক্ত সুন্নাত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসটিতে বিতরের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন–

اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

"বিতর প্রত্যেক মুসলিমের ওপর (আল্লাহর) হক (অধিকার)।"
(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস-১৪২২ হাদীসের শব্দগুলো আবূ দাউদের এবং নাসাঈ হাদীস-১৭১২)

◆ **বিতরের সময়**

এশার সালাতের পর থেকে প্রভাত (সুবহে সাদিক) পর্যন্ত বিতরের সময়। শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার ওপর আত্মবিশ্বাস থাকলে শেষ রাত্রে আদায় করা উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَاَوْسَطِهِ وَاٰخِرِهِ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ ـ

আয়েশা (রা) বলেন, বিতর সমস্ত রাত্রেই আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাত্রিতে বিতর আদায় করেছেন এবং অর্ধ রাত্রিতে, শেষ রাত্রিতেও আদায় করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিতরের আদায় শেষ রাত্রিতে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।" (বুখারী হাদীস-৯৯৬ ও মুসলিম হাদীস-৭৪৫, হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের)

◆ **সবচেয়ে কম ও বেশি বিতরের রাকায়াত সংখ্যা**

বিতরের নামাজ কমপক্ষে এক রাকায়াত আদায় করতে হবে। আর সর্বাধিক (১১) এগার অথবা (১৩) রাকায়াত। তবে তা দুই দুই রাকায়াত করে আদায় করবে এবং শেষে গিয়ে এক রাকায়াত পড়ে আগের আদায়কৃত নামাজগুলো বিজোড় করবে। উত্তম হলো কমপক্ষে তিন রাকাত আদায় করা, তা দুই সালামে হোক অথবা এক সালামে (অর্থাৎ– দুই রাকাত পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরাবে এবং পরে এক রাকায়াত আলাদা করে আবার দুই দিকে সালাম ফিরাবে।) অথবা দুই রাকাত পড়ার পর না বসে তিন রাকাত একই বৈঠকে আদায়ের পর দুই দিকে সালাম ফিরাবে। শেষে মাত্র একবার তাশাহ্হুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। আর এ তিন রাকায়াতের প্রথম রাকায়াতে সূরা আ'লা তথা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা কাফিরূন আর তৃতীয় রাকাতে সূরা 'এখলাস' তথা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করা সুন্নাত।

বিতরের নামাজ যদি পাঁচ রাকায়াত আদায় করতে চায়, তবে সবশেষে একবার তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে সালাম ফিরাবে। এভাবে সাত রাকাত পড়তে চাইলে তার আদায়ের নিয়মও একই। তবে সাত রাকায়াতের ক্ষেত্রে যদি সে ছয় রাকাত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসে তারপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে সপ্তম রাকায়াত আদায়ের পরে সালাম ফিরিয়ে তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلَاثٍ لَا اَدَعُهُنَّ حَتّٰى اَمُوْتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحٰى وَنَوْمٍ عَلٰى وِتْرٍ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে তিনটি অসিয়ত করেছেন! আমি তা মৃত্যু পর্যন্ত ত্যাগ করব না। প্রতি মাসে তিনটি রোজা, চাশতের নামাজ এবং বিতরের নামাজ পড়ে ঘুমানো।"

(বুখারী হাদীস নং ১১৭৮ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো বুখারীর, মুসলিম হাদীস নং ৭২১)

যদি কেউ নয় রাকায়াত বিতর আদায় করতে চায় তাহলে দু'বার আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। প্রথম বার আট রাকায়াত আদায়ের পরে বসে সালাম না ফিরিয়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে নবম রাকায়াতের জন্য উঠে যাবে। অতঃপর আবার বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো আট রাকায়াত পড়ে সালাম ফিরানো এবং পরে আলাদা ভাবে এক রাকায়াত পড়ে নেয়া। বিতর সালাতের সালামের পরে তিনবার (سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ) সুবহানাল্লাহিল মালিকিল কুদ্দূস (বলা সুন্নাত)। তৃতীয়বার বলার সময় মাদের সাথে স্বরধনি টেনে বলবে رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحُ রাব্বুল মালাইকাতু ওয়ার রুহ। (আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত হাদীস-১২৭৪-১২৭৫)

◆ বিতরের সময়

বিতরের নামাজ তাহাজ্জুদের পরে আদায় করবে। তবে যদি শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার আশংকা বোধ করে তাহলে ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায় করে নিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ خَافَ اَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَاِنَّ صَلَاةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذٰلِكَ اَفْضَلُ -

যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আশংকা বোধ করবে সে প্রথম রাত্রিতেই বিতর পড়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হওয়াতে আশাবাদী সে শেষ রাত্রিতে বিতর পড়বে; শেষ রাত্রির সালাতে ফেরেশতারা উপস্থিত হয় এবং সালাতে শামিল হয়। আর এটা উত্তম।"(মুসলিম হাদীস নং-৭৫৫)

যদি কোন ব্যক্তি প্রথম রাত্রিতে বিতরের সালাত পড়ার পর শেষ রাত্রিতে সালাতের জন্য জাগ্রত হয়, তাহলে বিতর ছাড়া দুই দুই রাকায়াত করে পড়বে; কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

لَا وِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ -

"এক রাত্রিতে দুই বিতর নেই।"(আবূ দাউদ হাদীস নং ১৪৩৯. তিরমিযী হাদীস নং ৪৭০)

◆ বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার বিধান

কখনো কখনো বিতরের সালাতে দোয়া কুনূত পড়তেও পারে; আবার না্ও পড়তে পারে। তবে পড়ার চেয়ে অধিকাংশ সময় না পড়াই উত্তম। নবী করীম ﷺ থেকে সর্বদা বিতরের সালাতে দোয়া কুনূত পড়ার প্রমাণ নেই।

◆ বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার পদ্ধতি

যদি তিন রাকাত বিতর আদায় করে তাহলে তৃতীয় রাকাতের রুকুর পরে অথবা রুকুর আগে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া কুনূত পড়বে, যাতে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা এবং নবী করীম ﷺ এর প্রতি দরূদ থাকবে। অতঃপর হাদীসে এসেছে এমন কোন দোয়া পড়বে। নিম্নোক্ত দোয়াটি কুনূতের দোয়া যা রাসূল ﷺ আলী (রা)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে সাধারণত দোয়ায় কুনূত রুকুর পূর্বে পড়া ও কুনূতে নাযেলা রুকুর পরে পড়া বিশুদ্ধতম পথ। যা সহীহ বুখারীতে আনাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া 'আফিনী ফীমান আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইত, ওয়া বারিক লী ফীমা আ'ত্বাইত, ওয়াকিনী শাররা মা ক্বাদাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বদী ওয়ালা ইউক্দা 'আলাইকা, ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিললু মাওঁ ওয়ালাইতা, তাবারকতা রব্বনা ওয়া তা'আলাইত।"

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস নং ১৪২৫, তিরমিযী হাদীস নং ৪৬৪)

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যাকে হেদায়েত দান করেছ তাদের মধ্যে আমাকেও হেদায়েত দান কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপদ রাখ। তুমি যাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছ তাদের মধ্যে আমার সাথেও বন্ধুত্ব কর। আমাকে তুমি যা দান করেছ তাতে তুমি বরকত দান কর। তুমি যা ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর; কেননা তুমিই ফয়সালা কর, তোমার ওপর কেউ ফয়সালা করতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব কর সে কখনও বেইজ্জত হয় না। হে আমাদের রব ! (প্রতিপালক) তুমি বরকতময় ও সুউচ্চ।

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِهْدِنِىْ – আমাকে হেদায়াত দান করুন, فِيْمَنْ هَدَيْتَ – যাকে তুমি হেদায়াত দান করেছি তাদের মধ্যে, وَعَافِنِىْ – আমাকে নিরাপদ রাখ, فِيْمَنْ عَافَيْتَ – তুমি যাকে নিরাপদ রেখেছে তাদের মধ্যে وَتَوَلَّنِىْ – আমার সাথে বন্ধুত্ব কর, فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ – যার সাথে তুমি বন্ধুত্ব করেছ, وَبَارِكْ لِىْ – আমাকে বরকত দান করো, فِيْمَا اَعْطَيْتَ – যা তুমি আমাকে দিয়েছ তাতে, وَقِنِىْ – আমাকে রক্ষা করো, شَرَّمَا قَضَيْتَ – তুমি যা ফয়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে, فَاِنَّكَ تَقْضِىْ – কেননা, তুমি ফয়সালা কর, وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ – তোমার ওপর কেউ ফয়সালা করতে পারে না, وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ – নিশ্চয় সে কখনো বেইজ্জত হয় না, مَنْ وَالَيْتَ – তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব করেছ, تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ – আমাদের রব তুমি সুউচ্চ ও সুমহান।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ - اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তা'ইনুকা, ওয়া নাস্ তাগ্ফিরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাতা ওয়াক্কালু আলাইকা, ওয়ানুস্নী আলাইকাল খাইর, ওয়া নাশকুরুকা, ওয়ালা নাক্ফুরুকা, ওয়া নাখলাউ ওয়া নাত্রুকু মাইয়াফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লী, ওয়ানাস্জুদু ওয়া ইলাইকা নাস্আ ওয়া নাহ্ফিদু ওয়ানারজু রাহামাতাকা ওয়া নাখ্শা আযা-বাকা, ইন্না আযা-বাকা বিল্কুফ্ফা-রি মুলহিক্ব।" (তাবারানী ও বায়হাকী)

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমরা আপনার সাহায্য চাই, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার প্রতি ঈমান রাখি, আপনার ওপর ভরসা করি, আর আপনার উত্তম গুণগান করি, আপনার শুকরিয়া আদায় করি, আপনার নাশুক্রী করি না, যে আপনার নাফরমানী করে (গুনাহের কাজ করে) আমরা তাকে ত্যাগ করি, বর্জন করে চলি। হে আল্লাহ্! আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, আপনার

জন্যই সালাত পড়ি, আপনাকেই সিজদা করি, আর আপনার সন্তুষ্টি তালাশের জন্য দ্রুত অগ্রসর হই, আর আপনার রহমতের আশা রাখি, আর আপনার আযাবকে ভয় করি, নিশ্চয়ই আপনার আযাব কাফিরদের জন্য অবধারিত।

১. সমাজে আমরা যে দোয়া কুনূতটা পড়ি তা বায়হাকী ও তাবরানী শরীফে আছে। তার সনদ ও দুর্বল। তাছাড়া তাও দু তিনটা হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশের সমন্বয়। তাই এটার সনদ দুর্বল হওয়ার এটাও অন্যতম কারণ।

২. প্রচলিত দোয়া কুনূতে যা পড়ি। তার মধ্যে আল্লাহর সাথে বেশ কিছু ওয়াদা করছি।

আমরা আপনার শুকরিয়া আদায় করছি, আপনার প্রতি কুফুরী করব না, যে আপনার নাফরমানী করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি, আমরা আপনার জন্যই সালাত পরি, আপনাকে সিজদা করি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ ওয়াদা নামাজের পর আমরা তার বিরোধিতা করছি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রথমটির মধ্যে এ জাতীয় কোন ওয়াদা নেই। তাই প্রথমটির মধ্যে হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। সূতরাং প্রথমটিই পড়া যৌক্তিক।

দোয়া কুনূতে অন্যান্য সাব্যস্ত দোয়াও বাড়াতে পারে; তবে বেশি দীর্ঘ করবে না। সাব্যস্ত দোয়াসমূহের মধ্যে রয়েছে–

١. اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىْ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىْ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

“আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লী দ্বীনি আল্লাযী হুয়া 'ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ্ লী দুনইয়ায়া আল্লাতী ফীহা মা'আশী, ওয়া আসলিহ্ লী আখিরাতি আল্লাতী ফীহা মা'আদী। ওয়াজ'আলিল হায়াতা জিয়াদাতান লী ফী কুল্লি খাইর, ওয়াজ'আলিল মাওতা রাহাতান লী মিন কুল্লি শাররি।” (মুসলিম হাদীস নং ২৭২০)

১. “তুমি আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দিও, যে দ্বীনে আমার সকল বিষয়াদির সংরক্ষণ নিহিত আছে। তুমি আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দিও, যে দুনিয়াতে আমার জীবন-যাপন নিহিত আছে। তুমি আমার আখেরাতকে সংশোধন করে দাও, যে আখেরাতে আমার গন্তব্যস্থল (পরকাল) নিহিত আছে। প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের জন্য আমার জীবনকে বৃদ্ধি করে দাও। আর মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে শান্তিদানকারী করে দাও।”

٢. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا ـ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল 'আজ্যি ওয়া কাসাল, ওয়ালজুব্নি ওয়াল বুখ্ল, ওয়াল হারামি ওয়া 'আযাবিল ক্বর। আল্লাহুম্মা আতি নাফসী তাকওয়াহা, ওয়া জাক্কিহা আনতা খাইরু মান্ জাক্কাহা, আন্তা ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন্ ইল্মিল লা ইয়ানফা', ওয়া মিন ক্বল্বিন লা ইয়াখশা', ওয়া মিন্ নাফ্সিন লা তাশবা', ওয়া মিন্ দা'ওয়াতিন লা ইউসতাজাবু লাহা।" (মুসলিম হাদীস নং ২৭২২)

২. অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা (সাহসহীনতা) থেকে এবং (অতি) বার্ধক্য ও কবরের আজাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার মনে তাক্বওয়া (আল্লাহর ভয়) দান কর এবং তা পবিত্র কর; কারণ সর্বোত্তম পবিত্রকারী ও তুমিই মনের অভিভাবক এবং তুমিই তার মনিব। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি এমন বিদ্যা হতে যা উপকারে আসে না, এমন অন্তর হতে যা বিনয়ী হয় না, এমন মন হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া হতে যা কবুল হয় না।"

◆ **অত:পর বিতর সালাতের শেষে বলবে**

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ اَحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ـ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদাকা মিন্ সাখাতিক, ওয়া আউযু বিমু'আফাতিকা মিন্ 'উকূবাতিক্। ওয়া আ'উযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্সী ছানায়ান 'আলাইকা আন্তা কামা আছনাইতা 'আলা নাফসিক্।"

(আবূ দাউদ হাদীস নং ১৪২৭, হাদীসের হুবহু শব্দগুলো আবূ দাউদের, তিরমিযী হাদীস নং ৩৫৬৬)

শাব্দিক অর্থ : اَعُوْذُ بِرِضَاكَ – হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সন্তুষ্টি দ্বারা, مِنْ سَخَطِكَ – তোমার অসন্তুষ্টি থেকে, وَاَعُوْذُ – আরো আশ্রয়

প্রার্থনা করছি, بِمُعَافَاتِكَ – তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে, مِنْ عُقُوبَتِكَ – তোমার আযাব থেকে, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ – এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার মাধ্যমে, لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ – তোমার প্রশংসা করার সম্ভব নয় আমার দ্বারা, أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ – যেমনটি প্রশংসা তুমি তোমার করেছ।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তোমার মাধ্যমে তোমার (পাকড়াও) থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করছি। তোমার প্রশংসা গণনা করা সম্ভব নয় যেমনটি প্রশংসা তুমি তোমার করেছ।"

অত:পর দোয়া কুনূতের শেষে নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করবে। দোয়া কুনূত ও অন্যান্য দোয়া শেষে দুই হাত মুখমণ্ডলে মুছবে না। কেননা দুহাত মুখমণ্ডলে মুছার সহীহ দলিল নেই।

দোয়া কুনূত বিতরের সালাত ছাড়া অন্য স্থানে পড়া মাকরূহ (অপছন্দনীয়)। তবে হ্যাঁ, যদি মুসলিম সমাজ কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয় তখন কুনূতে নাজেলার দোয়া পড়া সুন্নাত। তাই ইমাম সাহেব কুনূতে নাযেলা ফরজ নামাজসমূহে শেষ রাকাতে রুকুর পরে দোয়া কুনূত পড়বে।

মুসলিম সমাজের ওপর বিপদ দূর করার জন্য যে দোয়া কুনূত পড়া হবে তাতে দুর্বল মুসলিমগণের সাহায্যের জন্য দোয়া করা হবে অথবা জালিম কাফিরদের জন্য বদদোয়া করা হবে অথবা উভয় দোয়াই করা হবে। (আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস-১২৯০)

কোন মানুষের তার সর্বোত্তম নামাজ হলো তার ঘরে আদায়কৃত নফল নামাজ। তবে ফরজ নামাজ ও যে সমস্ত নফলের জামায়াত আছে সে গুলো জামায়াতের সাথে মসজিদে আদায় করবে। যেমন, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ, তারাবির নামাজ ইত্যাদি।

◆ সফরে বিতর পড়ার বিধান

যে ব্যক্তি সফরে থাকবে সে বিতর নামাজ যানবাহনে আরোহণ অবস্থাতেই আদায় করতে পারবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে যখন বাহনটি বা যানবাহনটি কিবলার দিকে ফিরবে তখন তাকবিরে তাহরীমা বাঁধবে। আর তা সহজে সম্ভব না হলে যে দিকে তার বাহন আছে সে দিকেই চেহারা করেই নিয়ত বাঁধতে পারবে। বিতরের সালাতের পরে বসে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা সুন্নাত। তবে যখন রুকু করবে দাঁড়িয়ে রুকু করবে।

◆ বিতর সালাতের কাযার পদ্ধতি

যে ব্যক্তি বিতরের নামাজ আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়বে অথবা আদায় করতে ভুলে যাবে সে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে অথবা যখন তার স্মরণ হবে তখন তা আদায় করে নিবে। যদি ফজরের আজান ও একামতের মাঝের সময়ে আদায় করে তাহলে বিতর সালাতের স্বাভাবিক নিয়মেই তা আদায় করবে। আর যদি দিনে আদায় করে তাহলে রাকায়াত বিজোড় সংখ্যায় আদায় না করে জোড় আদায় করবে। উদাহরণস্বরূপ যদি সে রাত্রে বিতর এগারো রাকায়াত আদায় করার অভ্যস্ত হয়, তাহলে দিনে তা বারো রাকাত আদায় করবে। ঠিক এভাবে অন্যান্য সংখ্যার বেলায়ও জোড় আদায় করবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ اَوْ غَيْرِهِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি ব্যথা বা অন্য কোন কারণে রাত্রের নফল নামাজ আদায় করতে না পারতেন, তাহলে তিনি দিনে বারো রাকায়াত আদায় করতেন।" (মুসলিম হাদীস নং ৭৪৬)

নোট : বিতরের নামাজের কুনূত আর কুনূতে নাজেলা এক নয়। নিম্নে কুনূতে নাযেলাটি দেয়া হলো।

◆ কুনূতে নাযেলা

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাতীয় যে কোন দূর্যোগ মুহূর্তে তা থেকে নাজাতের জন্য ফজরের ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকায়াতের রুকু থেকে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের নিয়ে নিম্নোক্ত দোয়াসমূহ পড়তেন। অতঃপর দুই সিজদাহ শেষ করে শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাতেন।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِىْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا وَاَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ فَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ

شُرُوْرِهِمْ ـ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ، اَللّٰهُمَّ اَهْلِكْهُمْ كَمَا اَهْلَكْتَ عَادًا وَّثَمُوْدًا وَخُذْهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ـ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَاْسَكَ الَّذِيْ لَاتَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান ভাই বোনেরা আজ মহাসংকটের সম্মুখীন। ইসলামের চিরশত্রু ইহুদী-নাসারা শক্তি আজ একত্রিত হয়ে ইসলামী মূল্যবোধ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু করেছে। ওরা মুসলিম জাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এহেন জাতীয় বিপদকালে আমাদের প্রিয় নবী করীম ﷺ ফজরের ফরয নামাযের সাথে "কুনূতে নাযেলা" নামক একটি বিশেষ দোয়া পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালার রহমত কামনা করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই এই দোয়া দুনিয়ার সকল মুসলমানের মধ্যেই প্রচলিত আছে। আসুন! এ দোয়াটি আমল করে নাজাতের পথ খুঁজি। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ ও মুসনাদে আহমদ শরীফ থেকে সংকলিত)

উমর (রা) রুকূর পরে কুনূতে (না-যিলা) এ দু'আ পড়েছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَاْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লানা ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি। ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমা-তি। ওয়াআল্লিফ বাইনা কুলূবিহিম। ওয়াআসলিহ্ যা-তা বাইনিহিম ওয়ানআনসুরহুম 'আলা- 'আদু-উইকি। ওয়া'আদু-উইহিম। আল্লা-হুম্মাল'আনিল কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াসুদ্দূনা 'আন সাবীলিকা।

ওয়াইউকায্যিবূনা রুসূলাকা। ওয়াইউকা-তিলূনা আউলিয়া-আকা। আল্লাহুম্মা খা-লিফ বাইনা কালিমাতিহিম। ওয়াযালযিল আক্‌দা-মাহুম। ওয়াআনযিল বিহিম বা'সাকাল্লাযী লা–তারুদ্দুহূ 'আনিল ক্বাওমিল মুজরিমীন।

শব্দার্থ অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, اغْفِرْلَنَا - আমাদের ক্ষমা করে দাও, وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ - এবং মুমিনদের ক্ষমা করে দাও, وَالْمُؤْمِنَاتِ - এবং মুমিন নারীদের ক্ষমা করে দাও, وَالْمُسْلِمِيْنَ - এবং মুসলিম পুরুষদের ক্ষমা করে দাও, وَالْمُسْلِمَاتِ - এবং মুসলিম নারীদের ক্ষমা করে দাও, وَاَلِّفْ - ভ্রাতৃত্ব তৈরি করে দাও, بَيْنَ - মধ্যে, قُلُوْبِهِمْ - তাদের হৃদয়ে, وَاَصْلِحْ - আর সংশোধন করে দাও, ذَاتَ بَيْنِهِمْ - তাদের মধ্যে, وَانْصُرْهُمْ - এবং তাদেরকে সাহায্য কর, عَلٰى - উপর, عَدُوِّكَ - তোমার শত্রুর, وَعَدُوِّهِمْ - এবং তাদের শত্রুদের, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, الْعَنْ - অভিসম্পাত কর, الْكَفَرَةَ - ঐ সকল কাফিরদের প্রতি, اَلَّذِيْنَ - যারা, يَصُدُّوْنَ -বাঁধা দেয়, عَنْ - হতে, سَبِيْلِكَ - তোমার রাস্তা, وَيُكَذِّبُوْنَ- মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, رُسُلَكَ - তোমার রাসূলকে, وَيُقَاتِلُوْنَ - এবং তারা হত্যা করে, اَوْلِيَائَكَ- তোমার বন্ধুদেরকে, اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ!, خَالِفْ - বিরোধিতা সৃষ্টি করে দাও, بَيْنَ - মধ্যে, كَلِمَتِهِمْ - তাদের কথা, وَزَلْزِلْ - এবং টলমলে করে দাও, - بِهِمْ- তাদের সাথে, اَقْدَامَهُمْ - তাদের পাগুলো, وَاَنْزِلْ - নামিয়ে দাও, بِهِمْ - তাদের সাথে, بَاْسَكَ - বিপদ, الَّذِىْ - যা, لَا تَرُدُّهٗ - তুমি সরিয়ে দাও না, عَنِ - থেকে, الْقَوْمِ- সম্প্রদায়, الْمُجْرِمِيْنَ - পাপচারী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা কর এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের এবং মুসলিম পুরুষ ও নারীদেরও মাফ করে দিও। আর তাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিও এবং তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দিও । আর তাদেরকে তুমি তোমার দুশমন এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! যারা তোমার পথ থেকে (লোকদের) বিভ্রান্ত করে এবং তোমার রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলে আর তোমার বন্ধুদের সাথে লড়াই করে সেই সব কাফিরদের উপর তুমি অভিসম্পাত বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! তুমি তাদের কথার মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করে দাও এবং তাদের পা-গুলো টলমলে করে দাও আর তাদের মধ্যে তুমি তোমার এমন বিপদ নামিয়ে দাও যা তুমি পাপাচারী সম্প্রদায় থেকে সরিয়ে দাও না।

(বায়হাকী ২য় খণ্ড ২১০-২১১ পৃ:)

ঘ. তারাবীর সালাত

১. 'তারাবীহ' আরবি শব্দ (تَرْوِيْحَةٌ) 'তারবিহাতুন' এর বহুবচন : শব্দটির অর্থ ক্ষণিকের জন্যে বিশ্রাম নেয়া। হাদীসে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। হাদীসে এ সালাতকে 'কিয়াম ফি রমাযান' রমযান মাসের রজনীতে দাঁড়ানো নামে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের নবী করীম ﷺ রমযানের রাতে প্রতি ৪ রাকায়াত সালাতের পর ক্ষণিক বিশ্রাম নিতেন বিধায় পরবর্তী সময়ের ফকীহগণ এ সালাতের নামকরণ করেন তারাবীহ সালাত।

২. তারাবীহ সালাত আদায়ের সময় : তারাবীহ সালাত শুধুমাত্র রমযান মাসে পড়তে হয়। ইশার সালাতের পর থেকে ফজর সালাতের পূর্ব পর্যন্ত এ সালাত পড়া যায়। ইশার সালাতের পর বিতরের আগে পড়া উত্তম।

৩. তারাবীহ সালাত আদায়ের শরঈ বিধান : রমযান মাসের রাতে তারাবীহ সালাত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ একথা বলেছেন ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফিঈ (র), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ। তাঁরা ওমর (রা) জামায়াতসহ তারাবীহ আদায়ের স্বীকৃতি দলিলরূপে উপস্থাপন করে থাকেন।

ইমাম মালিক (র) ও অন্যান্য ইমামগণ তারাবীহ সালাতকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলতে দ্বিমত পেশ করেছেন। কেননা আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজার বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসের ৭ দিন অবশিষ্ট থাকতে এ সালাত পড়িয়েছেন। তাও ৪ দিন পড়িয়ে তিনি আর এ সালাত পড়াননি। বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে এ কথারও বর্ণনা আছে যে, সাহাবাগণ তাঁর সাথে এ সালাত আদায় করতে আসলে তিনি বললেন : এ সালাত সম্পর্কে আমি তোমাদের তৎপরতা লক্ষ্য করছি। আমার আশংকা হয়, এ সালাত তোমাদের ওপর ফরজ না হয়। যদি ফরজ হয় তা হলে তোমরা পালন করতে পারবে না। তোমরা ঘরে চলে যাও। "ঘরে সুন্নাত পড়া উত্তম।" তিনি এ সালাতের জন্যে উৎসাহিত করতেন কিন্তু তাগিদ দিতেন না। (মুসলিম)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِاَنْ يَّاْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًاوَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ

৪. তারাবীহ সালাতের রাকায়াত সংখ্যা ও জামায়াতসহ আদায় করা : এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝার জন্যে তারাবীহ সালাতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা দরকার। এ সালাতের ইতিহাস ৪টি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন–

১. নবী আলাইহিস সালামের স্তর, ২. ওমর (রা)-এর স্তর,

৩. সাহাবা ও তাবেঈদের যুগ এবং ৪. চার ইমামের স্তর।

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ের তারাবীহ : নবী করীম ﷺ তারাবীহ্ সালাত আদায়ের জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ

অর্থাৎ : মহান আল্লাহ রমযান মাসে তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করেছেন, আর আমি রাতের দাঁড়ানোকে (তারাবীহ্) তোমাদের জন্য সুন্নাত করে দিয়েছি। যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবসহ (আত্মসমালোচনা) রোযা রাখবে, সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে সদ্যজাত শিশুর মতো পবিত্র করে দিবেন।

(নাসায়ী হাদীস-২২১০, ২২০৮, ২২০৯; হাদীস দুর্বল)

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুয়াত্তায় আছে, রাসূলের সালাত আদায়ের ধারা তাঁর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা) এমনকি ওমর এর (রা) শাসনামলের ১ম দিক পর্যন্ত চলতে থাকে। আয়েশা (রা) থেকে রাসূলের ৩ রাত তারাবীহ জামায়াতসহ আদায়ের কথা বর্ণিত আছে। ১ম রাতে রাতের এক-তৃতীয়াংশে, ২য় রাতে অর্ধেক এবং ৩য় রাতে সাহরী পর্যন্ত।

(বুখারী ১ম খণ্ড পৃ: ২৬৯)

আবু যর (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, রমযানের ২৩তম রাতে ১/৩, ২৫তম রাতে ১/২ এবং ২৭তম রাতে সাহরী পর্যন্ত জামায়াতে তারাবীহ্ আদায় করেছেন।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) এবং আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে এক রাতের কথা আছে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

উপরিউল্লিখিত বর্ণনায় জামায়াতের কথা বর্ণিত হলেও রাকায়াতের সংখ্যার কথা উল্লেখ হয়নি। ২০ রাকায়াতের যে কথা ইবনে আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, তা উসূলে হাদীসের মানদণ্ডে বিশুদ্ধ নয়। আল্লামা শাওকানী তাঁর রচিত নাইনুল আওতার গ্রন্থে লিখেছেন–

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে একথা প্রমাণিত হলো যে, রাকায়াতের সংখ্যা যাই হোক জামায়াতসহ কিংবা জামায়াত বিহীন তারাবীহ্ সালাত আদায় শরীয়তের নির্দেশ।

মুয়াত্তায়ে মালিকে সায়িব ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : খলীফা ওমর (রা) উবাই ইবনে কাব এবং তামীমে দারীকে রমযান মাসে লোকদেরকে (বিতরসহ) ১১ রাকায়াত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন। অতএব, তিনি শত আয়াতের কিরাত দিয়ে আমাদেরকে সালাত পড়াতেন। এতো লম্বা কিয়ামের কারণে আমরা শেষ পর্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হই। ফজরের কাছাকাছি সময়ে এ সালাত শেষ হতো।

এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ৮ রাকায়াত তারাবীহ্ সালাত পড়া সহীহ।

২. ওমর (রা)-এর সময়ের তারাবীহ্ : ওমর (রা) তাঁর খেলাফতের ২য় বছর অর্থাৎ ১৪ হিজরী সনে ২/৪ জনের পৃথক পৃথক জামায়াতকে একত্রে এক ইমামের ইকতিদায় আদায় করার ব্যবস্থা করে দেন।

(বুখারী ১ম খণ্ড পৃ: ২৬৯, তারিখে ইবনে সামীর খ: ১ পৃ. ১৮৯)

এ সময়ে তারাবীহ্ সালাতের সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়–

১. ইবনে আবদুল বার বলেন, ওমর (রা)-এর সময় তারাবীহ ২৩ রাকায়াত পড়া হতো। ২০ রাকয়াত তারাবীহ্ এবং ৩ রাকায়াত বিতর।

২. সায়িব (রা)-এর শিষ্যগণ তারাবীহ্ সালাত ২০ রাকায়াত হওয়ার মতো ব্যক্ত করেছেন। (আসরারুস সুনান, তোহফাতুল আহওয়ায, নাসবুর রাইয়াহ)

ইবনে হাজর আসকালানী ফাতহুল বারীতে এবং আল্লামা শাওকানী নাইলুল আওতারে ২০ রাকায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিক তা মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন। সেখানেও ২০ রাকায়াতের কথা উল্লেখ আছে। সুনানে কুবরায় একথাও লিখা আছে যে, ওমর (রা)-এর সময় লোকেরা ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়তেন। দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর বিধায় ওসমান (রা)-এর সময়ে লোকেরা লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতেন।

হাফিজ ইবনু হাজর আসকালানী তার ফাতহুল বারীতে লিখেছেন–

ইমাম মালিক ইয়াযীদ ইবনে হুযাইফা থেকে এবং তিনি সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে ২০ রাকায়াত সালাতের আলোচনাই বর্ণনা করেছেন।

(ফাতহুল বারী খ. ৪ পৃ. ২৫৩)

ইমাম শাওকানী লিখেছেন–

ইয়াযীদ ইবনে হুযাইফার উপরোক্ত বর্ণনা ইমাম মালিক (রা) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং ২০ রাকায়াতের কথা বলেছেন। (নাইলুল আওতার খ. ৩ পৃ. ৫৩) তাঁর শামনামলে ১১ রাকায়াত (মুয়াত্তায়ে মালিক পৃ. ৯৮), ১৩ রাকায়াত (ফাতহুল বারী খ. ৪ পৃ. ২৫৪) এবং ২১ রাকায়াত (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক খ. ৪ পৃ. ২৬০) তারাবীহ্ সালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। সায়িব (রা)-এর ৩য় ছাত্র মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ উপরোক্ত কথাগুলোর বর্ণনাকারী। হাদীসের মৌল সূত্র অনুসারে একই রাবীর একই বিষয়ে পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করা বিশুদ্ধ হওয়ার অন্তরায়। সুতরাং ২০ রাকায়াতের অভিন্ন মত গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত।

তবে ইমাম বায়হাকী সমন্বয়সূচক কথা লিখেছেন এভাবে তাঁরা (সাহাবীগণ) প্রথমে ১১ রাকায়াত পড়তেন। তারপর ১৩, অতঃপর ২০ রাকায়াত তারাবীহ্, ৩ রাকায়াত বিতর পড়ার নিয়ম প্রচলন করেন।

ইমাম তিরমিযী লিখেছেন বিতরসহ ৩৬ ও ৪১ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ারও কথা আছে। এ মতের প্রবক্তা মদীনাবাসীগণ, তবে অধিকাংশগণ ২০ রাকায়াত পড়তেন।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, আমি আমার শহর মক্কায় লোকদেরকে ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ সালাত আদায় করতে দেখেছি। (তিরমিযী : খ. ১. পৃ. ৯৯)

ইবনে কুদামাহ, ইমাম কুরতবী তাদের গ্রন্থে ২০ রাকায়াতের কথা লিখেছেন। ইমাম মহিউদ্দিন নববী, আল্লামা শিহাব কাস্তালানী, শায়খ মানজুর ইবনে ইউনুস ২০ রাকায়াতের কথা বলেছেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) হুজ্জাতুলাহিল বালেগায় লিখেছেন, সাহাবীগণ ও পরবর্তী আলেমগণ রমযানে ৩টি কাজ নির্ধারণ করেছেন– ১. তারাবীহের জন্যে মাসজিদে একত্রিত হওয়া ২. রাতের ১ম ভাগে আদায় করার ব্যবস্থা করা ৩. ২০ রাকায়াত নির্ধারণ করা। (২য় খণ্ড ১৮ পৃ.)

৩. সাহাবা ও তাবেঈদের যুগের তারাবীহ : ২য় খলিফা ওমর (রা)-এর যুগে তারাবীহ্ সালাত ২০ রাকায়াত আদায়ের যে প্রচলন আরম্ভ হয়, পরবর্তী সময়ে সাহাবী ও তাবেঈগণ তা বলবৎ রাখেন। অনেক সাহাবা এবং তাবেঈন ২০ রাকায়াতের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা ৮ রাকায়াতের বর্ণনা করেননি।

ইবনে মাসউদ (রা) ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করেছেন। ইবনে তাইমিয়াও ২০ রাকায়াত তারাবীহ সালাত হওয়ার কথা প্রমাণ করেছেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ খ. ৪ পৃ. ২২৪) ইমাম যাহাবী ও ইবনে তাইমিয়ার মত সমর্থন করেছেন।

আমর ইবনে কয়িস, আল্লামা ইবনুর তুরফুসানী, সাতির ইবনে শিকাল, সাওয়িদ ইবনে গাফলাহ্ প্রমুখ তাবিঈগণ ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করতেন। হারিস আব্দুর রহমান ইবনে আবি বাকরা, আবুল বুখতারা, আতা, আলী ইবনে বুশায়াহ্ প্রমুখ ২০ রাকায়াত আদায় করতেন।

৪. চার ইমামের মতামত

১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র) প্রমুখদের মতে তারাবীহ্ সালাতের রাকায়াত সংখ্যা ২০।

২. ইমাম মালিকের (রা) এক বর্ণনায় ২০ রাকায়াত এবং অপর বর্ণনায় তিনি ৩৬ রাকায়াতের কথা বলেছেন।

ইবনে রুশদ মালেকী বিদায়াতুল মুজতাহিদে লিখেছেন–

রমযানের পঠিত সালাতের মোট রাকায়াত সংখ্যা নিয়ে আলেমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালিকের এক বর্ণনা মতে এবং ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং দাউদে জাহেরী প্রমুখ বিতর ছাড়া তারাবীহ্ সালাত ২০ রাকায়াতের কথা বলেছেন। ইবনে কাসিম ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি ৩৬ রাকায়াত তারাবীহ্ এবং ৩ রাকায়াত বিতর পড়া পছন্দ করতেন।

ইমাম মহিউদ্দীন নববী (র) লিখেছেন–

আমাদের (শাফিঈর) মতে তারাবীহের সংখ্যা ২০, দশটি সালামের সাথে বিতর আলাদাভাবে আদায় করতে হবে। প্রতি ৪ রাকায়াতের পর সামান্য বিরতি। (মাজুম, ৪/৩২) ইবনে কুদামাহ লিখেছেন–

ইমাম আহমদ (র)-এর মতে তারাবীহ্র রাকায়াত সংখ্যা ২০। সুফিয়ান সাওরীও এ মত পোষণ করতেন। (মুগনী ১/৭৯৮-৭৯৯)

৫. তারাবীহ্ সালাতের বিরতি, পঠিত দো'আ ও মুনাজাত প্রসংগ : দু'রাকআয়াত করে মোট ১০ সালামে তারাবীহ্ সালাত আদায় করা এবং ৪ রাকায়াত আদায়ের পর ক্ষণিকের জন্যে বিরতি দিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল ও সাহাবাগণের যুগে তারাবীহ্ সালাতের প্রতি রাকায়াত হতো শত আয়াতের। তদুপরি অনুষ্ঠিত হতো রাতের শেষভাগে।

কাজেই বিরতি দিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়া ছিল সংগত। বিরতির সময় আমাদের দেশে যে দোয়াটি পড়া হয় তার কোন হাদীস ভিত্তিক দলিল নেই। ৪ ইমামের কোন ইমামই এ দোয়া পাঠ করার জন্য বলেননি। এমনিভাবে সালাত শেষে যে মুনাজাত পড়া হয়, তারও কোনো দলীল নেই। এ দোয়া ও মুনাজাত কেমন করে তারাবীহ নামাযে প্রবেশ করে তার ইতিবৃত্তি আজও অজানা।

কথিত দোয়াটি হলো–

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ ـ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَايَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

আর পঠিতব্য মুনাজাতের বাক্যগুলো হলো।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ ـ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ ـ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

দোয়ার বাক্যগুলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও তাঁর গুণগানে পরিপূর্ণ। মুনাজাতের বাক্যগুলোতে আছে মুনাজাতকারীর আকুতি মিনতি। তথা জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার বিনয় অনুরোধ এবং সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, ক্ষমাকারী মহা প্রভু, দয়াবান আল্লাহর নিকট জান্নাত পাওয়ার আকুল আবেদন। বাক্যগুলোতে নেই কোনো ধরনের শির্ক-বিদায়াতের ছোঁয়াচে কিংবা সূক্ষ্ম কুটিলতা ও কৃত্রিমতা। এ কারণে দোয়া ও মুনাজাত করাকে কেউ উত্তম বৈ খারাপ মনে করে না।

আমাদের দৃষ্টিতে দোয়া মুনাজাত যতো ভালো ও কল্যাণকরই হোক না কেন, হাদীস-আসার তথা সলফে সালেহীনদের স্বীকৃতি না থাকায় তা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, সাধারণ মুসল্লীগণ এ দোয়া ও কথিত মুনাজাতের ব্যাপক প্রচলনের কারণে এ কাজকে তারাবীহ সালাতের অংগ মনে করে থাকে এবং

সমস্বরে পড়ে। অতএব, ইমাম ও ইসলামী গবেষকগণ এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত এগুলোর গুরুত্বহীনতার কথা মুসল্লীগণকে বুঝায়ে হাদীসভিত্তিক নয় এমন কাজের অপনোদনে আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া উচিত।

৬. তারাবীহ্ সালাতের বিবিধ মাসায়েল

ক. যে সন্ধ্যায় রমযান মাসের চাঁদ দেখা যাবে তারাবীহ্ সালাত সে রাত থেকে শুরু হয়ে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার আগের রাত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

খ. তারাবীহ্ সালাত অন্যান্য সালাতের ন্যায়ই আদায় করতে হয়। ওয়াজিব ধরনের আহকামে ভুল হলে অন্যান্য সালাতের ন্যায় সাহু সিজদা করে সংশোধন করতে হয়।

গ. কিরাত লম্বা হওয়ার কারণে কেউ বসে অপেক্ষা করত ইমামের রুকুতে যাওয়া পূর্বক্ষণে জামায়াতে শামিল হওয়ার প্রবণতা ঠিক নয়।

ঘ. ওযর ছাড়া বসে আদায় করা ঠিক নয়।

ঙ. তারাবীহের জামায়াত দাঁড়িয়ে গেলে আগে ঈশার ফরজ ও সুন্নাত আদায় করতে হবে। তারপর জামায়াতে শামিল হয়ে বিতরের পর ছুটে যাওয়া তারাবীহ্ পড়বে, তবে না পড়লেও ক্ষতি নেই।

চ. তারাবীহ্ সালাত কোনো কারণে পড়তে না পারলে তজ্জন্য কাযা পড়তে হবে না। কেবলমাত্র ফরজ নামাযই কাজা পড়তে হয়।

ছ. শুধুমাত্র রমযান মাসেই বিতর জামায়াতসহ পড়া বিধেয়।

জ. খতমে কুরআনের তারাবীহতে মুসল্লীগণের উপস্থিতি আশংকা হারে হ্রাস পেলে কিংবা জামায়াতে আদৌ উপস্থিত না হওয়ার আশংকা থাকলে সূরা তারাবীহ পড়া উত্তম।

ঝ. তারাবীহের পর বিতর পড়তে হয়। কেউ তারাবীহের আগে বিতর পড়লে সহীহ্ হবে।

ঞ. পর্দা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে নারীগণ তারাবীহের জামায়াতে শামিল হতে পারে।

৭. তারাবীহ্ সালাতে কুরআন খতম করা, হাফিজদের হাদীয়া গ্রহণ, দ্রুত কুরআন পাঠ

রোযা ও তারাবীহের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কিংবা অঙ্গাঅঙ্গী নয়। অর্থাৎ সম্পর্কটি এমন নয় যে, তরাবীহ্ আদায় না করলে রোযা হবে না কিংবা রোযা না রাখলে তারাবীহ পড়া যাবে না। আল্লাহ রমযান মাসের দিনের বেলায় রোযা রাখার

নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে এ মাসে দিনের বেলায় রোযা রাখা ফরজ। রোযার মাসটি নেকী অর্জনের মৌসুম বিধায় রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে অবচেতনায় সময় নষ্ট না করে ইবাদাতে সময় অতিবাহিত করার অভিপ্রায়ে তারাবীহ্ সালাত অতিরিক্ত (সুন্নাত বা নাফল) করা হয়েছে।

মূলত: রাতের এ ইবাদাতকে (তারাবীহ) আরো ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে তারাবীহ সালাতের মাধ্যমে কুরআন পড়া কিংবা শুনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই তরাবীহের সালাতে কুরআন পড়া বা শুনার মাধ্যমে খতম করা কেউ সুন্নাত, কেউ বা সুন্নাতে কিফায়াহ বললেও তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। মুসল্লীগণ যাতে শুনার মাধ্যমে ফযীলতের মাসে অন্তত ১ বার কুরআন খতম করার সুযোগ পায়, এ লক্ষ্যেই সলফে সালেহীনগণ এ ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেছেন।

হাফিজদের হাদীয়া নির্ধারণ করে সালাত পড়ানো না জায়েয। তাদের ইকতিদায় সালাত পড়া মাকরূহ। বিনা পরিশ্রমে সালাত পড়ানো উচিত। হাদীয়া নাম দিয়ে টাকা দিলে তা আর হাদীয়া থাকে না। বরং তা পারিশ্রমিক হয়ে যায়। এরূপ প্রচলন বা মনোভাব দূর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খতমে তারাবীহ্ সালাত কিছুটা দ্রুত পড়তে হয়। কিন্তু এতো দ্রুত পড়া জায়েয নেই যাতে মুসল্লীগণের বুঝতে অসুবিধা হয়। এরূপ দ্রুত পড়া পরিহার করা উচিত। অন্যথায় সূরা তারাবীহ্ উত্তম।

◆ তারাবীর নামাজের সময়

রমজান মাসে এশার নামাজের পর থেকে শুরু করে প্রভাত (সুবহে সাদিক) পর্যন্ত তারাবীর নামাজ আদায় করা যায়। এ নামাজ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজান মাসে রাতের নফল সালাত (তারাবিহ্ বা তাহাজ্জুদ)-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

তিনি বলেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

“যে ব্যক্তি রমজান মাসে সঠিক ঈমান নিয়ে সওয়াবের উদ্দেশ্যে রাতের নফল সালাত (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) আদায় করবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (বুখারী হাদীস নং ২০০৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাদীস নং ১১৪৭)

◆ তারাবির সালাতের ইমামতি কে করবে

সবচেয়ে যার সুন্দর ও তাজবীদ সহকারে কুরআন মুখস্থ আছে সেই ইমামতি করবেন। যদি মুখস্থ সম্ভব না হয় তাহলে কুরআন দেখে পড়বেন। আর রমজানে মুসল্লিগণের সাথে সমস্ত কুরআন খতম করা উত্তম। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়বেন।

◆ কুরআন খতমের দোয়া পড়ার বিধান

সালাতের মধ্যে কুরআন খতমের দো'আ শরিয়ত সম্মত নয়; কারণ নবী করীম ﷺ বা কোন সাহাবী থেকে এটি সুসাব্যস্ত না। কিন্তু যদি কেউ চায় তাহলে কুরআন খতমের দো'আ সালাতের বাহিরে করতে পারে। কেননা এটি আনাস (রা) থেকে প্রমাণিত আছে। অতএব যে চাইবে সে দোয়া করবে আর যে চাইবে না করবে না। আর কুরআন খতমের নির্দিষ্ট কোন দোয়া নেই। মুসলিম ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই দ্বারা দোয়া করবে।

যার শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের অভ্যাস আছে সে বিতর সালাত তাহাজ্জুদের পরে আদায় করবে। যদি ইমাম সাহেবের সাথে তারাবীহ ও বিতর এক সঙ্গে আদায় করে নেয়, তাহলে শেষ রাত্রিতে দুই দুই রাকাত করে শুধু তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করবে।

যদি কোন মহিলা কোন ফরজ বা নফল সালাতের জন্য মসজিদে গমন করতে চায়, তাহলে সুগন্ধি ব্যবহার ব্যতীত সাধারণ বেশে গমন করবে।

৬. দুই ঈদের সালাত

ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য জমায়েত হওয়া দুই প্রকার–

প্রথম প্রকার : সুন্নাতে রাতেবা তথা যা সর্বদা করা হয়। এটি ফরজ হতে পারে যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমা অথবা সুন্নাত হতে পারে। যেমন : দুই ঈদ, তারাবীহ, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ও ইস্তিসকার সালাতের জন্য। এসব সুন্নাতে রাতেবা এর হেফাজত সর্বদা করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রকার : যা সুন্নাতে রাতেবা নয় যেমন : নফল সালাতের জন্য জমায়েত হওয়া যেমন কিয়ামুল লাইল অথবা দোয়া। এসব কখনো কখনো করা জায়েয সর্বদা করা ঠিক নয়।

◆ নবী করীম ﷺ এর খুৎবাসমূহ

প্রথমত : যেসব খুৎবা সর্বদা দিতেন যেমন : জুমার খুৎবা, দুই ঈদের খুৎবা এবং ইস্তিসকা ও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের খুৎবা। জুমার দিনে সালাতের পূর্বে দুই খুৎবা দিতেন। আর দুই ঈদ ও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণে সালাতের পরে একটি করে খুৎবা দিতেন। আর ইস্তিসকার সালাতের পূর্বে একটি খুৎবা প্রদান করতেন।

দ্বিতীয়ত : যেসব খুৎবা নবী করীম ﷺ কোন প্রয়োজনে প্রদান করতেন। যেমন : ঘুষ সম্পর্কে খুৎবা দেন। অনুরূপ মাখজুমীয়্যা নারীর ব্যাপারে যে চুরি করেছিল ইত্যাদি। তাই বিচারক অথবা মুফতি বা আলেম কিংবা দ্বীনের আহ্বায়কের জন্য প্রয়োজনে উপস্থিত বিষয়ে সব সময় সত্যের বয়ানে খুৎবা প্রদান করা উচিত। খতীব সাহেব মানুষের অন্তরে নাড়া দেয় এবং যেন আত্মার মাঝে প্রভাব বিস্তার করে এমন খুৎবা প্রদান করবেন

মুসলমানদের ঈদ : ইসলামে মোট তিনটি ঈদ

১. ঈদুল ফিতর, যা প্রতি বছরে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে হয়।

২. ঈদুল আজহা, যা প্রতি বছর জিলহজ্ব মাসের দশম তারিখে হয়।

৩. সাপ্তাহিক ঈদ, যা জুমার দিন হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

◆ ঈদের সালাত বিধি বিধান করার হেকমত

ঈদুল ফিতরের সালাত রমজান মাসের রোজা পূর্ণ করার পর হয়। আর ঈদুল আজহার সালাত হজ্বের পরে এবং জিলহজ্ব মাসের দশম তারিখে হয়। এই দুই ঈদ ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। যা মুসলিমগণ বড় দু'টি ইবাদত আদায়ের পরে আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে পালন করে থাকে।

◆ দুই ঈদের সালাতের বিধান

দুই ঈদে সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

◆ দুই ঈদের সালাতের সময়

সূর্য উদয়ের পর এক বর্শা পরিমাণ উঁচু হলেই ঈদের সালাতের সময় শুরু হয়। এক বর্শা অর্থ প্রায় আধা ঘন্টা ঈদের সালাত আদায়ের পরেই কুরবানী করবে। ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে করবে না। চাশতের নামাযের আগেই ঈদের নামায শেষ করতেন। (ইবনে মাজা হাদীস-১৩১৭)

◆ দুই ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার নিয়ম

সুন্নত হলো দুই ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বে গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এবং সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করবে। এই দিনে ঈদের আনন্দ প্রকাশের জন্য মহিলারাও অংশগ্রহণ করবে। বেপর্দায় সুগন্ধি ব্যবহার করে লোকজনের সঙ্গে সালাতের জন্য বের হবে না। এমনকি ঋতুবতী মহিলারাও যাবে কিন্তু ঈদগাহের বাহিরে থেকে খুৎবা শ্রবণ করবে। সম্ভব হলে পাঁয়ে হেঁটে মুসল্লিদের জন্য ঈদগাহে সকাল সকাল যাওয়া সুন্নাত। তবে ইমাম সাহেব সালাতের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। এক রাস্তায় যাওয়া এবং অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নাত। আর ইসলামের নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশের লক্ষ্যে এবং সুন্নাতের অনুকরণের জন্য ঈদুল ফিতরে ঈদের মাঠে বের হওয়ার আগে বেজোড় কয়েকটি খেজুর খাওয়া সুন্নাত। আর ঈদুল আজহাতে কিছু না খেয়ে বের হওয়া এবং ফিরে এসে কুরবানীর গোশত দিয়ে খাওয়া শুরু করা সুন্নাত।

(বুখারী হাদীস-৮৯৯; তিরমিযী হাদীস-৫০৮)

◆ ঈদের সালাতের স্থান

শহর ও গ্রামের নিকটবর্তী খোলা মাঠে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত। ঈদগাহে পৌঁছে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করে বসে বসে জিকির করতে থাকবে। (অন্য মতে কোন সালাত আদায় না করে বসে যাবে।) বৃষ্টি ইত্যাদি কোন অজুহাত না থাকলে ঈদের সালাত মসজিদে আদায় করা যাবে না। ঈদের সালাত কোন ওজরে মসজিদে হলে প্রবেশ করার পর মসজিদে প্রবেশের সালাত আদায় করে ইমাম সাহেব আসা পর্যন্ত যিকির করতে থাকবে। ঘরে ফিরে আসার পর মুসল্লির জন্য দুই রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

(ইবনে মাজা হাদীস-১২৯৩, ১২৯৫, ১৩০১)

◆ ঈদের সালাতের পদ্ধতি

সালাতের সময় হলে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের নিয়ে কোন আজান ও ইকামত ছাড়া দুই রাকায়াত সালাত আদায় করবেন। (বুখারী মুসলিম)

প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমাসহ ৭ টি বা ৮ টি এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে দাঁড়ানোর পর সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে পাঁচটি তাকবীর বলবেন। অতঃপর সূরা ফাতিহার পর উচ্চস্বরে প্রথম রাকায়াতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে ফাতিহার পর সূরা গাশিয়াহ্ পাঠ করবে। অথবা প্রথম রাকায়াতে সূরা ক্ব-ফ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ক্বামার পাঠ করবে। সুন্নাত পালনার্থে একেক সময় একেকটা পাঠ করবে। (বুখারী হাদীস-৯০৫; মুসলিম হাদীস-১৯২৮; নাসায়ী হাদীস-১৫৬৩; ইবনে মাজা হাদীস-১১৪৮; তিরমিযী হাদীস-৫০০)

◆ ঈদের খুৎবা

ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিগণের দিকে হয়ে একটি খুৎবা পাঠ করবেন। যে খুৎবাতে তিনি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করবেন। মানুষকে আল্লাহর শরিয়তের ওপর ও আমলের প্রতি এবং দান সদকার প্রতি উৎসাহিত করবেন। আর ঈদুল আজহাতে কুরবানীর প্রতি উৎসাহিত করবেন এবং কুরবানীর বিধি-বিধান বর্ণনা করবেন। (বুখারী হাদীস-৯০৩, ৯০৭; মুসলিম হাদীস-১৯২৯; নাসায়ী হাদীস-১৫৫৯-৬০; ইবনে মাজা হাদীস-১২৭৬; তিরমিযী হাদীস-৪৯৯)

◆ ঈদের সালাতের আহ্কাম

যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাহলে শুধু ঈদের সালাত আদায় করলেই হবে, জুমা আদায়ের প্রয়োজন নেই; বরং জুমার সময় যোহর আদায় করবে। তবে ইমাম সাহেব এবং মুসল্লিগণের মধ্যে যারা ঈদ আদায় করেনি, তাদের জন্য জুমার সালাত আদায় করা জরুরি।

যদি ইমাম সাহেব সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর মধ্যে হতে কোন তাকবীর ভুলে যায় এবং সূরা ফাতিহা শুরু করে দেয় তাহলে সে তাকবীর আর দিতে হবে না; কারণ তার স্থান ও সময় সূরা ফাতিহা শুরু করার আগে যা বিগত হয়ে গেছে। অন্যান্য ফরজ ও নফলের মতো ঈদের সালাত ও বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত উঠাবে।

ইমাম সাহেবের জন্য সুন্নাত হলো তিনি খুৎবাতে মহিলাদের জন্যও ওয়াজ করবেন এবং তাদেরকে ফরজ-ওয়াজিব ঠিকমত আদায়ের কথা এবং দান সদকা করার প্রতি উৎসাহিত করবেন।

ঈদের সালাতে যে ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পূর্বে সালাতের নিয়ত বাঁধতে পেরেছে, সে সালামের পরে যথা নিয়মে বাকি সালাত সমাপ্ত করবে। আর যারা ইমাম সাহেবের সঙ্গে সালাত পায়নি তারা জামাত করে ঈদের সালাতের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সালাত আদায় করে নিবে।

ঈদের সালাতের জামাতের পর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন থাকলে, সে খুৎবা শ্রবণ না করে চলে যেতে পারে। যদি কারো চলে যাওয়ার প্রয়োজন না থাকে তার জন্য খুৎবা শ্রবণ করার জন্য বসে থাকাই উত্তম।

◆ ঈদের দিন তাকবীর বলার বিধান

দুই ঈদের দিনগুলোতে শব্দ করে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে। সমস্ত মুসলিম এই তাকবীর ঘরে, বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, মসজিদে ও অন্যান্য সকল স্থানেই বলবে। তবে মহিলারা অন্য পুরুষের উপস্থিতিতে সশব্দে বলবে না।

◆ তাকবীরের সময়সমূহ

১. ঈদুল ফিতরের তাকবীর ঈদের আগের রাত (সূর্যাস্তের পর) থেকে শুরু করে ঈদের সালাত পর্যন্ত বলা সুন্নাত।

২. ঈদুল আজহার তাকবীর শুরু হবে জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের ফজরের নামাজ থেকে এবং শেষ হবে ১৩ তারিখের সূর্যাস্তের সাথে সাথে। অর্থাৎ, মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরজ সালাতে।

◆ তাকবীরের নিয়ম

১. জোড়া তাকবীর বলবে : اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ . আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

২. অথবা বেজোড় তাকবীর বলবে : اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ . আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

৩. অথবা প্রথম বারে বেজোড় এবং দ্বিতীয় বারে জোড় বলবে : اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্। কখনো এভাবে করবে আর কখনো ঐভাবে এতে কোন অসুবিধা নেই।

◆ বিদ'আতি ঈদ তথা অনুষ্ঠানসমূহের হুকুম

এককভাবে বিভিন্ন খুশির অনুষ্ঠান যেমন : হিজরী ও ইংরেজি নববর্ষ পালন, শবে মেরাজ পালন, শবে বরাত পালন, ঈদে মিলাদুন নবী পালন, মাতৃভাষা দিবস পালন ইত্যাদি। এসব বিভিন্ন রেওয়াজ মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। এগুলোর সবই বিদ'আত ও পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি এর কোন একটি পালন করবে, অথবা এর স্বীকৃতি দিবে, অথবা এর দিকে আহ্বান করবে, অথবা টাকা-পয়সা খরচ করবে, সে গুনাহগার হবে। শুধু তাই নয়ং বরং এগুলোর সকল গুনাহ তাকে বহন করতে হবে এবং তাকে দেখে যারা এ আমল করবে তাদের গুনাহের সমান বোঝাও তাকে বহন করতে হবে।

চ. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাত

চন্দ্রগ্রহণ : চন্দ্র গ্রহণ হলো রাত্রে চন্দ্রের সম্পূর্ণ অংশের অথবা কিছু অংশের আলো চলে যাওয়া।

সূর্য গ্রহণ : সূর্য গ্রহণ হলো দিনে সূর্যের সম্পূর্ণ অংশের অথবা কিছু অংশের আলো আড়াল হয়ে যাওয়া।

◆ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাতের বিধান

প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর প্রতি সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটি বাড়ি ও সফরে আদায় করবে।

◆ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণর সালাতের সময়

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে, যেভাবে সূর্য ও চন্দ্র উদয়ের নির্দিষ্ট সময় আছে। আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মনুযায়ী সূর্য গ্রহণ মাসের শেষে হয়ে থাকে এবং চন্দ্র গ্রহণ পূর্ণিমার সময় হয়ে থাকে।

◆ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণসমূহ

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হলে মানুষ আল্লাহর আজাবের ভয় ভীতি নিয়ে সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অথবা বাড়িতে গমন করবে। তবে এ সালাত মসজিদেই উত্তম। যেমনভাবে ভূমিকম্পনের কারণ আছে, বজ্রপাতের কারণ রয়েছে, আগ্নেয়গিরির কারণ রয়েছে, তেমনিভাবে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণেরও কারণ রয়েছে যে কারণে এগুলো সংঘটিত হয়। আর এগুলো সংঘটিত হওয়ার হেকমত হলো : আল্লাহ্ তা'য়ালার ভয় দেখানো; যেন মানুষ আল্লাহ্ তা'য়ালার দিকে ফিরে আসে।

সময় : সূর্য গ্রহণ শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত সময়কালে গ্রহণের সালাতে থাকতে হবে।

◆ সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সালাত আদায়ের পদ্ধতি

এ সালাতে কোন আজান ও ইকামত নেয়। তবে রাতে হোক বা দিনে হোক اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ "আস্‌সলাতু জাামি'আহ" (আসুন! সালাতের জামায়াত কায়েম হচ্ছে) কমপক্ষে একবার বা একাধিক বার বলবে। মুসল্লিদেরকে একত্র করা হলে ইমাম সাহেব তাকবীর বলে স্বশব্দে সূরা ফাতিহা ও একটি লম্বা সূরা পড়বেন। এরপর "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বলে রুকু থেকে উঠবে। তবে সিজদা করবে না; বরং আবার সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং

অন্য একটি সূরাও পড়বে। এই সূরাটি তুলনামূলকভাবে প্রথম সূরার চেয়ে ছোট হবে। অত:পর আবার রুকু করবে। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা হবে। এরপর রুকু থেকে উঠে দুটি দীর্ঘ সিজদা করবে। প্রথম সেজদার চেয়ে দ্বিতীয় সিজদা তুলনামূলক কম দীর্ঘ হবে এবং দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথম রাকায়াতের মতো করে দ্বিতীয় রাকায়াত আদায় করবে। তবে তা প্রথম রাকায়াতের চেয়ে কম লম্বা হবে। অতঃপর আত্তাহিয়াতু পাঠ করে সালাম ফিরাবে।

◆ গ্রহণের খুৎবার নিয়ম

সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেবের জন্য একটি খুৎবা দেয়া সুন্নাত। খুৎবাতে তিনি মুসল্লিদেরকে ওয়াজ করবেন এবং তাদের নিকট গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করবেন যেন তাদের অন্তর নরম হয়ে যায়। সাথে সাথে মানুষকে দো'য়া ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার নির্দেশ দিবেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ جِدًّا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ

لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَكَبِّرُوْا وَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اِنْ مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهٗ اَوْ تَزْنِيَ اَمَتُهٗ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হলে সালাতের জন্য উঠেন এবং সালাতে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়ানোর পর রুকুতে যান এবং অনেক দীর্ঘ রুকু করার পর রুকু থেকে উঠেন। অতঃপর দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা ছিল। অতঃপর পুনরায় রুকুতে যান এবং দীর্ঘ সময় রুকুতে থাকেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা । এরপর সিজদা করেন। অতঃপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা।

অতঃপর আবার রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকুতে থাকলেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা। অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা। অতঃপর আবার রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকুতে থাকলেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা। অতঃপর সেজদা করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত সমাপ্ত করলেন তখন সূর্য গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। অত:পর তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন। যাতে আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনা করে বলেন : "নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্ তা'য়ালার অন্যতম নিদর্শন। আর কোন ব্যক্তির মত্যু বা জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রে গ্রহণ লাগে না। অতএব, যখন তোমরা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ দেখবে তখন আল্লাহু আকবার বলবে, আল্লাহর নিকট দোয়া করবে, সালাত আদায় ও দান-সদকা করবে। হে মুহাম্মদের উম্মত! কারো দাস বা দাসী যেনা করলে যে রাগান্বিত হয় তার চেয়েও আল্লাহ বেশি রাগান্বিত হন। হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি তাহলে অনেক ক্রন্দন করতে ও কম হাসতে। আমি কি আমার দায়িত্ব তোমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছি?"

(বুখারী হাদীস নং ১০৪৪ ও মুসলিম হাদীস নং ৯০১)

◆ গ্রহণের সালাতের কাযা

গ্রহণের নামাজের প্রত্যেক রাকাতের প্রথম রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হবে। আর যদি গ্রহণ শেষ হয়ে যায় তবে গ্রহণের নামাজ ছুটে গেলে তা কাজা করার প্রয়োজন নেই।

যদি সালাতে থাকা অবস্থায় সূর্যগ্রহণ শেষ হয়, তাহলে গ্রহণের সালাত সংক্ষেপ করবে। আর যদি গ্রহণের সালাত সমাপ্ত হওয়ার পরেও গ্রহণ শেষ না হয়, তাহলে গ্রহণ সমাপ্ত পর্যন্ত বেশি বেশি দো'য়া, তাকবীর এবং দান সদকা করবে।

◆ গ্রহণের নির্দশনের সূক্ষ্ম বুঝ

সূর্য গ্রহণের বাহ্যিক দৃশ্য মনকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে ধাবিত করে এবং আল্লাহর ইবাদতের দিকে উৎসাহ প্রদান করে। সাথে সাথে পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে এবং আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও তাঁর দিকে ফিরে আসতে সাহায্য করে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ـ

আমি লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

[সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-৫৯]

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَاِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِنْهَا فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ حَتّٰى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ـ

২. আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ উভয়ের দ্বারা তার বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। কার মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ লাগে না। তাই যখন তোমরা সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ দেখবে, তখন গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (গ্রহণের) সালাত আদায় করতে থাক এবং দো'য়া করতে থাক।"

(বুখারী হাদীস নং ১০৪১ এবং মুসলিম হাদীস নং ৯১১, হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের)

নিদর্শনের সালাত : কোন নিদর্শন দেখা দিলে চারটি রুকু ও চারটি সেজদা করে সালাত আদায় করা বিধিসম্মত। প্রতিটি রাকায়াতে দু'টি করে রুকু ও দু'টি করে সিজদা করতে হবে। নিদর্শন যেমন : ভূমিকম্প, তুফান-বন্যা, আগ্নেয়গিরি ও দুর্যোগ ইত্যাদি। (আল মুমতে শারহে ফিকহ আল উসাইমিন হাদীস-৫/২৫৫)

ছ. সালাতুল ইস্তিসকা (বৃষ্টির জন্য সালাত)

ইস্তিসকার অর্থ : আল্লাহর নিকট বৃষ্টি চেয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দো'য়া করার নাম।

◆ বৃষ্টির জন্য সালাতের বিধান

এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সালাত। এ সালাত যে কোন সময়ে আদায় করা যেতে পরে। তবে উত্তম হলো সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উদিত হওয়ার পর (অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার ১৫ মি : পরে)।

◆ বৃষ্টির সালাতের বিধি-বিধানের হেকমত

জমিন যখন শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন বৃষ্টির সালাত পড়তে হয়। বৃষ্টির সালাতের উদ্দেশ্য জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার ভয়-ভীতি নিয়ে বিনয়ের সাথে কেঁদে কেঁদে নারী, পুরুষ, শিশু সকলেই খোলা মাঠে একত্রিত হবে। ইমাম সাহেব তাদের জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করবেন। (ইমাম অর্থ- রাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিনিধি। তবে কোন রাষ্ট্রে বৃষ্টির সালাতের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা না থাকলে বড় মসজিদের ইমাম সাহেব বা কোন এলাকার প্রসিদ্ধ আলেম এর দিন নির্ধারণ করবেন।)

ইস্তিসকার প্রকার : বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জামায়াতের সাথে বৃষ্টির সালাতের মাধ্যমে হতে পারে অথবা জুমার সালাতের খুৎবাতে বৃষ্টির জন্য দোয়ার মাধ্যমেও হতে পারে। অথবা সালাতের পরে দোয়ার মাধ্যমে কিংবা কোন সালাত বা খুৎবা ব্যতীত একাকী নির্জনে দোয়ার মাধ্যমেও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

◆ বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের পদ্ধতি

ইমাম সাহেব মুসল্লিগণকে নিয়ে কোন আজান ও ইকামত ছাড়াই দুই রাকায়াত সালাত আদায় করবেন। অত:পর সশব্দে সূরা ফাতিহা এবং অপর একটি সূরা পাঠ করবেন। এরপর রুকু ও সেজদা করবেন। তারপর দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়িয়ে। অত:পর পূর্বের ন্যায় সশব্দে সূরা ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পাঠ করবে। দুই রাকাতের শেষে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) ও দরুদ পাঠ করে সালাম

ফিরাবেন। অতঃপর চাদরের ডান কিনারা ধরে বাম কাঁধে ও বাম কিনারা ধরে ডান কাঁধে রাখবে। এক উভয় হাত উপুড় করে আকাশের দিকে ইশারা করবে।

(মিশকাত হাদীস-৯৫০৮)

বৃষ্টির সালাতের খুৎবার সময় : সুন্নাত হলো ইমাম সালাতের পূর্বে একটি খুৎবা দিবেন।

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِىْ قَالَ : فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ يَدْعُوْ حَوَّلَ رِدَاءَ ثُمَّ صَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ -

১. আব্বাদ ইবনে তামীম থেকে বর্ণিত, তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যে দিন ইস্তিস্কার জন্য বের হন সেদিন আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর পিঠকে মানুষের দিকে ফিরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি তাঁর চাদর পরিবর্তন করলেন। এরপর তিনি ﷺ আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করলেন যাতে তিনি স্বশব্দে কেরাত পাঠ করেন।

(বুখারী হাদীস নং ১০২৫, মুসলিম হাদীস নং ৮৯৪)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَدَاَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ ..... ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য উঠার সময় বের হন। এরপর মিম্বারের উপরে বসেন। অতঃপর তিনি তাকবীর বলেন ও আল্লাহর প্রশংসা করেন। এরপর বলেন : তোমরা তোমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের সমস্যার অভিযোগ করছ-------। অত:পর তিনি মানুষের অভিমুখী হলেন এবং মিব্বার থেকে নেমে দুই রাকায়াত সালাত পড়ালেন। (আবূ দাউদ হাদীস-১১৭৩)

◆ **ইস্তিস্কার খুৎবার পদ্ধতি**

ইমাম সাহেব সালাতের পূর্বে দাঁড়িয়ে একটি খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তাকবীর পড়বে ও ক্ষমা চাইবে। আর হাদীসে যা সাবস্থ তার মধ্য হতে বলবে যেমন–

اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِ كُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرَ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَ كُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ .

“আপনারা আপনাদের দেশে অনাবৃষ্টিতে ভুগছেন এবং সময়মত বৃষ্টি পাচ্ছেন না। আল্লাহ্ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন তার নিকট দো‘আ করার জন্য এবং ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আপনাদের দো‘আ কবুল করবেন।” অতঃপর ইমাম সাহেব বলবেন : “আল হামদুলিল্লাহি রব্বিল ‘আলামীন। আররহ্মানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াফ‘আলু মা ইউরীদ, আল্লাহুম্মা আন্তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল গানিইয়ু ওয়া নাহনুল ফুকুরা’ আনজিল ‘আলাইনাল গাইছ, ওয়াজ‘আল মা আনজালতা লানা কুওয়্যাতান ওয়া বালাগান ইলা হীন।”

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। যিনি হাশরের দিনের মালিক। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনি আল্লাহ, আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। আমরা সবাই আপনার মুখাপেক্ষী। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আর আপনি যে বৃষ্টি দিবেন তা শক্তিতে রুপান্তরিত করুন এবং তা আমাদের প্রয়োজন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী করুন।”

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ১১৭৩)

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيْئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا .

"আল্লাহুম্মাসক্বিনা গাইছান মারীয়ান মুগিছান নাফী'য়ান, গাইরা দা-ররিন, আজিলা।"

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِسْقِنَا – তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, غَيْثًا – যা ফলপ্রসূ مَرِيْئًا – উৎপাদনশীল, نَافِعًا – উপকারী, غَيْرَ ضَارٍّ – যা প্রকার কোন ক্ষতি করে না, عَاجِلًا – বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি দান করুন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা ফলপ্রসূ, উৎপাদনশীল, উপকারী, কোন প্রকারের ক্ষতি করে না, বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি দান করুন।"

(হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ১১৭৩)

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ .

"আল্লাহুম্মাসক্বি 'ইবাদাকা ওয়া বাহায়িমাক, ওয়ানশুর রহমাতাক, ওয়াআহ্য়ি বালাদাকাল মাইয়িত।" (মুয়াত্তায় মালিক হাদীস-৪৪৯, আবূ দাউদ হাদীস-১১৭৬)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اِسْقِ – বৃষ্টি দান করুন, عِبَادَكَ – তোমার বান্দাদের জন্য, وَبَهَائِمَكَ – এবং প্রাণীদের জন্য, وَانْشُرْ – বিলিয়ে দিন, رَحْمَتَكَ – তোমার রহমতকে, وَاحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ – তোমার মৃত দেশকে।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের জন্য ও প্রাণীদের জন্য বৃষ্টি দান করুন এবং আপনার রহমত বিলিয়ে দিন। আপনার মৃত দেশকে জীবিত করুন।"

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا .

"আল্লাহুম্মা আগিছনা, আল্লাহুম্মা আগিছনা, আল্লাহুম্মা আগিছনা।"

(মুসলিম হাদীস নং ৮৯৭)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اَغِثْنَا – আপনি বৃষ্টি দান করুন, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اَغِثْنَا – আপনি বৃষ্টি দান করুন, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اَغِثْنَا – আপনি বৃষ্টি দান করুন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান কর।

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا اللّٰهُمَّ اسْقِنَا اللّٰهُمَّ اسْقِنَا ـ

"আল্লাহুম্মাস্‌ক্বিনা, আল্লাহুম্মাস্‌ক্বিনা, আল্লাহুম্মাস্‌ক্বিনা।" (বুখারী হাদীস নং ৮০১৩)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! اِسْقِنَا – আমাদের বৃষ্টি দান করুন, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِسْقِنَا – আমাদের বৃষ্টি দান করুন, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِسْقِنَا – আমাদের বৃষ্টি দান করুন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।

যদি বৃষ্টি বর্ষণ বেশি হয় এবং তাতে ক্ষতির আশংকা বোধ হয়, তাহলে নিচের দো'আটি পড়া সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ـ

"আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা 'আলাইনা, আল্লাহুম্মা 'আলাল আকামি, ওয়াল জিবালি ওয়াল আজামী ওয়াযযিরাবি, ওয়াল আওদিয়াতি, ওয়া মানাবিতিশ শাজার।"

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! حَوَالَيْنَا – আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, وَلَا عَلَيْنَا – আমাদের উপর নয়, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ! عَلَى الْاٰكَامِ – টিলার উপর, وَالْجِبَالِ – পাহাড়, وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ, وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ – উচুঁ উপত্যক, জঙ্গল ও বিভিন্ন গাছপালার উপর।

"হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচুঁ উপত্যকা ও জঙ্গলের উপর বর্ষণ করুন।"

(বুখারী হাদীস নং ১০১৩, মুসলিম হাদীস নং ৮৯৭)

বৃষ্টি তার প্রতিপালকের নিকট হতে আসে তাই বৃষ্টিপাত হলে, শরীরের কিছু অংশের পোশাক উঠিয়ে সে অংশে বৃষ্টির পানি লাগানো সুন্নাত। এ সময় নিচের দো'আটি পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ـ

"আল্লাহুম্মা সইয়িবান নাফিয়া।" (বুখারী হাদীস নং ১০৩২)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ - হে আল্লাহ, صَيِّبًا - বৃষ্টি বর্ষণ করুন, نَافِعًا - উপকারী।
অর্থ : হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন।
বৃষ্টিপাতের পরে বলবে–

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ ـ

"মুত্বিরনা বিফাদলিল্লাহি ওয়া রহমাতিহ্।"

(বুখারী হাদীস নং ১০৩৮ ও মুসলিম হাদীস নং ৭১)

শাব্দিক অর্থ : مُطِرْنَا - আমরা বৃষ্টি পেয়েছি, بِفَضْلِ اللّٰهِ – আল্লাহর অনুগ্রহের, وَرَحْمَتِهِ – এবং তাঁর ফজলে।

অর্থ : আল্লাহর ফজলে ও তাঁর রহমতে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি।

ইমাম সাহেব যখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবেন তখন দুই হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন। সাথে সাথে মুসল্লিগণও তাদের হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন। আর খুৎবার মাঝে ইমাম সাহেবের দো'আয় সকলে আমীন, আমীন বলতে থাকবে।

খুৎবার পর যা করবে : ইমাম খুৎবা সমাপ্ত করার পর কিবলার দিকে ফিরে দো'আ করবেন। অতঃপর নিজ চাদর উল্টাবেন। চাদরের ডান পাশ বাম পাশে করে দিবেন এবং সকল মানুষ হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন। অতঃপর ইমাম সাহেব মানুষদের সাথে পূর্বের নিয়মে বৃষ্টি প্রার্থনার দুই রাকায়াত সালাত আদায় করবেন।

◆ আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেয়ে বৃষ্টি চাওয়া

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ـ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ـ

অতঃপর বলেছি : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।

[সূরা নূহ : আয়াত-১০-১২]

জ. চাশতের সালাত / দোহার সালাত

চাশত নামাযের ওয়াক্ত : 'চাশত' ফার্সী শব্দ। শাব্দিক অর্থ উজ্জ্বল্য, বিকশিত। ইশরাকের পর অর্থাৎ সূর্য উজ্জ্বলরূপে চতুর্দিকে ছড়িয়ে উদিত হওয়ার পর নামাযের নিষিদ্ধ সময় দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত এ নামাযের ওয়াক্ত। এ সময়টিকে আরবীতে দোহা (ضُحٰى) বলা হয়। সুতরাং চাশত নামায আরবীতে সালাতুদ দোহা নামে পরিচিত।

চাশতের সালাত সুন্নাত : এটি কমপক্ষে দুই রাকায়াত এবং বেশির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেয়।

চাশতের সালাতের সময় : সূর্য একটি বল্লমের সমান তথা এক মিটার (সূর্য উদয়ের প্রায় ১৫ মিনিট পর) উঁচু হওয়ার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত চাশতের সালাতের সময়। তবে এর সর্বোত্তম সময় হলো গরম খুব বেশি হয়ে উটের বাচ্চারা যখন গরম অনুভব করে।

◆ চাশতের সালাতের ফযীলত

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : أَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার আন্তরিক বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি অসিয়ত করেছেন : প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, চাশতের দুই রাকায়াত সালাত আদায় করা এবং ঘুমানোর আগে বিতর সালাত আদায় করে নেয়া।

(বুখারী হাদীস ১৯৮১ ও মুসলিম হাদীস ৭২১ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর)

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ

بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى .

২. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : সকালে তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সদকা করা আবশ্যক। প্রতিটি তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) সদকা, প্রতিটি প্রশংসা (আলহামদু লিল্লাহ) সদকা, প্রতিটি তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) সদকা, প্রতিটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) সদকা, সৎকাজের আদেশ দেয়া সদকা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা সদকা। আর এগুলোর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে মাত্র চাশতের দুই রাকাত সালাত। (মুসলিম হাদীস-৭২০, মুসলিমের অপর হাদীসে এসেছে যে, আদম সন্তানের প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০টি গিরা বিশিষ্ট সৃষ্টি করা হয়েছে।)

ঝ. ইস্তেখারার সালাত কল্যাণ কামনা

ইস্তেখারা : ওয়াজিব বা উত্তম কিছু কাজে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট কোনটাতে মঙ্গল আছে তার নির্বাচনের জন্য আবেদন করাকে ইস্তেখারা বলা হয়।

◆ ইস্তেখারার বিধান

ইস্তেখারার নামাজ সুন্নত, যার রাকাত সংখ্যা দুই। ইস্তেখারার দো'য়া নামাজের সালাম ফিরানোর আগেও হতে পারে পরেও হতে পারে। তবে সালামের আগে হওয়াটাই উত্তম। একাধিকবার বিভিন্ন সময়ে ইস্তেখারা করা বৈধ আছে। আর এমন কাজ করবে যার দ্বারা তার অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায় যা ইস্তেখারার পূর্বে তার অন্তরে হত না।

ইস্তেখারা (বাছাইয়ের আবেদন) ও ইস্তেশারা (পরামর্শ চাওয়া) হবে ঐ ব্যক্তির জন্য যে কোন হারাম বা মাকরূহ নয় এমন ব্যাপারে চিন্তিত অবস্থায় আছে। এমন ব্যক্তির জন্য ইস্তেখারা ও ইস্তেশারা উত্তম। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হতে ইস্তেখারা (বাছাইয়ের আবেদন) করবে এবং কোন ভালো মানুষের সাথে ইস্তেশারা তথা পরামর্শ করবে, সে কখনও লজ্জিত হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ .

"এবং আপনি তাদের (সাহাবীদের সাথে) কাজ-কর্মে পরামর্শ করুন। আর যখন (কোন কাজের জন্য) দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্প পোষণ করবেন, তখন আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করুন।" [সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১৫৯]

◆ **ইস্তেখারার নিয়ম**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ : اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ وَيُسَمِّىْ حَاجَتَهٗ .

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সকল বিষয়ে এমনভাবে ইস্তেখারা করার শিক্ষা দান করতেন যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। নবী করীম ﷺ বলেন : "যখন তোমাদের কেউ কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তায় পড়ে তখন সে যেন দুই রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করে বলে :

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাখীরুকা বি'ইল্‌মিক, ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিকুদরাতিক, ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আজীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদির, ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লাম, ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ূব, আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাজাল আম্‌রা খইরুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আক্বিবাতি

আম্‌রী (অথবা বলেন : ফী 'আজিলি আমরী ও আজিলিহ্) ফাক্বদুরহু লী। ওয়া ইন কুন্‌তা তা'লামু আন্না আযাল আম্‌রা শাররুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আক্বিবাতি আম্‌রী (অথবা তিনি বলেন : ফী 'আজিলি আম্‌রী ওয়া আজিলিহ্) ফাসরিফহু 'আন্নী ওয়াসরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদুর লিইয়াল খইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরদিনী।" দোয়ার সময় নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞান করণে আপনার নিকট সিদ্ধান্ত তলব করার প্রার্থনা করছি (এ কাজের জন্য) এবং (এ ব্যাপারে) আপনার নিকট শক্তি প্রার্থনা করছি (এ কাজের জন্য) এবং (এ ব্যাপারে) আপনার ফজল ও করুণা চাচ্ছি; কেননা, এর শক্তি আপনার আছে কিন্তু আমার নেই এবং আপনি (এর ভালো-মন্দ) জানেন। আমি জানি না; কারণ আপনি সকল গায়েবের (অদৃশ্যের) সার্বিক জ্ঞানের অধিকারী। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে থাকে যে, এ কাজটি আমার দ্বীন, জীবন ও আখেরাতের ব্যাপারে মঙ্গলময় হবে, (অথবা তিনি বলেন : আমার দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে মঙ্গলজনক হবে) তা হলে তা আমার জন্য সহজ করে দাও। আর যদি আপনার জ্ঞানে এমন থাকে যে, এ কাজটি আমার দ্বীন, জীবন ও আখেরাতের জন্য (অথবা তিনি বলেন : আমার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য) অমঙ্গল হবে, তাহলে সেটি আমার থেকে দূর করে দাও এবং আমাকেও তা থেকে হটিয়ে দাও। আর মঙ্গল যখন যেখানেই থাকুক না কেন তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং সেই মঙ্গলের ওপর আমাকে রাজি করে দাও। এ দু'আ করার সময় যেখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেখানে নিজের প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করবে।" (বুখারী হাদীস নং ৬৩৮২)

কুরআন তেলাওয়াতের সিজদা

কুরআন তেলাওয়াতের সিজদার হুকুম : নামাযের বাহিরে ও ভেতরে তেলাওয়াতের সিজদা করা সুন্নাত। তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর জন্য তেলাওয়াতের সিজদা করা সুন্নাত।

◆ কুরআনে সিজদার সংখ্যা

কুরআনের ১৪টি সূরাতে মোট ১৫টি সিজদার আছে : সূরা আ'রাফ, রাদ, নাহল, বনি ইসরাঈল, মারইয়াম, হাজ্ব ২টি, ফুরকান, নামল, সিজদাহ, সোদ, ফুস্‌সিলাত, নাজম, ইনশিকাক ও 'আলাক।

◆ কুরআনে সিজদার আয়াতগুলো দুই প্রকার :

১. খবর অথবা ২. নির্দেশ−

১. কিছু আয়াতে সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে মাখলুক আল্লাহকে সিজদা করে তার খবর প্রদান। তাই তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতার জন্য সে সকল সিজদা করা সুন্নাত।

২. আর কিছু আয়াতে আল্লাহ তাঁর জন্য সিজদা করার নির্দেশ করেছেন। তাই মাখলুক তাঁর রবের আনুগত্যের জন্য তাড়াতাড়ি করে সিজদা করবে।

◆ তেলাওয়াতের সিজদার পদ্ধতি

তেলাওয়াতের সিজদা মাত্র একটি। যদি নামাজের কিরায়াতে হয় তাহলে সিজদায় যাওয়া ও উঠার সময় তাকবীর বলবে। আর যদি নামাজের বাহিরে হয় তবে তাকবীর, বৈঠক ও সালাম ছাড়াই সিজদা দেবে।

◆ তেলাওয়াতের সিজদার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا قَرَاَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِىْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَهُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كُرَيْبٍ يَا وَيْلِىْ اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِى النَّارُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রসূলুলাহ ﷺ বলেছেন : "যখন বনি আদম সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করে তখন শয়তান এক পার্শ্বে সরে গিয়ে কাঁদে আর বলে; হায় আফসোস! অন্য বর্ণনায় আছে, হায় আমার আফসোস! বনি আদম সিজদার জন্য নির্দেশিত হয়ে সিজদা করেছে, তাই তার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর আমি সিজদার জন্য আদিষ্ট হলে সিজদা করা অস্বীকার করেছি, যার কারণে আমার জন্য জাহান্নামে রয়েছে। (মুসলিম হাদীস-৮১)

যখন ইমাম সাহেব সিজদা করবেন তখন মুক্তাদিকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। নি:শব্দ কেরায়াত বিশিষ্ট নামাজে যে আয়াতে বা সূরাতে সিজদার আয়াত আছে তা ইমামের জন্য পাঠ করা মাকরূহ নয়।

তেলাওয়াতের সিজদায় যা বলবে : নামাজের সেজদায় যেসব দোয়া ও জিকির বলা হয় তাই তিলাওয়াতের সিজদায় বলবে। অথবা নিম্নোক্ত দুয়াটি পড়বে,

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

(আবু দাউদ, তিরমিযী হাদীস-৪৭৪; আহমদ হাদীস-৬/৩০)

পবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতের সেজদা করা সুন্নাত। তবে ওযু ছাড়াও সিজদা করা জায়েয। অনুরূপ হায়েয, নিফাস অবস্থাতেও সিজদা করা জায়েয। যখন সিজদার আয়াত পাঠ করবে বা শুনবে তখন সিজদা করতে হবে। সিজদায়ে শুকর (কৃতজ্ঞতার সেজদা)। (নায়লুল আওতার ফিকহুস সুন্নাহ হাদীস-১/১৯৬)

◆ শরীয়তসম্মত কৃতজ্ঞতার সিজদা

১. নতুন নতুন নিয়ামত সামনে আসলে শুকরিয়ার সিজদা করা সুন্নাত। যেমন : কারো হেদায়েতের সুসংবাদ অথবা ইসলাম গ্রহণ বা মুসলমানদের সাহায্যের সুসংবাদ অথবা নবজাত শিশুর সংবাদ ইত্যাদিতে শুকরিয়ার জন্য সিজদা করা সুন্নাত।

২. কোন বিপদ থেকে নাজাত পেলে শুকরিয়ার সিজদা করা সুন্নাত। যেমন– ডুবা, অগ্নিদগ্ধ, হত্যা, চোরের কবলে পড়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেলে আল্লাহর শুকরিয়ার জন্য সিজদা করা সুন্নাত।

◆ শুকরিয়া আদায়ে জন্য সিজদার নিয়ম

কোন তাকবীর ও সালাম ছাড়া শুধু মাত্র একটি সিজদা করা। এ সিজদা করতে হবে সালাতের বাহিরে। অবস্থার প্রেক্ষিতে দাড়িঁয়ে, বসে, পবিত্রতার সাথে বা অপবিত্র অবস্থায় সিজদা করা যায়। তবে পবিত্র অবস্থায় সিজদা করা উত্তম।

عَنْ اَبِى بَكْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَتَاهُ اَمْرٌ يَسُرُّهُ اَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى .

আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর সামনে যখন কোন খুশির বিষয় আসত তখন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন। (হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস-২৭৪, ইবনে মাজাহ হাদীস-১৩৯৪)

সিজদায়ে শুকরে যা বলবে : নামাজের সিজদায় যেসব দোয়া ও জিকির বলা হয় তাই সিজদায়ে শুকরে বলবে।

৩. জানাজা

১. মৃত্যু ও তার বিধান

মানুষের অবস্থাসমূহ : মানুষ একটি স্তরের পর অন্য স্তরে আরোহণ করে এবং একটি অবস্থার পর অপর অবস্থায় পরিবর্তন হয়। এটি সময়ে হোক বা স্থানে কিংবা শরীরে কিংবা অন্তরে।

১. মানুষের জীবনে অবস্থার পরিবর্তন যেমন : নিরাপত্তা থেকে ভয়ভীতিতে, সুস্থ থেকে অসুস্থতে, শান্তি হতে যুদ্ধে, উর্বরতা থেকে দুর্ভিক্ষে, আনন্দ থেকে দুঃচিন্তা ইত্যাদি আবর্তন-পরিবর্ত হতেই থাকে।

২. স্থানের পরিবর্তন যেমন : মানুষ প্রতিদিন এক মঞ্জিল থেকে অপর মঞ্জিলে, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। মায়ের পেট থেকে দুনিয়াতে, দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরের ময়দানে। এভাবে শেষ পাড়ি হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে।

৩. শরীরের অবস্থার পরিবর্তন যেমন : এক স্তর থেকে অপর স্তরে আরোহণ করে। বীর্য থেকে রক্তের টুকরা এবং তা হতে আবার মাংসের টুকরা। এরপর শিশু হতে যুবক ও বৃদ্ধ অতঃপর মৃত্যু।

৪. অন্তরের অবস্থা বড়ই আশ্চর্যজনক। একবার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক আবার দুনিয়ার সাথে। একবার ধন-সম্পদের সাথে, একবার নারীর সাথে, একবার অট্টালিকা ইত্যাদির সাথে ঝুলন্ত। আর অন্তরের সবচেয়ে মহান সম্পর্ক হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক। দুনিয়াকে আল্লাহর ইবাদত বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে। এ চারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। তাই মানুষের করণীয় হলো : সে যেন তার অন্তরের খবরা-খবর রাখে যাতে করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে। আর অন্তরকে পবিত্র করে ও সবর্দা আল্লাহর জিকির, ইবাদত ও আনুগত্যে ব্যস্ত রাখে।

◆ মৃত্যুর সময়-সীমা

মৃত্যু হলো : শরীর থেকে আত্মার বিয়োগের দ্বারা দুনিয়া ত্যাগ করা। চিরস্থায়ী একমাত্র আল্লাহ। তিনি প্রতিটি মাখলুকের জন্য মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। মানুষের বয়স যতই লম্বা হোক না কেন একদিন তাকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। আমলের জিন্দেগী হতে প্রতিদানের জগতে পাড়ি দিতেই হবে। আর কবর হলো আখেরাতের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের অধিকার হচ্ছে : সে অসুস্থ হলে তার পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা করা। আর মারা গেলে তার জানাযায় শরিক হওয়া।

১. আল্লাহর বাণী–

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

বলুন! নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যু থেকে পলায়ন কর কিন্তু মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেই। অতঃপর তোমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হবে। এরপর তিনি তোমাদের কৃত আমলের খবর দিবেন। [সূরা জুমু'আ : আয়াত-৮]

২. আল্লাহর আরো বাণী–

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.

তোমরা যেখানেই যাও না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই-যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। [সূরা নিসা : আয়াত-৭৮]

◆ রোগীর প্রতি যা ওয়াজিব

রোগীর প্রতি ওয়াজিব হলো সে আল্লাহর ফয়সালার উপর ঈমান আনবে এবং তার তাকদীরের প্রতি ধৈর্যধারণ করবে। আর তার প্রতিপালকের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখবে এবং ভয় ও আশা নিয়ে থাকবে। কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহর হকসমূহ আদায় করবে। মানুষের হকগুলো আদায় করবে। তার অসিয়তনামা লিখবে। তার যে সকল আত্মীয়-স্বজন মিরাছ পাবে না তাদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করবে। তবে এর চেয়ে কম হওয়াটাই উত্তম। বৈধ পন্থায় চিকিৎসা করবে। আর সুন্নাত হলো, তার সমস্যার কথা তার প্রতিপালকের নিকট জানাবে এবং তাঁর নিকট আরোগ্য কামনা করবে।

◆ যে জীবনের আশা হারিয়ে ফেলবে সে যা বলবে

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ اِلٰى صَدْرِهَا. وَاَصْغَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বে তার বুকে টেক লাগা অবস্থায় কান পেতে বলতে শুনেছেন : "আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াআল্‌হিক্বনী বির্‌রাফীক্বিল আ'লা।"

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার প্রতি রহম করুন এবং আমাকে আমার মহান বন্ধুর নিকট মিলিত করুন। (বুখারী-৪৪৪০ ও মুসলিম-২৪৪৪)

◆ মৃত্যু কামনা করার বিধান

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ اَلْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهٖ فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "কারো মুসিবতের কারণে মৃত্যু যেন কামনা না করে। যদি মৃত্যুকে কামনা করতেই হয় তবে বলবে : [আল্লাহুম্মা আহ্‌য়িনী মা কানাতিল হায়াতু খইরান লী ওয়া তাওয়াফফানী ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খইরান লী] হে আল্লাহ! যদি বেঁচে থাকা আমার জন্যে মঙ্গল হয় তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্যে কল্যাণময় হয় তবে আমাকে মৃত্যু দান কর।"

(বুখারী হাদীস নং ৬৩৫১ মুসলিম হাদীস নং ২৬৮০)

◆ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির নিয়ম

মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে : পাপ থেকে তওবা করা, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া, সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার

থেকে নিজেকে বিরত রাখা, আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং সকল হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকা।

রোগী দর্শন করতে যাওয়া, তাকে তওবা ও অসিয়তের কথা স্মরণ করানো সুন্নাত। আর তার চিকিৎসা কোন মুসলিম ডাক্তারের নিকটে করানো কাফেরের নিকট নয়। কিন্তু যদি কাফের ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং তার প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকে তবে জায়েয।

◆ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে তালকীনের বিধান

যে রোগীর মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত হবে তার জন্য সুন্নাত হলো, তাকে শাহাদাত তথা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যের তালকীন দেয়া। রোগীকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়া। তার জন্য দোয়া করা এবং তার উপস্থিতিতে ভালো ছাড়া কোন মন্দ কথা না বলা। কোন কাফের ব্যক্তির মৃত্যুতে মুসলিম ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া বৈধ; যাতে করে তার প্রতি ইসলাম পেশ করতে পারে। তাকে বলবে : "বল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" (মুসলিম, মিশকাত হাদীস-১৬১৬)

◆ শুভ মৃত্যুর কিছু আলামত বা লক্ষণ

১. মাইয়েতের মৃত্যুর সময় কালেমা তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" পড়ে মৃত্যুবরণ করা।
২. মুমিনের কপালে ঘাম অবস্থায় মৃত্যু হওয়া।
৩. শহীদ হওয়া তথা আল্লাহর রাস্তায় মারা যাওয়া।
৪. আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়া অবস্থায় মারা যাওয়া।
৫. নিজের জীবন বা সম্পদ কিংবা পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাওয়া।
৬. জুমার রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণ করা; এর দ্বারা সে কবরের ফেৎনা হতে নিরাপদে থাকবে।
৭. বক্ষ্যগ্রহ (Pleurisy) ও যক্ষ্মা রাগে মারা যাওয়া।
৮. মহামারী-প্লেগ অথবা পেটের পীড়ায় কিংবা ডুবে বা পুড়ে অথবা চাপা পড়ে মারা যাওয়া।
৯. মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের সময় মারা যাওয়া।

◆ মৃত্যুর সূক্ষ্ম বুঝ

প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো, সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করা। আর এ কথা না ভাবা যে, মৃত্যু মানে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; কারণ এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছোট দৃষ্টিভঙ্গীর বহি:প্রকাশ। বরং

মৃত্যুকে স্মরণ করা আমল ও আখেরাতের পুঁজি ও প্রস্তুতি। এ দ্বারা বান্দা তার আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি ও আমল বৃদ্ধি করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতি সাড়া দেয়। আর প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী তার আফসোস ও লজ্জাকেই বাড়াবে। আল্লাহ্ যখন তার কোন বান্দাকে বিশেষ কোন জমিনে কব্জ করতে চান, তখন সেখানে তার প্রয়োজন করে দেন আর সে সেখানে গিয়েই মারা যায়।

মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হলো মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রাখা; কারণ নবী করীম ﷺ-এর বাণী–

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

"তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় যেন আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রেখেই মারা যায়।" (মুসলিম হাদীস নং ২৮৭৭)

◆ **মৃত্যুর আলামত**

মানুষের মৃত্যু জানার কিছু নিদর্শন যেমন : চোয়াল বসে পড়া, নাক ঢলে যাওয়া, হাতের পাঞ্জাদ্বয় ঢিল হয়ে যাওয়া, পাদ্বয় শিথিল হয়ে পড়া, চোখ অপলক দৃষ্টিতে দেখে থাকা, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া।

◆ **কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার সাথে যা করণীয়**

১. যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যাবে তখন তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেয়া সুন্নাত। আর চক্ষু বন্ধ করার সময় এ বলে দোয়া করবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

"আল্লাহুম্মাগফির লি-----(এখানে তার নাম উল্লেখ করবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্যীন, ওয়াফসাহ্ লাহু ফী কবরিহ্, ওয়া নাওবির লাহু ফীহ্, ওয়াখলুফহু ফী 'আকিবিহি ফিলগ-বিরীন, ওয়াগফির লানা ওয়ালাহু ইয়া রব্বাল 'আলামীন।" (মুসলিম হাদীস নং ৯২০)

এরপর পুরুষ হলে তার দাড়িগুলো একটি কাপড় দ্বারা বেঁধে দিবে এবং কোমলভাবে তার শরীরের জোড়াগুলো নরম করে দিবে। জমিন থেকে উপরে উঠিয়ে রাখবে। তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে দিবে এবং সমস্ত শরীর ঢাকে এমন একটি বড় চাদর দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে দিবে। অতঃপর গোসল দিবে।

২. একজন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তাকে কেন্দ্রিক চারটি কাজ করতে হবে। যথা- ক. দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা, খ. ঋণ পরিশোধ করা, গ. ওসিয়্যাত পূরণ করা, ঘ. উত্তরাধিকারের মাঝে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে বণ্টন করে দেয়া। আর যে শহরে মারা গেছে সেখানেই সমাধি করা। উপস্থিত ব্যক্তি ও অন্যান্যদের জন্য মাইয়েতের মুখমণ্ডল খোলা এবং চুমা দেয়া ও শব্দ ছাড়া কাঁদা জায়েয।

মৃতের উপর আল্লাহর যে সকল হক তা আদায় করা ওয়াজিব। যেমন যাকাত, নজর-মান্নত, কাফফারা, ফরজ হজ্ব। এগুলোকে ওয়ারিসদের ও ঋণের হকের পূর্বে অগ্রাধিকার দিতে হবে; কারণ আল্লাহর হক পূর্ণ করা বেশি প্রযোজ্য। আর মুমিনের আত্মা তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আটকা থাকে।

নারীর জন্য তার সন্তান অথবা অন্যদের ওপর তিন দিন শোক পালন করা জায়েয। আর স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন। নারী রোজ কিয়ামতে তার শেষ স্বামীর জন্য হবে।

মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি তার জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা হারাম। এটি অশ্রুঝরার উপর অতিরিক্ত জিনিস। মৃতকে তার জন্য বিলাপ করে রোদনের ফলে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আর মুসিবতের সময় গালে চড় মারা, কাপড় ছিঁড়া, মাথার চুল মুণ্ডানো ও ছড়িয়ে রাখা হারাম জাহেলিয়াতের কাজ।

◆ মৃত্যুর সংবাদ মানুষকে জানানো

মৃতের মারা যাওয়ার খবর প্রচার করা জায়েয; যাতে করে মানুষ তার সালাতে জানাযায় উপস্থিত হয় এবং জানাজা আদায় করতে পারে। আর মৃত্যুর খবর দাতার জন্য মুস্তাহাব হলো : খবর দেয়ার সময় মানুষকে মাইয়েতের ক্ষমার জন্য দোয়া করতে বলা। গৌরব ও অহঙ্কার করে মাইকিং ইত্যাদি করে মৃত্যুর খবর প্রচার করা জায়েয নেই।

◆ মুসিবতের সময় মুসিবতগ্রস্ত ব্যক্তি যা বলবে ও করবে

মাইয়েতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি ওয়াজিব হলো : যখন মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারবে তখন ধৈর্যধারণ করা। আর তাদের জন্য সুন্নাত হলো ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা ও সওয়াবের আশা করা এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিঊন" পড়া।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللّٰهُ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا .

১. নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "যে কোন বান্দা তার মুসিবতের সময় বলবে : 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসিবাতী, ওয়াআখলিফ লী খইরান মিনহা' আল্লাহ তার মুসিবতে সওয়াব দান করবেন এবং তার পরিবর্তে তার চেয়েও অতি উত্তম দিবেন।" (মুসলিম হাদীস নং ৯১৮)

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ -

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালক সন্তান মারা যাবে আল্লাহ তাকে তাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারী হাদীস নং ১২৪৮)

ধৈর্যধারণ হচ্ছে নিজেকে অস্থিরতা, জবানকে অভিযোগ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হারাম যেমন : গালে চাপড়ানো ও কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়া থেকে বিরত রাখার নাম।

◆ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ইত্যাদির জন্য (Post mortem) মৃত্যুর পর শবদেহ পরীক্ষা বিধান

মৃত মুসলিম ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য অথবা কোন মহামারী-প্লেগ রোগের তদন্তের উদ্দেশ্যে অংগব্যবচ্ছেদ করা জায়েয; কারণ এর দ্বারা নিরাপত্তা ও ইনসাফের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং জাতিকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচানো হয়। আর যদি অংগব্যবচ্ছেদ শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য হয় তবে মুসলিমের সম্মান জীবিত ও মৃত্যু সর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। এ ব্যাপারে অমুসলিমদের মৃতদেহ অংগব্যবচ্ছেদ করাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে শর্ত মোতাবেক জায়েয হতে পারে।

২. মাইয়েতের গোসল

◆ মাইয়েতকে যে গোসল দেবে

১. যে ব্যক্তি গোসলের সুন্নাত সম্পর্কে বেশি অবগত সেই গোসল দিবে। তাতে তার জন্য সওয়াব রয়েছে যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করে এবং মৃতের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে ও যা কিছু খারাপ দেখবে তা মানুষের নিকট না বলে।

২. বিবাদের সময় পুরুষ মানুষের গোসলের হকদার মৃতের অসিয়তকৃত ব্যক্তিই। এরপর যথাক্রমে তার বাবা, দাদা ও রক্তসম্পর্কিত 'আসাবা' (নিকটাত্মীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করে) তাদের নিকট তারতীবে যে আগে। এরপর মায়ের পক্ষের আত্মীয়-স্বজন।

আর মৃত ব্যক্তি নারী হলে তার অসিয়তকৃত নারী। এরপর মা, দাদী ও নিকট তারতীবে যে আগে। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে গোসল দেয়া জায়েয। আর মৃতকে চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা যথেষ্ট।

মৃতকে গোসলের সময় গোসলদাতা ও যারা তাকে সাহায্য করবে তারা উপস্থিত হবে এবং অন্যান্যদের হাজির হওয়া মাকরুহ।

◆ মাইয়েতের সুন্নতী পন্থায় গোসলের পদ্ধতি

যখন কেউ কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে চাইবে তখন তাকে গোসলের খাটে রাখবে। এরপর তার আওরতকে ঢেকে দিয়ে তার শরীরের কাপড় খুলে নিবে। অত:পর প্রায় বসার মতো করে তার মাথাকে উঁচু করবে। এরপর নরম করে তার পেটকে চাপবে ও বেশি করে পানি ঢেলে ময়লা বের করে নিবে। এরপর গোসলদাতার হাতে একটি নেকড়া পেঁচিয়ে বা হাত মোজা পরিধান করবে। অতঃপর গোসলের নিয়ত করে প্রথমে সালাতের ওযুর মতো ওযু করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। বরং ভিজা আঙ্গুলদ্বয় নাকে ও মুখে প্রবেশ করাবে।

অতঃপর কুল পাতা বা সাবান মিশ্রিত পানি দ্বারা প্রথমে মাইয়েতের মাথা ও দাড়ি ধৌত করবে। এরপর ঘাড় হতে পা পর্যন্ত প্রথমে ডান পার্শ্ব ধৌত করবে। এরপর বাম পার্শ্বের উপর রেখে ডান দিকের পিঠ ধৌত করবে। অতঃপর অনুরূপভাবে বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার প্রথম বারের মতো ধৌত

করবে। যদি পরিষ্কার না হয় তবে বেজোড় করে পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত ধৌত করবে। আর গোসলের শেষ বারে পানির সঙ্গে কাফূর বা আতর-সেন্ট মিশিয়ে ধৌত করবে। আর যদি মৃতের মোচ বা নখ বেশি লম্বা হয় তবে কেটে ফেলতে হবে। এরপর একটি কাপড় দ্বারা মুছে নিতে হবে। মহিলার চুলকে তিনটি বেণী করে পিছনের দিকে রাখতে হবে। আর যদি গোসলের পর মৃতের দেহ থেকে নোংরা কিছু বের হয় তবে বের হওয়ার স্থান ধৌত করে তুলা দ্বারা বন্ধ করে আবার ওযু করাতে হবে।

◆ আগুনে পুড়ে মারা গেলে তার গোসলের বিধান

১. যদি মুসলিম ও কাফের একত্রে পুড়ে ইত্যাদিভাবে মারা যায় এবং পার্থক্য করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা মুসলিম তাদের উদ্দেশ্যে সকলকে গোসল, কাফন ও জানাযা করে দাফন করবে।

২. আগুনে পুড়ে মরা বা শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে ইত্যাদি ব্যক্তির গোসল দেয়া যদি সম্ভব না হয় কিংবা পানি না থাকে, তাহলে গোসল, ওযু ও তায়াম্মুম ছাড়াই কাফন পরিয়ে তার জানাযা পড়তে হবে। শরীরের কিছু অংশ যেমন হাত-পা ইত্যাদির উপর জানাযা পড়া জায়েয যদি বাকি অংশ পাওয়া অসম্ভব হয়।

সাত বছর বয়সের ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে নারী বা পুরুষ গোসল দিতে পারবে। যদি কোন পুরুষ অপরিচিত নারীদের মাঝে বা কোন নারী অপরিচিত পুরুষদের মাঝে মারা যায় অথবা গোসল দেয়া সমস্যা হয় তবে গোসল ছাড়াই জানাযা পড়ে দাফন করতে হবে।

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের ময়দানে মৃত শহীদকে গোসল দেয়া চলবে না। এ ছাড়া আর যত শহীদ আছে তাদেরকে গোসল দিতে হবে।

◆ কাফেরকে গোসল দেয়ার বিধান

কোন মুসলিমের জন্য কোন কাফেরকে গোসল দেয়া বা কাফন পরানো কিংবা তার ওপর জানাযা পড়া বা তার মৃতদেহকে বিদায় জানানো কিংবা দাফন করা হারাম। বরং যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের কেউ না থাকে তবে মাটি দ্বারা তাকে ঢেকে দিবে। আর মুশরিক ব্যক্তির মুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের জন্য তার (মুশরিক) মৃতদেহকে দাফনের জন্য সাথে যাওয়া বৈধ নয়।

৩. মাইয়েতের দাফন-সমাধি

মাইয়েতের সম্পদ দ্বারাই তাকে কাফন পরানো ওয়াজিব। যদি তার মাল না থাকে তবে মূল (যেমন : বাবা, দাদা--) ও শাখার (ছেলে, নাতী---) যাদের প্রতি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাদের উপর কাফনের খরচ করা জরুরি।

◆ মাইয়েতকে কাফন পরানোর পদ্ধতি

পুরুষ মাইয়েতকে নতুন তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো ও তিনবার চন্দন কাঠের ধোঁয়ার সুগন্ধি দেয়া সুন্নাত। একটার পর একটা কাপড় বিছিয়ে কাপড়ের মাঝে খোশবু লাগাবে। এরপর মাইয়েতকে তার ওপর চিত করে শায়িত করাবে। এরপর খোশবু লাগানো একটি তুলা দুই নিতম্বের মাঝে রেখে দিবে যা তার সমস্ত শরীরের জন্য সুগন্ধি ছড়াবে। আর একটি নেকড়া দ্বারা ছোট পায়জামার মতো করে তার আওরতের উপর বেঁধে দিবে।

এরপর উপরের কাপড়টি বাম পার্শ্বের দিক হতে ডান পার্শ্বের উপর রাখবে। অতঃপর ডান দিক হতে কাপড়টি নিয়ে বাম পার্শ্বের উপর রাখবে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়টি অনুরূপভাবে করবে। আর মাথার ও পায়ের দিকের অতিরিক্ত কাপড়ে বেঁধে দিবে এবং কোমরের উপর একটি বেল্টের মতো করে বেঁধে দিবে যাতে করে ছড়িয়ে না পড়ে এবং কবরে শায়িত করার পর খুলে দিবে।

মহিলারা পুরুষের মতোই। আর বাচ্চাদের জন্য একটি কাপড়ই যথেষ্ট, তাকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَّلَا عِمَامَةٌ ۔

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইয়েমেনের সাহূলী শহরের তিনটি সাদা সুতি কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছিল, মাইয়েতের দাফন এর মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিল না। (বুখারী হাদীস-১২৬৪, মুসলিম হাদীস-৯৪১)

মাইয়েতের সমস্ত শরীর ঢাকে এমন একটি বড় কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া জায়েয।

◆ শহীদকে কাফনের পদ্ধতি

যুদ্ধের ময়দানে শহীদ ব্যক্তিকে তার কাপড় দ্বারাই কাফন দিতে হবে। গোসল দেয়া লাগবে না। আর তার কাপড়ের উপরে আরো একটি বা একাধিক কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া মুস্তাহাব।

◆ **মুহরিম ব্যক্তির কাফনের পদ্ধতি**

হজ্ব বা উমরার ইহরাম পরা অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি বা সাবান দ্বারা গোসল দিতে হবে। আর কোন প্রকার খোশবু লাগানো ও সেলাইকৃত কাপড় পরানো এবং মাথা-মুখমণ্ডল ঢাকা চলবে না যদি পুরুষ হয়; কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে পুনরুত্থিত হবে। আর তার হজ্বের বাকি কার্যাদি কাজা করারও প্রয়োজন নেই এবং যে কাপড়দ্বয়ে মারা গেছে সেই কাপড়েই কাফন দিতে হবে।

গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তান যদি মারা যায়, যার বয়স চার মাস তবে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা করতে হবে।

যদি গোসলের পর মাইয়েতের শরীর থেকে কোন না-পাক বস্তু বের হয় তবে নতুন করে গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেই; কারণ এতে কষ্ট ও জটিলতা সৃষ্টি হবে।

৪. জানাযা নামায আদায়ের পদ্ধতি

জানাযার জ্ঞান : জানাযার সালাতে হাজির হওয়া ও কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়াতে অনেক উপকার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম : মাইয়েতের উপর জানাযা পড়ে তার হক আদায় করা এবং তাতে সুপারিশ ও দোয়া করা। মৃতের পরিবারের হক আদায় করা। মুসিবতের সময় তাদের ভাঙ্গা অন্তরে প্রশান্তি দান করা। মৃতকে কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়াতে বড় সওয়াব অর্জন করা। আর জানাযা ও কবর দর্শনে ওয়াজ-নসিহত গ্রহণ ছাড়াও অনেক ফায়েদা রয়েছে।

◆ **জানাযা সালাতের বিধান**

জানাযার সালাত ফরজে কেফায়া। এটি মুসল্লীদের সওয়াবে বর্ধন এবং মৃতদের জন্য সুপারিশকারী। জানাযায় লোক সংখ্যা বেশি হওয়া মুস্তাহাব এবং যত মুসল্লী সংখ্যা বাড়বে ততই উত্তম।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি : "যে মুসলিম মাইয়েতের জানাযার সালাত আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করে নি এমন ৪০ জন আদায় করবে তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন।" (মুসলিম হাদীস-৯৪৮)

◆ মাইয়েতের প্রতি জানাযা পড়ার পদ্ধতি

১. যে ব্যক্তি মৃতের উপর সালাতে জানাযা আদায় করতে চায় সে ওযু করে কিবলামুখী হয়ে মাইয়েতকে কিবলা ও তার মাঝে রাখবে।

২. মাইয়্যেত পুরুষ হলে সুন্নত হলো ইমাম সাহেব তার মাথার পার্শ্বে আর মহিলা হলে তার মধ্যখানে দাঁড়াবেন। চার বা পাঁচ কিংবা ছয় অথবা সাত বা নয় তাকবীর দ্বারা জানাযা পড়বেন। বিশেষ করে জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ, নেক ও তাকওয়া সম্পূর্ণ ও ইসলামের ব্যাপারে যাদের উল্লেখযোগ্য খিদমত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জানাজায় তাকবীর বাড়াবেন। তাকবীরের সংখ্যা এককে সময় একেকটা করবে; কারণ এর দ্বারা সুন্নাত জিন্দা হবে।

৩. কাঁধ বা কানের লতি বরাবর দু'হাত উত্তোলন করত : "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম তাকবীর দিবেন। অনুরূপভাবে বাকি তাকবীরও করবেন। ডান হাত বাম হাতের উপর করে বুকের উপর রাখবেন। দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা না পড়ে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা নিরবে পড়বেন। মাঝে মধ্যে ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাও পড়বেন।

(বুখারী হাদীস নং ১৩৭০, মুসলিম হাদীস নং ৪০৬)

৪. এরপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরুদ শরীফ বলবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।" (মানুষকে শিখানোর উদ্দেশ্যে স্বশব্দে পড়াও জায়েয আছে।)

৫. এরপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে ইখলাসের সাথে হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ হতে দোয়া পড়বে যেমন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

ক. "আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়াগ–য়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্য়িহি 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহ্, ওয়া লা তুদিল্লানা বা'দাহ্।"

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস-৩২০১ , ইবনে মাজাহ হাদীস-১৪৯৮)

শাব্দিক অর্থ : اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, اِغْفِرْ – আপনি ক্ষমা করে দিন, لِحَيِّنَا – আমাদের জীবিতদেরকে, وَمَيِّتِنَا – আমাদের মৃতদেরকে, وَشَاهِدِنَا – আর আমাদের উপস্থিতদেরকে, وَغَائِبِنَا – আর আমাদের অনুপস্থিতদেরকে, وَصَغِيْرِنَا – আমাদের ছোটদেরকে, وَكَبِيْرِنَا – আমাদের বড়দেরকে, وَذَكَرِنَا – আমাদের পুরুষদেরকে, وَاُنْثَانَا – আমাদের নারীদেরকে, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, مَنْ اَحْيَيْتَهُ – আপনি যাকে জীবিত রেখেছেন, مِنَّا – আমাদের মধ্যে থেকে, فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ – আপনি তাকে জীবিত রাখেন ইসলামের ওপরে, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ – আর আপনি মৃত্যুদান করার, مِنَّا – আমাদের মধ্য থেকে, فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ – আপনি তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যুদান করুন, اَللّٰهُمَّ – হে আল্লাহ, لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ – তার বিনিময়ে থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না, وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ – আর আমাদের পথভ্রষ্ট করবেন না তারপর।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ

খ. "আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ওয়া'অফিহি ওয়া'ফু 'আনহু, ওয়া আকরিম নুজুলাহু, ওয়া ওয়াসসি' মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমায়ি ওয়াছছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়া নাক্বক্বিহি মিনালখাত্বা–ইয়া কামা নাক্বক্বাইতা ছাওবাল আবইয়াদা মিনাদদানাস, ওয়া আব্দিলহু দারান খইরান মিন দারিহি, ওয়া আহ্লান খইরান মিন আহ্লিহি, ওয়া জাওজান খইরান মিন জাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া 'আ'ইযহু মিন 'আযাবিল ক্বরি (আও) মিন 'আযাবিন্নার।" (মুসলিম হাদীস নং ৯৬৩)

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنِ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلَ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

গ. "আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনি ফুলানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়ারিক, মিন ফিতনাতিল ক্ববর, ওয়া 'আযাবিন্নার, ওয়া আন্তা আহলুল ওয়াফায়ি ওয়ালহাকক্বি, ফাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম।"

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৩২০২, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৪৯৯)

মাইয়েত যদি ছোট বাচ্চা হয় তবে এ শব্দগুলো মিলাবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا وَفَرَطًا وَاَجْرًا وَذُخْرًا ـ

আল্লাহুম্মাজ'আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বা, ওয়া আজরাওঁ ওয়া যুখরা।" (হাদীসটি হাসান, বাইহাকী হাদীস নং ৬৭৯৪ আলবানী (রহঃ)-এর আহকামুল জানায়িজ পৃঃ ১৬১ দ্রঃ)

৬. এরপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে দোয়া করত: একটু অপেক্ষা করে শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরাবে। আর যদি মাঝে মধ্যে বাম দিকেও দ্বিতীয় সালাম ফিরায় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যদি কারো কিছু তাকবীর ছুটে যায় তবে তার পদ্ধতি মোতাবেক কাজা করে নিবে। আর যদি কাজা না করে ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরিয়ে দেয় তবে তার জানাজার সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

◆ **একাধিক লাশ হলে ইমামের সামনে যেভাবে সারিবদ্ধ হবে**

সুন্নাত হলো মাইয়েতের ওপর জামায়াত সহকারে জানাজা পড়া এবং তিন সারির কম না হওয়া। যদি এক সাথে অনেকগুলো মাইয়েত একত্রিত হয় তবে সুন্নাত হলো ইমাম সাহেব পুরুষ মাইয়েতদের পার্শ্বে দাঁড়াবেন এবং বাচ্চা মাইয়েত থাকলে তাদেরকে কিবলার দিকে পুরুষদের সামনে এবং মহিলা মাইয়েত থাকলে তাদেরকে বাচ্চাদের সামনে রাখবে। এ অবস্থায় সবার জন্য একবার জানাজা পড়লেই যথেষ্ট হবে। আর যদি সবার জন্য আলাদা করে পড়ে তবে জায়েয।

◆ **জানাজার সালাতে দোয়ার পদ্ধতি**

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য বিশুদ্ধ মতে একই দোয়া পাঠ করবে। কেননা দোয়ায় মাসুরা কোনোরূপ পরিবর্তন যোগ্য নয়। কেননা দোয়ায় মাসুরা শব্দসমূহ মূলত ওহীর শব্দ এবং কোনোভাবেই ওহীর শব্দ পরিবর্তন যোগ্য নয়। এক্ষেত্রে লিঙ্গ ও বচন নির্বিশেষে সর্বনামগুলোর কোনোরূপ পরিবর্তন না করে উদ্দেশিত্য অর্থে অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই শুধু নিয়াত করতঃ দোয়া পাঠ করলেই চলবে।

◆ **শহীদের জানাজা পড়ার বিধান**

আল্লাহর রাস্তায় শহীদের জানাজার ব্যাপারে ইমাম ইচ্ছা করলে জানাজা পড়বে আর না হয় না পড়বে। তবে জানাজা পড়াই উত্তম। তাদেরকে তাদের শহীদাস্থ স্থানেই সমাধি করতে হবে। এ ছাড়া যারা শহীদের মৃত্যুবরণ করে যেমন : ডুবে বা পুড়ে ইত্যাদি ভাবে মরা। তারা আখেরাতের শহীদের সওয়াব পাবে। তাদেরকে গোসল দিতে এবং কাফন পরিয়ে অন্যান্যদের মতো তাদের উপর জানাজার সালাত পড়তে হবে।

◆ যার প্রতি জানাজার সালাত পড়া যাবে

১. মুসলিম মাইয়্যাত চাই নেককার হোক বা পাপিষ্ঠ হোক তার ওপর জানাজা পড়া সুন্নাত। কিন্তু সালাত ত্যাগকারীর উপর জানাজা পড়া চলবে না।

২. আত্মহত্যাকারী ও গণিমতের মালে খিয়ানতকারীর উপর বাদশাহ্ ও তার প্রতিনিধি জানাজা পড়বে না; এটি তাদের জন্য শাস্তি ও ধমকি স্বরূপ। সাধারণ মুসলমানরা জানাজার সালাত পড়বে।

৩. যে মুসলিমের প্রতি রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা) বা কেসাস (হত্যার পরীবর্তে হত্যা)-এর শাস্তি প্রয়োগ করে হত্যাকৃত ব্যক্তিকে গোসল, কাফন ও জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে।

◆ জানাজা পড়া ও দাফন করা পর্যন্ত মৃতের সঙ্গে কবরস্থানে যাওয়ার ফযীলত: সুন্নাত হলো ঈমান সহকারে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে মাইয়েতের সাথে জানাজা পড়া ও সমাধি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। মাইয়েতের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়া পুরুষদের জন্য নারীদের জন্য বৈধ নয়। লাশের সাথে কোন বাজনা বা আগুন কিংবা কুরআন তেলাওয়াত অথবা জিকির-দোয়া পাঠ করা চলবে না; কারণ এ সব বিদ'আত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلِّىْ عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মৃত মুসলিমের জানাজায় ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় শরিক হয় এবং জানাজা ও সমাধি করা পর্যন্ত থাকে সে দুই কীরাত নেকি নিয়ে ফিরে আসে। প্রতি কীরাত উহুদ পাহাড় বরাবর। আর যে জানাজা পড়ে দাফনের পূর্বে ফিরে যাবে সে এক কীরাত নেকি নিয়ে ফিরবে। (বুখারী হাদীস-৪৭, মুসলিম হাদীস-৯৪৫)

◆ মাইয়্যেতের ওপর জানাজা পড়ার স্থান

জানাজা পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জানাজা আদায় করাই সুন্নাত ও উত্তম। আর মাঝে মধ্যে মসজিদে জানাজা পড়া জায়েয আছে। যার উপর কোন স্থানেই

জানাজা হয়নি তার উপর দাফনের পরে জানাজা পড়া উত্তম। আর যার উপর জানাজা পড়া হয়নি তার কবরের পার্শ্বে জানাজা আদায় করতে হবে।

যদি কেউ মারা যায় এবং আপনি তার প্রতি জানাজা পড়তে আদিষ্ট কিন্তু পড়েননি তাহলে তার কবরের পার্শ্বে জানাজা পড়ে নিবেন।

◆ অনুপস্থিত মাইয়েতের জানাজা নামাজ আদায়ের বিধান

যে মাইয়েতের ওপর জানাজা পড়া হয়নি এবং লাশও অনুপস্থিত তার প্রতি গায়েবানা জানাজা পড়া সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিনে তার মৃত্যুসংবাদ জানান। রাসূল ﷺ সাহাবাদের নিয়ে মুসাল্লায় যান এবং চার তাকবীর দিয়ে জানাজার সালাত পড়েন।

(বুখারী হাদীস নং ১৩২৭ মুসলিম হাদীস নং ৯৫১)

◆ তাড়াতাড়ি জানাজা পড়ার বিধান

সুন্নাত হলো মৃতদেহকে দ্রুত প্রস্তুত করা ও জানাজা পড়ে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَاِنْ يَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : "তোমরা মাইয়েতের জানাজা তাড়াতাড়ি কর; কারণ যদি সে সৎ হয় তবে তাকে তার সত্যের দিকে পৌঁছে দেয়ায় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি এর বিপরীত হয় তবে অনিষ্টকে তোমাদের ঘাড় থেকে দূর করাই উত্তম।

(বুখারী হাদীস নং ১৩১৫, মুসলিম হাদীস নং ৯৪৪)

মহিলারা পুরুষদের মতোই। যদি কোন জানাজা মুসাল্লায় বা মসজিদে হাজির হয় তাহলে নারীরা মুসলমানদের সাথে জানাজা পড়বে। মহিলারা জানাজার সওয়াবে ও শোক প্রকাশে পুরুষদের মতোই।

◆ **মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের দিকে নেয়া হয় তখন সে যা বলে**

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ : اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَئٍ اِلَّا الْاِنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (রা) বলেছেন : "যখন মৃত ব্যক্তিকে পুরুষরা তাদের কাঁধে করে নিয়ে যায় তখন যদি সে নেককার হয়, তাহলে বলে : আমাকে পৌছে দাও। আর যদি বদকার হয় তাহলে বলে : হায় আফসোস! একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা। মানুষ ব্যতীত সকলে তার আর্তনাদ শুনতে পাবে। আর মানুষ যদি শুনত তাহলে বেঁহুশ হয়ে পড়ত। (বুখারী হাদীস-১৩১৪)

৫. মাইয়েতকে বহন ও দাফন করা

মাইয়েতকে বহন করার পদ্ধতি : সুন্নাত হলো মাইয়্যেতকে চারজনে বহন করা এবং পদাতিকরা তার আগে পিছে ও আরোহীরা পিছনে চলা। যদি কবরস্থান দূরে হয় অথবা বহনে কষ্ট হয় তবে কোন বাহনে করে নিয়ে গেলে অসুবিধা নেই।

মুসলমানদের দাফনের স্থান : নারী হোক পুরুষ হোক কিংবা ছোট বা বড় হোক মুসলমানদের কবরস্থানে সমাধি করতে হবে। আর কোন মসজিদ বা অমুসলিমদের কবরস্থান ইত্যাদি স্থানে কবর দেয়া জায়েয নেই।

◆ **মাইয়েতকে দাফনের পদ্ধতি**

কবরকে গভীর ও প্রশস্ত এবং সুন্দর করা ওয়াজিব। যখন কবর খননের শেষ প্রান্তে পৌছবে তখন কিবলার দিকের পার্শ্বে মাইয়েতকে রাখার মতো জায়গা গর্ত

করবে-যাকে লাহাদ (বগলী) কবর বলা হয়। আর লাহাদ করা শাক্ক তথা সোজা কবরের চাইতে উত্তম। মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ : وَ فِىْ لَفْظٍ : وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

"বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি।" অন্য বর্ণনায় আছে "ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্।" (হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ-৩২১৩, তিরমিযী-১০৪৬)

কিবলার দিকে মুখ করে ঐ গর্তে মাইয়েতের পূর্ণ ডান পার্শ্বের উপর শায়িত করাবে। চিত করে রেখে শুধুমাত্র কেবলামুখী করা ঠিক নয়। এরপর তার উপর বাঁশ বা স্লাব বিছিয়ে দিয়ে মাঝের ফাঁকগুলো কাদা দ্বারা বন্ধ করে দিবে। এরপর তার উপর মাটি দিবে এবং উটের পিঠের মতো করে জমিন থেকে মাত্র অর্ধেক হাত উঁচু করবে। অর্থাৎ দুই দিক ঢালু করে মাঝখান উঁচু করবে।

◆ কবরের উপর ঘর বানানোর বিধান

কবরের উপর ঘর-বাড়ি বানানো, কবর পাকা করা, তার উপর চলা, কবরের নিকটে সালাত আদায় করা, কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়া, তার উপর আগর বাতি-মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো, কবরের উপর ফুলের মালা বা তোড়া দেয়া, কবরে তাওয়াফ করা, তার উপর কিছু লেখা এবং সেখানে ঔরস বা মেলা করা এ সকল কাজ শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম।

◆ কবরের উপর মসজিদ বানানোর বিধান

কোন কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম এবং মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করাও হারাম। যদি মসজিদ কবর বানানোর পূর্বে হয় তবে কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দিতে হবে। আর যদি কবর নতুন হয় তবে কবর খনন করে লাশকে কবরস্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে। আর যদি কবরের উপর মসজিদ বানানো হয় তবে হয় মসজিদকে দূর করে দিতে হবে নতুবা কবরকে দূর করতে হবে। সুতরাং, কবরের উপর যত মসজিদ বানানো হয়েছে সেখানে না ফরজ সালাত আদায় করা যাবে আর না নফল সালাত; কারণ করলে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

সুন্নাত হলো কবরকে গভীর করে খনন করা; যাতে করে দুর্গন্ধ বের না হয় এবং কোন জীবজন্তু খুঁড়তে না পারে। আর নিচে লাহাদ তথা বগলী করাই উত্তম যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অথবা কবরের নিচে মাঝখানে গর্ত করবে এবং সেখানে শায়িত করে স্লাব বা বাঁশ দ্বারা ঢেকে দিয়ে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিবে। এরপর মাটি ঢেলে দাফন করে দিবে। সুন্নাত হলো মাইয়েতকে দিনের বেলা দাফন করা তবে রাত্রিতে দাফন করাও জায়েয।

◆ একাধিক লাশ দাফনের পদ্ধতি

একটি কবরে প্রয়োজন ছাড়া একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা জায়েয নেই। যেমন : নিহতদের সংখ্যা বেশি এবং দাফনকারীদের সংখ্যা কম। এমন সময় তাদের মধ্যে যে উত্তম তাকে কিবলার দিকে প্রথমে কবরে রাখতে হবে। কোন মানুষ মৃত্যুর পূর্বেই নিজের কবর খনন করে রাখা জায়েয নেই।

◆ কবর থেকে লাশ স্থানান্তর করার বিধান

প্রয়োজনে কবরস্থ ব্যক্তিকে তার কবর হতে স্থানান্তরিত করা জায়েয। যেমন : পানি তার কবরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে বা কাফেরদের কবরস্থানে সমাধি করা হয়েছে ইত্যাদি কারণে। কবর হচ্ছে মৃতদের ঘর-বাড়ি এবং তাদের জিয়ারতের স্থান। সেখান হতে তাদেরকে প্রয়োজন ছাড়া কবর খনন করে স্থানান্তরিত করা যাবে না।

◆ কবরে লাশ নামাবে যারা

মাইয়েতকে কবরে নামাবে পুরুষরা নারীরা নয়। আর মাইয়েতের অভিভাবকরাই তাকে কবরে নামানোর বেশি হকদার। সুন্নাত হলো মাইয়েতকে তার পায়ের দিক থেকে কবরে নামানো। দক্ষিণ দিক থেকে মাথা ধরে টেনে উত্তর দিকে কবরে নামাবে। তবে কবরের যে কোন দিক থেকে কবরে নামানো জায়েয আছে। আর মাইয়েতের হাড় ভাংচুর করা হারাম।

◆ লাশের সঙ্গে নারীদের যাওয়ার বিধান

মৃতদেহের পিছনে পিছনে অনুসরণ করা মহিলাদের জন্য হারাম; কারণ তারা দুর্বল, দিল নরম, ধৈর্যহারা এবং মুসিবতকে সহ্য করতে অপারগ। যার ফলে তাদের থেকে এমন হারাম কাজ ও কথা প্রকাশ হতে পারে যা আবশ্যকীয় ধৈর্যের বিপরীত।

◆ কবরকে চিহ্নিত করে রাখার বিধান

মাইয়েতের অভিভাকের জন্য সুন্নাত হলো কবরকে পাথর ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা; যাতে করে পরবর্তীতে তার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার পার্শ্বে দাফন করতে পারে এবং তার দ্বারা তার মাইয়েতের কবরকে চিনতে পারে।

যে ব্যক্তি মধ্য সাগরে অথবা প্লাবিত স্থানে কিংবা এমন জলসায়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে যে তাকে নিকটে কোনো ডাঙ্গায় দাফন করার সুযোগ নেই এবং লাশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা পড়ে পানিতে ভাসিয়ে দিবে।

জীবিত মুসলিম ব্যক্তির বিছিন্ন অঙ্গের জানাজা না দেয়া : কোন অংশ কর্তন করা হলে তা পুড়ানো জায়েয নেই এবং তা গোসল দেয়া লাগবে না ও তার ওপর জানাজা পড়তে হবে নাং বরং একটি নেকড়ায় পেঁচিয়ে কবরস্থানে দাফন করে দিতে হবে।

লাশকে সম্মান দেখানো : যখন কোন লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তখন মুসলিম ব্যক্তির উচিত হলো তার জন্য দাঁড়ানো। আর যে ব্যক্তি বসে থাকবে তার কোন অসুবিধা নেই।

◆ কবরের নিকট ওয়াজ করার বিধান

সুন্নাত হলো যখন লাশের খাট মাটিতে রেখে দেয়া হয় ও দাফন করা তখন বসে যাওয়া। আর মাঝে মধ্যে উপস্থিত জনতাকে মৃত্যু ও তার পরে কি ঘটবে স্মরণ করানো।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ فِى بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَاَتَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَةً اَوْ سَعِيْدَةً : فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلٰى عَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلٰى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ : اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى .

আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদীনার বাকী'উল গারকাদ কবরস্থানে একটি জানাজার পাশে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। এসে তিনি বসে পড়লেন আমরাও তাঁর

চতুষ্পার্শ্বে বসলাম তখন তাঁর সাথে একটি লাঠি ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা নিচু করে তাঁর লাঠি দ্বারা জমিনের ওপর দাগ কাটতে লাগলেন। এরপর রাসূল ﷺ বলেন : "তোমাদের প্রত্যেকের জান্নাত ও জাহান্নামের স্থান এবং কে ভাগ্যবান আর কে দুর্ভাগা লেখা রয়েছে। এ সময় একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা লেখার ওপর ভরসা করব এবং ইবাদত করা ছেড়ে দেব; কারণ যে ভাগ্যবান সে ভালো আমলের দিকে ধাবিত হবে আর যে দুর্ভাগা সে খারাপ আমলের দিকে ধাবিত হবে। নবী করীম ﷺ বললেন :"যারা ভাগ্যবান তাদের জন্যে ভালো কাজ সহজ করে দেয়া হবে আর যারা দুর্ভাগা তাদের জন্যে খারাপ কাজ সহজ করা দেওয়া হবে। এরপর রাসূল ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন : "অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।"

[সূরা লাইল : ৫-১০] (বুখারী হা : নং ১৩৬২ মুসলিম হা : নং ২৬৪৭)

◆ লাশ দাফনের পর মুসলিম ব্যক্তি যা করবে

যে কবরের পার্শ্বে হাজির হয়েছে তার জন্য সুন্নাত হলো দাফনের পর মাইয়েতের দৃঢ়তার জন্য একাকী দোয়া করা এবং তার জন্য ক্ষমা চাওয়া। আর উপস্থিত যারা আছে তাদেরকে ক্ষমার জন্য অনুরোধ করা। তবে মাইয়েতকে তালকীন দিবে না; কারণ তালকীন মৃত্যুর সময় পরে নয়।

◆ যেসব সময়ে লাশ দাফন ও জানাজা পড়া নিষেধ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ (رضى) قَالَ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

উকবা ইবনে 'আমের জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- তিনটি সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মাইয়েতকে

কবর দিতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময় যতক্ষণ উঁচু না হয়, দ্বিপ্রহরের সময় যতক্ষণ না ঢলে যায় এবং সূর্য ডুবার সময় যতক্ষণ না ডুবে যায়।

(মুসলিম হাদীস নং ৮৩১)

◆ **কোন মুসলিম কাফেরের দেশে মারা গেলে যা করতে হবে**

যে কাফেরের দেশে মারা যাবে তাকে গোসল দিয়ে, জানাজা পড়ে সেখানকার মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। আর যদি সেখানে মুসলমানদের কবস্থান না পাওয়া যায়, তাহলে সম্ভব হলে মুসলিম দেশে লাশ নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যদি নিয়ে আসা সম্ভবপর না হয় তাহলে নির্জন প্রান্তরে সমাধি করে কবরকে গোপন করে ফেলবে; যাতে করে কাফেররা তার প্রতি কোন প্রকার সমস্যা না করতে পারে। আর সুন্নাত হলো যে যেখানে মারা যাবে সেখানেই তাকে দাফন করা। তবে মৃতের কোন অসম্মান ও পরিবর্তনের আশঙ্কা না থাকলে তার দেশে বা স্থানে নিয়ে আসা জায়েয।

৬. শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দান

শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের সময় : মৃতের শোকার্ত পরিবারকে দাফনের আগে ও পরে সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত। মুসলিম মাইয়েতের পরিবারের শোকাতুরকে বলবে–

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهٗ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

"ইন্না লিল্লাহি মা আখায, ওয়া লাহু মা আ'ত্বা, ওয়া কুল্লু শাইয়িন 'ইন্দাহু বিআজালিন মুসাম্মা, ফাল্তাসবির ওয়ালতাহ্তাসিব।"

(বুখারী হাদীস নং ৭৩৭৭, মুসলিম হাদীস নং ৯২৩)

◆ **শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধান**

মাইয়েতের শোকাতুর পরিবারকে যে কোন সময় শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যার দ্বারা তারা সান্ত্বনা লাভ করে এমন কথা-বার্তা দ্বারা শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দিবে। তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করবে এবং শরিয়ত সম্মত ধৈর্যধারণ ও সন্তুষ্টি থাকার জন্য বলবে। আর মাইয়েত ও শোকার্তদের জন্য দোয়া করবে।

শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের স্থান : যে কোন স্থানে শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দান করা জায়েয। কবরস্থানে, বাজারে, মুসল্লায়, মসজিদে, বাড়িতে, অফিসে ও রাস্তায়।

মাইয়েতের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট কোন পোশাক যেমন : কালো কাপড় ইত্যাদি পরা জায়েয নেই; কারণ এতে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি নারাজ ও অসন্তুষ্টির বহি:প্রকাশ।

◆ কাফেরদের জন্য শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধান

যে সকল কাফের মুসলিম ও ইসলামের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে না তাদেরকে তাদের মাইয়েতের জন্য দোয়া ছাড়াই সান্ত্বনা দেওয়া জায়েয।

সুন্নত হলো মাইয়েতের পরিবারের জন্য খানা পাকানো এবং তাদের জন্য প্রেরণ করা। আর মাইয়েতের পরিবারের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য খানা পাকানো ও তাদের খানা খাওয়া বিদ'আত।

◆ মাইয়েতের জন্য বিলাপ করে কান্না করার বিধান

বিলাপ ছাড়া স্বাভাবিকভাবে ক্রন্দন করা জায়েয। কাপড় ফাটানো বা চিরানো ও গাল চাপড়ানো এবং শব্দ উঁচু ইত্যাদি করা হারাম। আর এর দ্বারা মাইয়েতের কবরে আজাব হবে যদি সে বিলাপ করে কাঁদার জন্য অসিয়ত করে যায় বা নিষেধ না করে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ (رضى) اَمْهَلَ اٰلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا اَنْ يَاْتِيَهُمْ ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوْا عَلٰى اَخِىْ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ ادْعُوْا لِىْ بَنِىْ اَخِىْ فَجِئَ بِنَا اَفْرُخٌ فَقَالَ ادْعُوْا لِى الْحَلَاقَ فَاَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوْسَنَا ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ জা'ফার (রা)-এর পরিবারকে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করার জন্য সুযোগ দিয়েছিলেন। এরপর রাসূল ﷺ তাদের কাছে এসে বললেন : "আজকের দিনের পর আর আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদবে না"। অত:পর বলেন : "আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে উপস্থিত কর।" এরপর আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো যেন আমারা পাখির বাচ্চার

মতো। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : "নাপিতকে ডাক।" এরপর নাপিতকে নির্দেশ করলে সে আমাদের মাথা মুণ্ডন করে দেয়।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৪১৯২ নাসাঈ হাদীস নং ৫২২৭)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهٖ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

২. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (রা) বলেছেন– মৃত ব্যক্তির কবরে আজাব হয় তার ওপর বিলাপ করে কাঁদার জন্য। (বুখারী হাদীস নং ১২৯২, মুসলিম হাদীস নং ৯২৭)

৭. কবর জিয়ারত

কবর জিয়ারতের হেকমত : কবর জিয়ারতের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে–

প্রথম : আখেরাতের স্মরণ, উপদেশ গ্রহণ ও মৃতদের দ্বারা নসিহত নেয়া।

দ্বিতীয় : মৃতদের প্রতি ইহসান করা যেমন : তাদের জন্যে ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষার দোয়া করা; কারণ জীবতরা যেমন তাদের সাক্ষাৎ করলে ও হাদিয়া দিলে খুশি হয় এর দ্বারা তেমনি মৃতরাও খুশি হয়।

তৃতীয় : জিয়ারতকারী তার নিজের প্রতি ইহসান করে; কারণ এর দ্বারা সে কবর জিয়ারতে শরয়িতের সুন্নাত অনুসরণ করে এবং সওয়াব অর্জন করে।

◆ কবর জিয়ারতের বিধান

পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারত করা সুন্নাত; কারণ এর দ্বারা আখেরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। জিয়ারত শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ এবং মৃতদের প্রতি সালাম দেয়া ও তাদের জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে হতে হবে। মৃতদেরকে ডাকা বা তাদের বা কবরের মাটি দ্বারা বরকত হাসিল ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নয়; কারণ এসব কার্যাদি নাজায়েয।

◆ মহিলাদের কবর জিয়ারতের বিধান

মহিলাদের কবর যিয়ারত করতে (নবী (সা)] নিরুৎসাহিত করেছেন। হারাম করেননি তবে সুন্নাত হলো সে কবরবাসীকে সালাম দিবে এবং কবরস্থানে প্রবেশ না করে তাদের জন্য যে সকল দোয়া উল্লেখ হয়েছে তা দ্বারা দোয়া করবে।

সকল জীবত মানুষের জন্য মৃতদেরকে আহ্বান করা, বিপদ মুক্তির জন্য ডাকা, হাজাত পূরণ ও বালা-মুসিবত দূরের জন্য চাওয়া, নবী-রাসূল ও সৎলোকদের কবরের তাওয়াফ ইত্যাদি করা, কবরের নিকট জবাই করা এবং কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ হারাম ও বড় শিরক, যার কর্তাকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের ভয় প্রদর্শন করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذٰلِكَ اُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشِيَ اَوْ خُشِيَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্তিমকালে বলেন : "ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, যারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।" তিনি (আয়েশা) বলেন : যদি মসজিদ বানিয়ে নেয়ার ভয় না থাকত তবে তাঁর (রাসূল ﷺ)-এর কবর বাইরে প্রকাশ্য স্থানে করা হতো। (বুখারী হাদীস নং ১৩৩, মুসলিম হাদীস নং ২৫৯)

◆ কবরস্থানে প্রবেশের সময় ও জিয়ারতের জন্য যা বলবে

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنِ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ ـ

১. "আসসালামু 'আলা আহলিদ্দিইয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইয়ারহামুল মুস্তাকৃদিমীনা মিন্না ওয়ালমুসতা'খিরীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লালাহিকূন"। (মুসলিম হাদীস নং ৯৭৪)

শাব্দিক অর্থ : اَلسَّلَامُ – শান্তি বর্ষিত হোক, عَلٰى – উপরে, اَهْلِ الدِّيَارِ – এই বাড়ির অধিবাসীদের, مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ – মুমিনদের মধ্য থেকে, وَالْمُسْلِمِيْنَ – মুসলমানদের মধ্য থেকে, وَيَرْحَمُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا – আর আল্লাহর রহম

মুমিন। আর আল্লাহর রহম করুন আমাদের পূর্ববর্তীদের যারা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমাদের পরবর্তী যারা অতিবাহিত হয়ে যাবে। আর নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো যদি আল্লাহ চান।

২. অথবা বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ـ

আসসালামু ‘আলাইকুম দারা কাওমিন মু’মিনীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকূন। (মুসলিম হাদীস নং ২৪৯)

শাব্দিক অর্থ : اَلسَّلَامُ – শান্তি বর্ষিত হোক, عَلَيْكُمْ – আপনাদের ওপরে, دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ – আপনারা যারা মুমিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَاحِقُوْنَ – আর নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো যদি আল্লাহ চাহেন।

৩. অথবা বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

“আসসালামু ‘আলাইকুম আহলাদ দিইয়ারি মিনাল মু’মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লালাহিকূন, আসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল ‘আফিয়াহ্।” (মুসলিম হাদীস নং ৯৭৫)

অর্থ : শান্তি বর্ষিত হউক বাড়ীর অধিবাসীদের মুসলমান ও মুমিনদের ওপর নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

◆ কবর জিয়ারতকারীদের প্রকার

১. যারা মৃতদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। আর তাদের অবস্থা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে ও আখেরাতকে স্মরণ করে। এটি শরিয়ত সম্মত জিয়ারত।

২. যারা কবর জিয়ারতের সময় নিজের ও অন্যান্যদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করে। এ নিয়তে যে কবরের পার্শ্বে দোয়া করা মসজিদের চেয়েও উত্তম। এটি জঘন্য বিদ'আত।

৩. যারা কবর জিয়ারতের সময় বিভিন্ন নবী-রসূল বা অলি-পীরের মর্যাদা বা হক দ্বারা আল্লাহর কাছে অসিলা করে। যেমন বলে : হে আমার প্রতিপালক! অমুকের মর্যাদার মাধ্যমে তোমার নিকট চাচ্ছি। এটি বিদ'আত; কারণ শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য এটি এক বড় মাধ্যম।

৪. যারা আল্লাহকে আহ্বান করে না বরং কবরবাসীদেরকে ডাকে। যেমন বলে : হে আল্লাহর নবী অথবা হে আল্লাহর অলি! কিংবা হে অমুক আমাকে এমনটা দান করুন বা আমাকে রোগ মুক্তি দাও ইত্যাদি। এটি বড় শিরক যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

◆ মুশরিকদের কবর জিয়ারতের বিধান

অমুসলিমের কবর উপদেশ গ্রহণের জন্য জিয়ারত করা জায়েয। তবে তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া যাবে না বরং তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ জানাবে।

কবরস্থান ওয়াজ ও উপদেশ গ্রহণের স্থান। সুতরাং সেখানে কোন প্রকার গাছ লাগানো, টাইলস দ্বারা রাস্তা বানানো ও লাইট জ্বালিয়ে আলোকিত করা এবং যে কোন সৌন্দর্যকরণ জায়েয নয়।

◆ মৃত্যুর পরে মাইয়েতের সঙ্গে যা যায়

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ وَمَالُهُ وعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মাইয়েতের সঙ্গে তিনটি জিনিস যায়। তার মধ্যে দু'টি ফিরে আসে আর একটি তার সঙ্গে বাকি থাকে। পরিবার, সম্পদ ও আমল তার সাথে যায়। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল সঙ্গে বাকি থেকে যায়।

[বুখারী হাদীস নং-৬৫১৪; মুসলিম হাদীস নং-২৯৬]

◆ মৃতের জন্যে সৎকর্ম করা

একজন মুসলিম অপর জীবিত বা মৃত মুসলিমের জন্য ততটুকু করতে পারবে যতটুকু শরিয়তে অনুমতি আছে। যেমন : দোয়া করা, ক্ষমা চাওয়া, তার পক্ষ থেকে হজ্ব-উমরা ও দান খয়রাত করা, মৃতের প্রতি বাকি থেকে যাওয়া ওয়াজিব রোজা কাজা করে দেয়া। যেমন : নজরের রোজা। আর কুরআন পড়ার জন্য মোল্লা-মুনশি বা হাফেজ ভাড়া করে কুরআন খতম দিয়ে তার নেকি মাইয়েতের নামে বখশিয়ে দেয়া বিদ'আত।

৪. মুস্তাহাব সালাতসমূহ

তাহিয়্যাতুল ওযু, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, সালাতুত তাসবীহ, সালাতুল ইসতেখারাহ্, সালাতুল হাযত, আউয়্যাবীন, সালাতুল কদর, সালাতুল বারায়াত ইত্যাকার নামায বিষয়ক শরীয়তের নির্দেশনা।

১. তাহিয়্যাতুল ওযু : ওযু করার পর পরই ঘরে বা মাসজিদে দু রাকায়াত সালাত আদায়ের কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই সালাতের নিষিদ্ধ সময় না হলে ফরজ সালাতের জামায়াত শুরু কিংবা ফরজ সালাতের সময় সংকীর্ণ না হলে এ দু'রাকায়াত সালাত পড়া মুস্তাহাব।

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে আছে, বিলাল (রা)-এর পাদুকার আওয়াজ নবী করীম ﷺ জান্নাতে শুনেছিলেন তাহিয়্যাতুল ওযু সালাত অভ্যাসরূপে আদায় করার বদৌলতে।

সহীহ মুসলিম শরীফ আছে, উত্তমরূপে ওযু করার পর একাগ্রচিত্তে দু'রাকায়াত সালাত আদায় করলে তার জন্যে জান্নাত পাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়।

২. তাহিয়্যাতুল মসজিদ : মসজিদে প্রবেশ করেই দু'রাকায়াত সালাত আদায়ের নির্দেশ আছে রাসূলের কথায় এবং কাজে। এ দু'রাকায়াত সালাত মসজিদের সম্মানার্থে আদায় করা হয় বলে এ সালাতকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত বলে। তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকায়াত সালাত আদায় করলে তাতে তাহিয়্যাতুল ওযূর দু'রাকায়াত সালাতও আদায় হয়ে যায়।

এ সালাতটি নফল বা মুস্তাহাব হলেও আদায় করার তাকিদ রয়েছে সহীহ হাদীসে।

عَنْ قَتَادَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ـ

আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে গমন করে তখন যেনো দু রাকায়াত সালাত না পড়ে না বসে। (বুখারী ও মুসলিম)

জুমুআর দিনে খোৎবাহ দেয়ার সময়ও এ দু'রাকায়াত সালাত আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলের নিকট আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন صَلِّ رَكْعَتَيْنِ দু রাকায়াত সালাত আদায় করে নাও। (মুসলিম)

৩. সালাতুত তাসবীহ : এ সালাতে বিশেষ একটি তাসবীহ বেশি পরিমাণে (৩০০ বার) পাঠ করতে হয় বিধায় এ সালাতকে সালাতুস তাসবীহ বলা হয়। এ সালাত সংক্রান্ত হাদীসটি হলো–

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ (আমার পিতা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বললেন : হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে প্রদান করবো না? আমি কি আপনাকে দেবো না? আমি কি আপনাকে সংবাদ জানাব না? আমি কি আপনাকে শিখিয়ে দেবো না ১০টি কাজ? আপনি যদি তা করেন তাহলে আল্লাহ আপনার অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। পূর্বের, পরের, পুরাতন নতুন, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, ছোট বড়, গোপন প্রকাশ্য সব অপরাধ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। সে কাজটি হলো আপনি ৪ রাকায়াত সালাত করবেন। প্রত্যেক রাকায়াতে সূরায়ে ফাতিহা এবং আরো একটি সূরা পড়বেন। এভাবে ১ম রাকায়াতে কিরাত শেষ করার পর দাঁড়ানো অবস্থাতেই ১৫ বার এ তাসবীহ পড়বেন–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

(বিশেষ কায়দার কথা বলার পর তিনি বললেন : প্রতিদিন সম্ভব না হলে প্রতি সপ্তাহে একবার আদায় করবেন। তাও সম্ভব না হলে প্রতিমাসে একবার আদায় করবেন। সেটাও সম্ভব না হলে বৎসরে একবার আদায় করবেন। আর তাও সম্ভব না হলে জীবন একবার হলেও আদায় করবেন।)

আমাদের দেশের সমাজে সালাতুল তাসবীহ্ আদায়ের গুরুত্ব ও আগ্রহ লক্ষণীয়। বস্তুতঃ এ প্রক্রিয়ায় সালাত আদায়ের কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী, ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটিকে হাদীস বিশারদগণের কেউ সহীহ্ বা হাসান বললেও অন্যান্যগণ তা স্বীকার করেননি; বরং কেউ এটাকে দুর্বল, এমনকি ইবনে জাওযী উপরোক্ত হাদীসটিকে মওযূ বা জাল বলেছেন।

◆ সালাতুত তাসবীহ্ নামায আদায়ের নিয়ম

বর্ণিত হাদীসটিতে ৪ রাকায়াত সালাত আদায়ের নিয়ম বলা হয়েছে। ফাতিহা এবং সূরা পড়ার পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় উপরোক্ত তাসবীহটি ১৫ বার, রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ্ পাঠ করার পর রুকু অবস্থায় ১০ বার, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার পূর্বে ১০ বার, সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীহ্ পাঠের পর ১০ বার, দু'সিজদার মাঝে বসা অবস্থায় ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদায় ১০ বার, তারপর ২য় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসে ১০ বার সর্বমোট (১৫ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ = ৭৫) ১ম রাকায়াতের ৭৫ বার পাঠ করতে হবে। তারপর বসা থেকে দাঁড়িয়ে আবার ১ম রাকায়াতে মতো ৭৫ বার এভাবে সর্বমোট (৭৫ × ৪ = ৩০০) ৩শ বার উক্ত তাসবীহ্ পাঠ করত সালাত শেষ করতে হবে। ২য় বা ৪র্থ রাকায়াতে তাশাহুদ পাঠ করার পূর্বে ১০ বার তাসবীহ্ পড়তে হবে। তারপর তাশাহুদ ও দরুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হবে।

সালাতটির জন্যে কোনো নির্দিষ্ট সূরা নেই। ফাতিহার পর যে কোনো সূরা পড়লেই হবে। তাসবীহের সংখ্যা নিয়মানুযায়ী কম হওয়ার ধারণা হলে যে কোনো রাকায়াতে ৩০০ পূরণ করায় কোনো প্রতিবন্ধক নেই।

৪. সালাতুল ইসতিখারা : 'ইসতিখারা' শব্দটির আরবি অর্থ পরামর্শ বা কল্যাণ অনুসন্ধান করা। মানুষ তার সীমিত জ্ঞান দ্বারা কোনো কাজের কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করতে পারে না। আবার কখনো কোনো কাজ করার বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখী হলে একজন মুসলমান বিশেষ নিয়মে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার স্বীকৃত পদ্ধতি অবলম্বন করবে। এই বিশেষ সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করাকেই শরীয়তের পরিভাষায় ইসতিখারার সালাত বলে।

আইয়্যামে জাহিলিয়াতের জনগণ বিয়ে-শাদী, ব্যবসায় বাণিজ্য দেশ-দেশান্তরে সফর করা ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয়ে তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করত। এরূপে ভাগ্য পরীক্ষা করা শির্ক। তাই আল্লাহর রাসূল তদস্থলে জটিল ও দ্বিধাগ্রস্ত কাজগুলো আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়ার শিক্ষা দিলেন, যাতে সালাতুল ইসতিখারা বলা হয়।

যাবির (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যাবতীয় জটিল কাজে ইসতিখারা করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

◆ ইসতিখারা সালাত আদায়ের নিয়ম

ইশার সালাতের পর শোয়ার পূর্বে নতুন করে ওযু করত একাগ্রচিত্তে দুরাকায়াত সালাত আদায়ের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি অত্যন্ত আবেগ ও বিনয়ের সাথে বিশেষত দোয়াটির অর্থের প্রতি খেয়াল করে পড়তে হবে। দোয়াটির যে স্থানে هٰذَا الْاَمْرَ লেখা আছে সে স্থানে মনে মনে স্বীয় কাংখিত কথা বা কাজটি স্মরণ করবে। অতঃপর পবিত্র বিছানায় ওযুসহ কিবলামুখী হয়ে শয়ন করবে। ঘুমে কাংখিত বস্তু সম্পর্কে কোনো ইশারা ইংগিত পেলে তদানুযায়ী কাজ করতে হবে। অন্যথায় মনের ঝোঁক বা প্রবণতা যেদিকে সায় দিবে সেদিকেই কাজ করলে ইনশাআল্লাহ কাজটি শুভ হওয়ার আশা করা যায়। একথা মনে রাখতে হবে যে, ইসতিখারা সালাত আদায়ের অর্থ এ নয় যে, তদ্বারা গাইব বা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান হওয়া কিংবা কাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া। একবার ইসতিখারা করায় পরিতৃপ্ত না হলে ৭ দিন পর্যন্ত করা যায়। দোয়াটি হলো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ . فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ . اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةَ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ . وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌তাখিরুকা বি ইলমিকা, ওয়াসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়াস আলুকা মিন ফাদলিকাল আযীম। ফাইন্নাকা তাকদিরু, ওয়ালা আকদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু, ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাজার আমরা খাইরুন লী ফি দীনি ওয়া মা'আশী ওয়া আকিবাতা আমরী ফাকদিরহু লী ওয়া ইয়াস্যিরহু লী, ছুম্মা বারিক লী ফিহি। ওয়া ইনকুনতা তা'লামু আন্না হাজাল আমরু শাররুন লী ফী দ্বীনি ওয়া মা'আশী ওয়া আকিবাতি আমরী ফাআসরিফহু আন্নী ওয়া আসরিফনী আনহু ওয়াআকদির লীয়াল খাইরা হাইসু কানা সুম্মারদিনী বিহি।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নিকট তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এ বিষয়ে ইসতিখারা (মঙ্গল কামনা) করছি। তোমার ক্ষমতার সাহায্যে তোমার কাছে এ বিষয়ে কল্যাণ লাভের সামর্থ প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট তোমার মহান অনুগ্রহ ও কল্যাণের ভাণ্ডার থেকে প্রার্থনা করছি। তুমি তো সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখ। আমার কোনোই ক্ষমতা নেই। তুমি তো সব কিছুই জান। আমি তো কিছুই জানি না। সব অদৃশ্যের তুমিইতো একমাত্র মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার মনস্থ করা এ বিষয়টি আমার জন্যে আমার দীর্ঘ জীবন-জীবিকা এবং আমার আখিরাত ও পরিণতির জন্যে মঙ্গলজনক হবে বলে জানো তাহলে তা আমার জন্যে নির্ধারণ করে দাও। তা আমার জন্যে সহজ করো এবং তা আমার জন্যে বরকতময় করে দাও। আর যদি তা আমার দ্বীন জীবন জীবিকা ও আখিরাতের পরিণতির জন্যে ক্ষতিকর হবে বলে জানো তাহলে তা আমার থেকে অন্যদিকে ফিরায়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে ফিরায়ে রাখ। আর আমার জন্যে মঙ্গল নির্ধারণ কর তা যেখানেই থাকি না কেন এবং তার ওপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখ। (বুখারী, মিশকাত হাদীস-১৩২৩)

৫. সালাতুল হাজাত : মহান আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন : وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর) সাহায্য কামনা কর।

আল্লাহর রাসূল এবং সাহাবীগণও কোনো সমস্যা সম্মুখীন হলে সালাত আদায় করার পর সমস্যা সমাধানের জন্যে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আউফ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিতে আছে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ কিংবা মানুষের নিকট

কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সে যেন উত্তমরূপে ওযু করত দু রাকায়াত সালাত পড়ে। তারপর আল্লাহর প্রশংসা এবং নবীর ওপর দরূদ পড়ার পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ে। দোয়াটি হলো–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا لَكَ وَرِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি পরম ধৈর্যশীল, মহিমান্বিত মহান আরশের রব, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সমস্ত প্রশংসা কুল মাখলুকাতের পালনকর্তার। হে পরম দয়ালু ও করুণাময়! আমি তোমার নিকট তোমার রহমত লাভের উপাদানসমূহ, তোমার ক্ষমা লাভের দৃঢ়তা, প্রত্যেক সৎকাজের নির্যাস লাভ এবং অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকার প্রার্থনা করছি। তোমার ক্ষমা ছাড়া আমার কোনো অপরাধ এমনিতে ছেড়ে দিও না। আমাকে বিপদমুক্ত রাখো এবং আমার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দাও যা তোমার সন্তুষ্টি লাভে সহায়ক হবে।

[উপরোক্ত হাদীসটি বিশুদ্ধতায় হাদীস বিশারদগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন হাদীসটি গরীব, কারো মতে মাতরূক। তবে অনেকেই হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।]

৬. আওয়াবীন সালাত : 'আওয়াব' اَوَّابٌ আরবি শব্দের বহুবচন আউয়্যাবীন। এর অর্থ নিবেদিত বা প্রত্যাবর্তনকারীগণ। যারা এ সালাত আদায় করে তারা আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী কিংবা নিবেদিত প্রাণরূপে গণ্য বিধায় এ সালাতকে আউয়্যাবীন সালাত বলে।

হাদীসে সালাতুজ্জোহা বা চাশতের সালাতকেই আউয়্যাবীন বলা হয়েছে। মাগরিবের পরের ছয় রাকায়াতের নাম সালাতুল আউয়্যাবীন বলে কোনো হাদীসে উল্লেখ নেই।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ .... اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন 'সালাতুল আউয়্যাবীন' তখনই (পড়বে) যখন উটের বাচ্চা রোদে পুড়তে আরম্ভ করে। (মুসলিম)

তবে মাগরিবের পর ৬ থেকে ২০ রাকায়াত নফল সালাতের ফযীলতের কথা বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। যেমন তিরমিযীতে বলা হয়েছে–

যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ২০ রাকায়াত সালাত আদায় করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (তিরমিযী হাদীস-৪৩৫ দুর্বল)

অপর হাদীসে আছে ৬ রাকায়াত পড়লে ১২ বছর ইবাদাত করার সমান নেকী পাওয়া যাবে। (তিরমিযী হাদীস-৪৩৫ দুর্বল, ইবনে মাজা হাদীস-১১৬৭)

(এ জাতীয় সালাতের ফযীলত পূর্ণ হাদীসগুলো জঈফ বা দুর্বল)

৭. শবে বরাতের সালাত : শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত বাংলাদেশ, পাক-ভারত উপমহাদেশে 'শবে বরাত' নামে অভিহিত। 'শব' ফার্সী শব্দ অর্থ রাত আর 'বরাত' আরবি শব্দ অর্থ মুক্তি। 'শবে বরাত' অর্থ মুক্তির রজনী। ফার্সী ও আরবি মিশ্রিত শবে বরাত শব্দটি কেমন করে এ উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নেয় তা আজও অজানা। তবে এ রাতের বহুল প্রচলিত রুসম ও রেওয়াজ, আচার-অনুষ্ঠান দর্শনে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, শত শত বছর পূর্বের কোনো অতি উৎসাহী মরমীবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী 'শবে বরাত' শব্দ তথা এর কর্মকাণ্ডের হোতা ও উদ্ভাবক। হাদীসের কোথাও 'শবে বরাত' শব্দটির অস্তিত্ব নেই। এ রাতকে হাদীসের ভাষায় বলা হয়েছে নিছফু মিন শাবান তথা শাবানের অর্ধেক।

এ রাত্রির গুরুত্ব ও ফযীলত বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস শ্রুত আছে। আবার এ রাতে বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট সূরাসহ দু'রাকায়াত থেকে ১০০ রাকায়াত নামাজ আদায়ের কথাও হাদীস দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

'মিশকাত' নামের হাদীস গ্রন্থে আয়েশা (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এ রাতে লিখা হয় আদম সন্তানের জন্ম-মৃত্যু সময়, নির্ধারিত হয় রিযক। লিপিবদ্ধ করা হয় আগামী ১ বছরের ভাগ্য।

ইবনে মাজাহ আলী (রা)-এর সূত্রে বলেছেন, এ রাতে আল্লাহ নিকটতম আসমানে এসে মানুষের চাওয়া পাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। ক্ষমা প্রার্থীকে ক্ষমা করেন, রিযক প্রার্থীকে রিয্ক দেন, মুসিবত থেকে মুক্তিকামীকে মুক্তি দেন। এভাবে সূর্যোদয় পর্যন্ত দিতে থাকেন।

আলী (রা) এক বরাত দিয়ে একথাও লিখা আছে, এ রাতে কেউ প্রতি রাকায়াতে ১০ বার করে সূরায়ে ফাতিহা ও ইখলাসসহ ১০০ রাকায়াত নামাজ পড়লে আল্লাহ্ তার মনের সকল বাসনা পূরণ করবেন। সে পাপী হলে তাকে নেককাররূপে লিপিবদ্ধ করবেন এবং আল্লাহ্ তার নিকট ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করবেন, তারা এ ব্যক্তির জন্য বছরব্যাপী নেক লিখতে এবং গুনাহ মুছে ফেলার কাজে নিয়োজিত থাকবেন।

হাদীস ভুবনের উজ্জ্বল নক্ষত্র তথা বিশ্বখ্যাত, সর্বজনস্বীকৃত, হাদীস বিশারদগণ কথিত শবে বরাতের ফযীলত ও গুরুত্ব বিষয়ক হাদীসগুলোকে জঈফ, জাল, বাতিল বলেছেন এবং সালাত আদায়ের অভিনব পদ্ধতিকে মনগড়া, বাতিল ও মিথ্যা বলেছেন।

ইবনে মাজাহ ও তিরমিযীতে আয়েশা (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে যে হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে, শুধুমাত্র যে হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ সহীহরূপে সমর্থন করলেও হাদীস শাস্ত্রের শিরোমণি ইমাম বোখারী এ হাদীসটিকে জঈফ বা দুর্বল বলেছেন।

হাদীসটি হলো : মুমিনীর জননী আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলকে ঘরে না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হয়ে তাঁকে বাকী নামক কবরস্থানে পেলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন– আয়েশা তুমি এখানে কি মনে করে এসেছ? আমি বললাম, আমি মনে করেছিলাম আপনি আপনার অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গমন করেছেন। তখন তিনি বললেন, মহান আল্লাহ এ রাতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসেন এবং বনি কালব গোত্রের মেষ পালের পশম সংখ্যক এবং তারও অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন।

সূরায়ে দুখানের ৩ নং আয়াত– اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

"নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি মোবারকময় রজনীতে" উল্লেখিত لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ মুবারকময় রজনী বলতে শবে বরাতকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রায় সকল মুফাসসরীনের কেরাম বলেছেন– বরকতময় রাত বলতে কথিত লাইলাতুল বরাত নয় বরং এ রজনী হলো লাইলাতুল কদর। যা সূরায়ে কদরে স্পষ্ট বলা হয়েছে। اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'আমি অবশ্যই এটি কদরের রাতে নাযিল করেছি'। আর কদরের রাত হলো রমযানের শেষ ১০ দিনের বিজোড় সংখ্যার মধ্যে।

এ রাতের করণীয় কাজ : একটি সমর্থিত হাদীস দ্বারা এ রাতের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হওয়ায় এ রাতে এমন কাজ করতে হবে যা কুরআন হাদীস সমর্থিত। সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম ইবাদাত হওয়ায় এ রাতে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নফল সালাত আদায় করা যেতে পারে। কুরআন অর্থসহ্ তিলাওয়াত করা, হাদীস ও ধর্মীয় গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করা, যিকির আযকারে মশগুল থাকা, স্বীকৃত তাসবীহ-তাহ্লীল অধিক পরিমাণে পাঠ করা, নবী আলাইহিস সালামের শিখানো দরুদ ও সালাম রাসূলের ওপর অধিক পরিমাণে পাঠ করা, মৃত ও কবরে শায়িত বাপ-মা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী তথা গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মতের নাযাতের জন্যে দোয়া করা ইত্যাকার ইবাদাতে বদনী ও লিসানী বা কায়িকী ইবাদতে নিমগ্ন হওয়া যায়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীনকে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় দেয়া, অনাথ এতীম, মিসকীন, নিঃস্ব গরীবকে সাহায্য করা, রোগীর সেবা করা বিপদগ্রস্তের সাহায্যে এগিয়ে আসা ইত্যাকার ইবাদাতে মালী বা আর্থিক ইবাদাতের মাধ্যমে এ রাত্রির মর্যাদা ও ফযীলত ধারণ করা যায়।

◆ **এ রজনীর বর্জনীয় কাজ**

১. হালুয়া রুটির সমারোহ বন্ধ করা। এ রাতে রিযক বণ্টন বা ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার অগাধ বিশ্বাসে মুসলিম সমাজের প্রায় সর্বস্তরের জনগণের মাঝে হালুয়া রুটি তৈরি ও বণ্টনের এক হিড়িক পড়ে যায়। বিভিন্ন ডিজাইনের রুটি এবং রকমারী স্বাদের হালুয়া নির্মাণের এ যেনো একটি প্রতিযোগিতার রাত। এ রাতে এতো অধিক পরিমাণে রুটি তৈরি ও বণ্টন হয় যে আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও গরীব-মিসকীন সেগুলো খেয়ে সাবাড় করতে পারে না। ফলে আটা বা ময়দায় বানানো রুটি রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। (পত্রিকায় প্রকাশ)

২. আতশ বাজি বন্ধ করা। আতশবাজী করার রহস্য কি তা জানা যায়নি। এ রাতে কানফাটা আতশবাজীর কারণে মহল্লায় ঘুমানো কিংবা মসজিদে একাগ্রচিত্তে ইবাদাত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় বা সরকারিভাবে বাধা দিয়েও তা রোধ করা যায় না।

৩. মোমবাতি, আগরবাতি লোবান জ্বালানো। এ জাতীয় কার্যক্রমে রাতটিকে উৎযাপন করার বাউল বা মরমীবাদ ও আধ্যাত্মবাদের চর্চা করার প্রচ্ছন্ন ইংগিত। এদেশের আউল-বাউল, মরমী ও তথাকথিত পীর-ফকির, সুফী-দরবেশের দরবার বা আস্তানায় অগ্নি পূজকদের ন্যায় মোমবাতি আগরবাতি লোবান জাতীয় ধাহ্যবস্তু জ্বালিয়ে থাকে।

৪. কবর, মাযার, দরগাহ্ ও কবরস্থানে ঘুরাঘুরি করা। মৃত ব্যক্তিদের আত্মা এ রাতে জীবিত আত্মীয়দের নিকট ধর্ণা দেয়, এ ধারণায় ঐসব জায়গায় লোকগণের সমাবেশ ঘটে থাকে এবং তারা অন্য দিনের তুলনায় অধিক পরিমাণে দান সদকাহ্ করে থাকে। শরীয়তসম্মত উপায়ে কবর যিয়ারত করা এবং গরীবকে দান করা অবশ্যই সওয়াব ও নেক কাজ। কিন্তু ঐ রাতকে এজন্য নির্ধারণ করা এবং ঐ রাতেই যিয়ারত ও দান সদকাহ্ অধিকতর কার্যকর মনে করা ঠিক নয়।

৫. রাসূলের ওপর দরূদ পাঠের উদ্দেশ্যে মিলাদ পড়ার অনুষ্ঠান করা। আল্লাহ্র রাসূলের উপর দরূদ পাঠের সঠিক পদ্ধতি সহীহ্ ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও 'মিলাদ' নামের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দরূদ পড়া শরীয়ত সম্মত নয়। মিলাদের অনুষ্ঠানে ২০০ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানিতে সামনে থাকে জ্বলন্ত মোমবাতি, আগরবাতি। উপস্থিত সকলকেই বরণ করা হয় আতর ও সুগন্ধি মাখানোর মাধ্যমে। গোলাপের জল (পানি নয়) ছিটানো হয় সকলের উপর। এরূপ একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে মিলাদের অনুষ্ঠানের পরিচালক কতিপয় বানানো কথা ছন্দাকারে পড়লে উপস্থিত জনতা সমস্বরে সুর লহরিতে গেয়ে উঠে কতিপয় বানানো ছন্দময় পংক্তি, যেটাকে তারা দরূদ ও সালাম বলে থাকেন। এক পর্যায়ে উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে যান তাদের পরিভাষায় 'কিয়াম' নামে অভিহিত। দাঁড়ানোর যৌক্তিকতায় তারা বলেন, ইয়া নাবী! বলে সম্বোধন করতেই মহানবী স্বশরীরে হাজির হন।

আর মহানবীর উপস্থিতিতে বসে থাকা চরম বেআদবী। আবার কোনো কোনো অনুষ্ঠানে পরিচালকের পার্শ্বেই রাখা হয় একটি খালি চেয়ার। রাসূল ﷺ এসে এ খালী চেয়ারে আসন গ্রহণ করে থাকেন। এরূপ ধারণা পোষণ করা, এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে এ জাতীয় অনুষ্ঠান করা হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তথা একবারে নিষিদ্ধ। সাহাবী, তাবেঈ, সলফে সালেহীন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন, বিশ্বস্বীকৃত, নন্দিত গবেষক, চিন্তাবিদ এবং ৪ ইমামের কেউ এ জাতীয় অনুষ্ঠান করেননি কিংবা করার জন্য বলেননি। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান সময়ের কিছু সংখ্যক আলেম অজ্ঞতায় কারণে এরূপ অন্যায় কাজের শিকার হয়ে গেছেন।

৬. আলোক সজ্জা করা। শহরের বাসা-বাড়ি এমনকি সরকারি বাসভবনকে এ রাতে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। ফযীলত লাভ করার উপায় হচ্ছে পরিশ্রম করা। আলোক সজ্জার মাধ্যমে আনন্দ-উৎসব করে ফযীলত হাসিলের আশা পোষণ করা কি অজ্ঞতা ও মূর্খতা নয়? অধিকন্তু এরূপ করা অপচয়। আর অপচয়কারীকে আল্লাহ্ তায়ালা শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৮. লাইলাতুল কদরের সালাত : রমযান মাসকে বলা হয় (سَيِّدُ الشُّهُوْرِ) 'মাসের নেতা' ১২ মাসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস হলো রমযান মাস। এ মাস শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হওয়া। এ মাসেরই অপর একটি রাত ৩৬৫ রাতের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ রাত। এ রাতের ফযীলত ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন এবং এ রাতের নামানুসারে একটি সূরার নামকরণ করা হয় 'আল কদর' নামে। এ রাত বিষয়ে আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করলেন–

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ .

"কদরের রাত ১০০০ মাস (৮৩ বছর ৪ মাস সমান) অপেক্ষা উত্তম।"

উত্তম হওয়ার কারণগুলো আল্লাহ্ স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন এভাবে–

১. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়–

২. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ এ রাতে ফেরেশতাগণ পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করেন–

৩. وَالرُّوْحُ فِيْهَا বিশেষত জিব্রাইল (আ) ও–

৪. এ রাতে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলি উপস্থাপিত হয় অবতীর্ণ ফেরেশতাগণের মাধ্যমে– مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

৫. এ রাতে শান্তি, মংগল, কল্যাণ, রহমত, দয়া, কৃপা, ক্ষমা ও অনাবিল শান্তির ফল্গুধারা অবারিতভাবে বইতে থাকে– سَلَامٌ ।

৬. শান্তি ও প্রশান্তির স্রোতস্বীনি প্রবাহিত করেন আগমনকারী সমবেতভাবে ফেরেশতাগণ।

৭. শান্তি ও কল্যাণ, দয়া ও রহমত বণ্টনের ধারা অব্যাহত থাকে সূর্যোদয় পর্যন্ত– حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ . ।

অপরদিকে আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের নিকট এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে এমন উত্তম রজনীর বরকত ও ফযীলত অর্জন করতে পারল না, সে সমস্ত কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত রইল। বস্তুত যে এ রাতে সামান্যও ইবাদত বন্দেগী করল না সে ব্যক্তি সবচেয়ে হতভাগা!

◆ সে রাত কোনটি?

সহীহ্ বুখারী শরীফে আয়েশা (রা) সূত্রে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা রমযানের শেষ ১০ দিনের যে কোনো বিজোড় তারিখে কদরের রাত খোঁজ কর।

উপরোক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে রমযানের ২০, ২২, ২৪, ২৬, ২৮ তারিখ দিবাগত রাত লাইলাতুল কদর হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। প্রকাশ থাকে যে শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্দিষ্টভাবে ২৬ দিবাগত রাত্রিকে অর্থাৎ ২৭ তারিখের রজনীকে কদর রজনী হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং শেষ দশকের ৫টি বিজোর রাত্রিকে সম্ভব্য শবেকদর হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুতরাং শুধু মাত্র ২৬ দিবাগত রাত্রিকেই কদর রজনী হিসেবে পালন করা শরীয়ত সম্মত নয়।

কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী কদরের রাত সর্বোত্তম হওয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো। কাজেই এ রাতের ফযীলত ও বরকত অর্জনে ধন্য হওয়ার জন্যে প্রতিটি মুসলমানের আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক।

যে কোনো পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্যে শ্রম দিতে হয়। ফল ও ফসল লাভের জন্যে উৎপাদন করতে হয়। এ স্বাভাবিকতার সূত্র ধরেই বলতে হয়, এ রাতের ফযীলত পাওয়ার জন্যে অবশ্যই শ্রম দিতে হবে। প্রথমত: সারারাত জাগ্রত থাকতে হবে। কেননা কুরআনের ঘোষণা হলো, ফজরের পূর্ব পর্যন্ত শান্তির ফল্গুধারা অব্যাহত থাকে।

নফল সালাত দীর্ঘ বা নাতিদীর্ঘ সূরার মাধ্যমে যত রাকায়াত সম্ভব আদায় করা। একথা সতসিদ্ধ যে, সালাত হলো একের ভিতর তিন ধরনের ইবাদত। অর্থাৎ নামাযে আছে–

১. কুরআন তিলাওয়াত

২. তাসবীহ তাহলীল

৩. রাসূলের ওপর দরূদ পাঠ।

৪. কুরআন অর্থসহ তিলাওয়াত, হাদীস, ধর্মীয় গ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য পাঠ।

৫. জরুরি মাসআলা শিক্ষা ও শিক্ষাদান।

৬. রাসূলের ওপর অধিক পরিমাণ দরূদ পাঠ।

৭. কুরআন হাদীস সমর্থিত তাসবীহ তাহলীল যিকর আযকারে লিপ্ত থাকা।

আমাদের মুসলিম সমাজের জন্যে এটা খুবই বেদনায়ক ব্যাপারে যে, লাইলাতুল কদরের ফযীলত, বরকত, শান্তি ও রহমতের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এ রাত্রিটি কথিত শবে বরাতের তুলনায় উপেক্ষিত, অবহেলিত। শবে মিরাজ, শবে বরাত, শবে কদরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যেসব সালাত আদায়ের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা আছে, এগুলোর হাদীস ভিত্তিক কোনো প্রমাণ নেই।

ফাতিহায়ে ইয়াযদহম, আখেরী চাহারশম্বা, এগার শরিফ ইত্যাকার ফারসী শব্দের কিছু পর্ব আমাদের সমাজে পালিত হয়ে থাকে। এমনকি এদিনগুলোর সম্মানার্থে সরকারি ছুটিও হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক লোক মহা ধুমধামে এ পর্বগুলো সওয়াবের আশায় পরম তৃপ্তি ও ভক্তিসহকারে পালন করে আত্মতৃপ্ত হয়ে থাকে। অথচ এসব পর্ব পালনের শরঈ কোনো নির্দেশ নেই, নেই কোনো যৌক্তিকতা।

সুতরাং আমাদের উচিত প্রথমত কুরআন হাদীসের সঠিক জ্ঞান লাভ করা। তারপর তদানুযায়ী আমল করা। বস্তুতঃ কুরআনের 'ইকরা' (পড়) শব্দযুক্ত প্রথম বাণী নাযিল হওয়ার এটাই অন্যতম তাৎপর্য যে, মুসলিম জাতি জ্ঞানে পরিপক্ক, অভিজ্ঞ ও বিশারদ হবে। আজকের বিশ্বে মুসলিম জাতির অধঃগতি ও নিপীড়িত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো সঠিক জ্ঞানের অভাব, মূর্খতা ও অজ্ঞতা। এ অবস্থা থেকে নাজাত পেতে হবে।

৫. ক. রাসূলুল্লাহ-এর সালাতের আলোকে প্রচলিত ৫০টি ভুল সংশোধন

১. মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা : নিয়ত হচ্ছে মনের ব্যাপার, মন থেকেই তা করতে হয়। এটা মুখের বিষয় নয়। মুখে উচ্চারণ করলে সেটা আর নিয়তের মধ্যে থাকে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন, মুখে নিয়তের উচ্চারণ দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি সঞ্চিত হয়ে থাকে। কেননা, এটা সম্পূর্ণ বেদআত। তাই অযু, গোসল, সালাত, রোযা ইত্যাদি ইবাদতে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা যাবে না। এ কাজ যদি ভালো ও সওয়াব হতো, তাহলে আমাদের পূর্বসূরীরা এ কাজ নিজেরা আদায় করতেন এবং অন্যদেরকে করার জন্য উৎসাহিত করতেন। এটাকে যদি আমরা হেদায়েতের অংশ ধারণা করি, তাহলে নাউজুবিল্লাহ, তারা এ বিষয়ে হেদায়াত লাভ করেননি; বরং গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছেন। আর তারা যা করেছেন সেটা যদি হেদায়েত হয়, তাহলে হেদায়েতের পরে আর কি কথা? সেটা গোমরাহী ছাড়া অন্য কিছু নয়। মহানবী সাহাবায়ে কেরাম, তাবে ও তাবেঈগণ মুখে কখনো নিয়ত উচ্চারণ করেননি। তারা শুধু মনে মনেই নিয়ত করেছেন। শুধু হজ্জের ইহরামের সময় মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেছেন।

২. মসজিদে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লীর উচ্চস্বরে কিরায়াত, জিকির ও দো'আ পাঠ করা : ইমাম শুধু উচ্চস্বরে কেরায়াত পড়বেন। মুসল্লীরা নিম্নস্বরে পড়বেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন : তোমরা সালাতে আল্লাহর সাথে কানাঘুষায় লিপ্ত থাক। তাই উচ্চস্বরে কুরআন পড়বে না এবং মুমেনদেরকে কষ্ট দেবে না। (বাগওয়ী)

রাসূলে করীম-এক রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আবু বকরকে নিম্নস্বরে এবং ওমর (রা)-কে উচ্চস্বরে কেরায়াত পড়তে দেখেন। পরে তারা দু'জন নবী করীম-এর সাথে মিলিত হন। তিনি বলেন : হে আবু বকর! আমি আপনার কাছ দিয়ে অতিক্রমের সময় আপনাকে নিম্নস্বরে কেরায়াত পাঠ

করতে দেখলাম। আবু বকর বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাঁর সাথে গোপনে কাকুতি-মিনতি করেছি, তাঁকে তো শুনিয়েছি। তিনি ওমরকে বলেন, তুমি উচ্চস্বরে সালাত পড়ছিলে। ওমর বললেন : উচ্চস্বরে পড়ার উদ্দেশ্য হলো তন্দ্রা দূর করা এবং শয়তানকে তাড়ানো। তখন নবী করীম ﷺ বলেন : হে আবু বকর! আপনি একটু শব্দ করে পড়বেন এবং ওমরকে বলেন, তুমি আরো একটু ছোট আওয়াজে পড়বে।

সৌদী আরবের পরলোকগত মুফতী জেনারেল শেখ আব্দুল আযীয ইবনে বাজকে সালাতের জামা'আতে মুসল্লীদের শব্দ করে কেরায়াত ও দো'আ-যিকিরের ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দেন, মোক্তাদীর জন্য সুন্নাত পদ্ধতি হলো চুপিসারে কেরায়াত, দো'আ ও যিকির করা। কেননা, তা প্রকাশ্যে পড়ার পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ নেই বরং শব্দ করে পড়লে পাশের মুসল্লীদের সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। (সাপ্তাহিক আদদাওয়া পত্রিকার প্রশ্নোত্তর)

৩. একাধিক আয়াতকে একসাথে মিলিয়ে পড়া : সুন্নাত পদ্ধতি হলো, এক এক আয়াত করে পাঠ করা। উম্মে সালমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কেরায়াত পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তরে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক এক আয়াত করে পাঠ করলেন। তিনি এভাবে পড়েছেন : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আররাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, দারু কুতনী, তিনি হাদীসের সনদকে সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বলেছেন। হাকেম বলেছেন, বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হওয়ায় এটি সহীহ। আল্লামা জাহাবীও একই মত ব্যক্ত করেন। ইবনে খোজাইমা এবং ইমাম নববীও এঁকে সহীহ বলেছেন।)

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম উপরোল্লিখিত হাদীসটি উল্লেখের পর বলেছেন, ইমাম যোহরী বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক এক আয়াত করে পড়েছেন। আর এ পদ্ধতিই উত্তম পদ্ধতি। যদিও আগের আয়াত পরের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কোন কারী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের ভিত্তিতে আয়াতের শেষে ওয়াকফের কথা বলেছেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণই সর্বোত্তম হেদায়াত এবং উত্তম পন্থা। ইমাম বায়হাকীও এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন প্রত্যেক আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করা সুন্নাত। যদিও পরবর্তী আয়াত আগের আয়াতের সাথে বাক্য গঠনের দিক দিয়ে অথবা বিশেষ্য-বিশেষণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

৪. দাড়ানো ও বসার সময় পিঠ সোজা না করা : কখনো দেখা যায় কোন সময় ডানে বা বামে কিংবা বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় বা বসে। এটা নিষিদ্ধ। পিঠ সোজা রাখতে হবে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : 'আল্লাহ্ সে বান্দার সালাতের দিকে তাকান না, যে সালাতে রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না।'

(আহমদ, তাবরানী)

নবী করীম ﷺ ভুল সালাত আদায়কারীকে উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন : 'তারপর তুমি মাথা তুলে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে যেন হাড় তার নিজ নিজ অবস্থানে দৃঢ় থাকে।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে 'তুমি মাথা তুলে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন হাড়গুলো নিজ নিজ জোড়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। কেউ এরূপ না করলে তার সালাত পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে না।'

৫. রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা না করা : একদা নবী করীম ﷺ সালাত পড়ার সময় আড় চোখে তাকিয়ে এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে রুকু ও সিজদায় নিজ পিঠ সোজা করেনি। সালাত সমাপ্ত করে তিনি বলেন : 'হে মুসলমান সম্প্রদায়! যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা না করবে তার সালাত আদায় হবে না।' (ইবনু আবি শায়বা, আহমদ, ইবনে মাজাহ)

নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন, সালাত চুরি সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ। লোকেরা প্রশ্ন করল, সালাত কিভাবে চুরি করে? তিনি বলেন, ঠিকমত রুকু ও সিজদা না করে তড়িগড়ি করে সালাত আদায় করার নামই সালাতে চুরি।' (ইবনে আবি শায়বা, তাবরানী, হাকেম, আল্লামা জাহাবী একে সহীহ বলেছেন) এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পিঠ সোজা করার মানে কি? উত্তর, নবী করীম ﷺ যখন রুকুতে যেতেন তখন পিঠ সমানভাবে বিছিয়ে দিতেন। (বায়হাকী সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছে)

রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে এমনভাবে পিঠ বিছিয়ে দিতেন যে, পিঠের উপর পানি ঢাললে তা স্থিতিশীল থাকত। (ইবনে মাজাহ, তাবরানী)

তিনি ভুল সালাত আদায়কারীকে বলেছিলেন : রুকুতে গেলে দু'হাতের কব্জি দু'হাঁটু বরাবর রাখবে, তোমার পিঠকে সম্প্রসারিত করবে এবং রুকুর জন্য অর্থাৎ ঝুঁকে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

তিনি রুকুতে গেলে মাথাকে পিঠ থেকে উপরের দিকেও রাখতেন না এবং নিচের দিকেও বেশি পরিমাণ ঝুঁকাতেন না।

৬. ইমাম সিজদায় থাকলে মাথা তোলা পর্যন্ত এবং বসা থাকলে দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভুল : বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো, ইমাম রুকু, সিজদা, দাঁড়ান কিংবা বসা যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন সর্বাবস্থায় অনতিবিলম্বে সালাতে শামিল হওয়া এবং বিলম্ব না করা। কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : 'তোমরা সালাতের জন্য আসলে প্রশান্তিসহকারে আসবে, যতটুকু সালাত পাবে ততটুকু পড়বে এবং যতটুকু পাওয়া যায়নি ততটুকু পরিপূর্ণ করবে।' (বোখারী)

ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে যা বুঝা যায়, তাহলো ইমামকে যে অবস্থাতেই পাওয়া যায় দেরী না করে সাথে সাথে সে অবস্থায় সালাতে শরীক হওয়া দরকার। আবদুল আযীয ইবনে রাফী এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমাকে রুকু, সিজদা বা দাঁড়ানো অবস্থায় পাবে সে যেন সে অবস্থায়ই আমার সাথে সালাতে শরীক হয়।' (ইবনে আবি শায়বা)

৭. সিজদায় ৭টি অঙ্গকে ঠিকমত না রাখা : আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে সাত অঙ্গে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সময় যেন কেউ চুল কিংবা কাপড় ধরে না রাখে। সে সাত অঙ্গ হলো : কপাল, দু'হাত, দু'পা ও দু'হাঁটু।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আরেক বর্ণনায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: 'আমাকে সাতটি অঙ্গে সিজদা দেয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি হাত দিয়ে নিজ নাক, দু'হাত, দু'হাটু ও পায়ের আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করে দেখান এবং বলেন, এ সময় যেন আমরা কাপড় ও চুল টানাটানি না করি।' (বোখারী)

এ হাদীস থেকে জানা গেল–

ক. যারা সিজদায় দুই পা জমীন থেকে সামান্য উপরে উত্তোলন করে, কিংবা এক পা অন্য পায়ের উপর উপস্থাপন করে তাদের সাত অঙ্গে সিজদা হয় না। সিজদার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পা উপরে রাখলে তার সালাত হবে না। কেননা, সে সালাতের একটি অঙ্গ ত্যাগ করেছে। পা একবার মাটিতে রেখে পরে তুললে সালাত হবে, তবে এরূপ করা ঠিক নয়। (ফতোয়া সাদীয়াহ-১৪৭)

খ. কারো কারো সিজদার সময় নাক মাটিতে লাগে, কপাল লাগে না। তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৮. কুকুরের মতো দুই উরু দাঁড় করে নিতম্বের উপর উপবিষ্ট : এভাবে বসা নিষেধ। কিন্তু দুই সিজদার মাঝে বসার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মুসলিম শরীফে তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দুই পায়ের পাতা দাঁড় করে বসার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, এটা রাসূল করীম ﷺ-এর সুন্নাত পদ্ধতি। শুধু দুই সিজদার মাঝে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে তা জায়েয। ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা হলো, নিতম্বের সাথে পায়ের গোড়ালী একত্রিত করবে। অপরদিকে, নিতম্ব মাটিতে বিছিয়ে দুই পা দাঁড় করানো এবং দুই হাত মাটিতে রাখা, এটাই কুকুরের মতো বসা। আর হাদীসে এটার ওপরই নিষেধ আরোপিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে তিনটি কাজ করতে বারণ করেছেন–

১. মোরগের মতো সিজদায় ঠোকর মারা অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে সিজদা আদায় করা।

২. কুকুরের মতো বসা এবং

৩. শিয়ালের মতো এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারা। (আহমদ, আবু ইয়ালী)

এ বর্ণনা দ্বারা অনুধাবন করা গেল, দুই সিজদার মাঝে বসার পদ্ধতি দুই ধরনের।

১. বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা দাঁড় করানো। এটাই নবী করীম ﷺ-এর প্রসিদ্ধ সুন্নাত। অন্যান্য সকল বৈঠকে এভাবেই বসার নিয়ম রয়েছে।

২. দু'পায়ের গোড়ালীর উপর দুই নিতম্ব রেখে বসা।

৯. প্রথম জাম'আত না পেলে দ্বিতীয় জাম'আত না করা এবং লোক থাকা সত্ত্বেও জাম'আত ব্যতীত একাকী সালাত পড়া : কেননা, জাম'আতে সালাত আদায় করার ব্যাপারে অধিকাংশের মত হলো তা ফরয। একমাত্র হানাফী মাজহাবে এটাকে ওয়াজিবের কাছাকাছি সুন্নাতে মোয়াক্কাদা বলা হয়েছে। এর নিচের আর কেউ বলেনি। কোন ফরজ বা ওয়াজিব তরক হলে সময় থাকলে অবশ্যই সে সময়ের ভেতর তা আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

'আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একা সালাত পড়তে দেখে বলেন : 'এমন কে আছে, যে এ ব্যক্তির জন্য সদকার নিমিত্ত তার সাথে সালাত পড়বে?'

(আবু দাউদ-'একই মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাতে সালাত আদায়' অধ্যায়)

তিরমিযী শরীফে 'যে মসজিদে একবার জামায়াত আদায় হয়েছে সে মসজিদে দ্বিতীয়বার জামায়াত অনুষ্ঠান' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন নবী করীম ﷺ-এর সালাত শেষ হলো, তখন এক ব্যক্তি আসল। তিনি বলেন : 'কে আছে এমন যে তার সাথে ব্যবসা করবে? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল ও তার সাথে সালাত আদায় করল।

এ দুটি হাদীস দ্বারা একই মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াতের পরিষ্কার প্রমাণ মিলে। কোন কারণে একাধিক লোকের একই সালাত কাজা হলে তাও জামা'আত সহকারে পড়ার হুকুম রয়েছে। এমনকি, সুন্নাতে মোয়াক্কাদা সালাত ফরজের আগে পড়তে না পারলে জামাআতের পর পুনরায় তা পড়ে নিতে হয়।

যারা মসজিদে দ্বিতীয় জাম'আত দ্বারা প্রথম জাম'আতের গুরুত্ব কমে যায় এ যুক্তিতে দ্বিতীয় জাম'আত করেন না, তাদের এ যুক্তি নিতান্তই দুর্বল। এ দুর্বল যুক্তি দ্বারা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণসমূহ বাতিল হতে পারে না।
(সৌদী আরবের সকল মসজিদে দ্বিতীয় জাম'আত অনুমোদিত)

সালাত জাম'আতে পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকটি প্রমাণ পেশ করছি।

আল্লাহ বলেন–

اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُو الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ -

"তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা বাকারা : আয়াত-৪৩)

এ আয়াতে একদিকে সালাত কায়েম এবং অন্যদিকে রুকুকারীদের সথে রুকু আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সালাত কায়েমের মধ্যে জামাআতে সালাতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় : 'রুকুকারীদের সাথে রুকু কর' এ আয়াত পরিষ্কার জাম'আতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছে। জামআত ছাড়া একই সাথে 'রুকুকারীদের সাথে রুকু আদায়ের আর কোন ব্যবস্থা হতে পারে না।

সূরা নিসার ১০২ নং আয়াতে যুদ্ধকালীন সালাতের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ঐ কঠিন মুহূর্তেও জামাতসহকারে সালাত পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যুদ্ধের সময়ে যদি জামাত সহকারে সালাত পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তাহলে শান্তির সময় জামাতের আদেশ আরো জোরদার হবে।

শুধু তাই নয়, কোন কারণে কেউ জামাত না পেলে কোন সুন্নাত ও নফল আদায়কারীর পিছনে দাঁড়িয়ে ফরয সালাত জামাআতের সাথে পড়তে পারে। এ

মাসয়ালা বোখারী ও মুসলিম এ দু'টি হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। সাহাবী মুআ'জ (রা) নবী করীম ﷺ-এর সাথে এশা সালাতের জামাতের ইমামতির ঘটনা খোদ বোখারী শরীফেই বর্ণিত আছে। তাই ২য় জামাত হোক বা ৩য় জামাত হোক, সালাত অবশ্যই জামাতে পড়তে হবে।

এমনকি ঘরে এসে স্ত্রীর সাথে হলেও জামাতে সালাত পড়তে হবে। তাই দ্বিতীয় জাম'আতকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

১০. সালাতের ইমামের আগে আগে কার্যপদ্ধতি আদায় করা : এটা বিরাট ভুল। এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'তোমাদের কেউ কি আল্লাহকে ভয় করো না? ইমামের আগে কেউ মাথা তূললে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথা কিংবা তার চেহারাকে গাধার চেহারায় রূপান্তরিত করবেন। (বোখারী)

ইমামের সাথে সালাত আদায় এর চারটি অবস্থা হলো–

১. مُسَابَقَةٌ **(মোসাবাকা)** : ইমামের আগে আগে রুকু-সিজদাসহ বিভিন্ন কাজ করা।

২. مُوَافَقَةٌ **(মোআফাকা)** : মোটেও দেরী না করে ইমামের সাথে সাথে রুকু-সিজদাসহ বিভিন্ন কার্যাদী আদায় করা।

৩. مُتَابَعَةٌ **(মাতাবাআ)** : ইমাম কোন কাজ করলে এর সামান্য পরে সে কাজটি করা।

৪. مُخَالَفَةٌ **(মোখালাফা)** : ইমাম কোন কাজ সমাপ্তি করেছেন। তা সত্ত্বেও বেশ বিলম্ব করে সে কাজটি সমাধা করা। এর মধ্যে কেবল ৩নং مُتَابَعَةٌ (মোতাবাআ) কাজটি করার জন্য আমরা আদিষ্ট। বাকি তিনটি কাজ ইমামের অনুসরণের পরিপন্থি। একটি অগ্রগামিতা, একটি পশ্চাদগামিতা, একটি সাথে সাথে করা। কেবল ইমামের অনুসরণ কাম্য।

ইমামের অনুসরণের ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্ণ অনুসরণের ভিত্তিতে সালাত পরিপূর্ণ করার জন্য ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তোমরা ইমামের বরখেলাপ করবে না। ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও সাথে সাথে তাকবীর বলবে এবং রুকু করলে রুকু করবে, তিনি যখন

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবেন, তোমরা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে এবং তিনি যখন সিজদা করবেন তখন তোমরাও সিজদা করবে।'

(বোখারী, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ)

এ হাদীসে ইমামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন কিছুতে ইমামের অগ্রগামিতা বা পশ্চাদগামিতা অথবা বরখেলাপী করা নিষিদ্ধ। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে লোকেরা! আমি তোমাদের ইমাম, তোমরা রুকু, সিজদা, কেয়াম, বৈঠক ও সালাম ফিরানোর সময় আমার অগ্রগামী হবে না।' (মুসলিম, আহমদ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমামের অনুসরণের মাধ্যমে সালাতকে পরিপূর্ণ করার জন্য ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই ইমাম রুকুতে যাওয়ার আগে তোমরা রুকুতে যাবে না এবং ইমাম উঠার আগে তোমরা উঠবে না।' বোখারী)

এ হাদীসগুলোতে অগ্রগামিতা ও পশ্চাদগামিতা ব্যতিরেকে ইমামের যথার্থ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে।

১১. দ্রুত মসজিদে যাওয়া : বিশেষ করে ইমাম রুকুতে যাওয়ার পূর্ব সন্দিক্ষণে তড়িগড়ি করে সালাতে শামিল হওয়ার চেষ্টা করা। এ জাতীয় তড়িগড়ি করা নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যখন সালাতের একামত দেয়া হয় তখন দৌড়ে এসো না, বরং স্বাভাবিকভাবে হেঁটে আস, ধীরে সুস্থে; যতটুকু সালাত পাও ততটুকু আদায় কর, আর যতটুকু পাওনি তা পূর্ণ কর।' (বোখারী, মুসলিম, আহমদ, ও অন্য চারটি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ)

ধীরে-সুস্থে এবং তাড়াহুড়া না করে সালাতে অংশ গ্রহণ কাম্য। তাড়াহুড়া করে সালাতে আসলে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়। কিন্তু স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস সহকারে এবং দ্রুততা পরিহার কর সালাতে শরীক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ মর্মে আরেকটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আবু বাকরাহ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন মসজিদে পৌঁছলেন তখন নবী করীম ﷺ রুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি সালাতের কাতারে শামিল না হয়ে কাতারের বাইরেই রুকুতে শামিল হলেন। নবী করীম ﷺ-কে এ কথা অবগত করানো হলো। নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, তবে আর এরূপ করবে না।' (বোখারী)

ইবনে হাজার আসকালানী হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'আর এরূপ করবে না' এর অর্থ তুমি যেভাবে দ্রুত এসেছ, কাতারবিহীন রুকুতে শামিল হয়েছ, তারপর কাতারে শরীক হয়েছ, আর এরূপ করবে না।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন একামত শ্রবণ করবে, তখন সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তবে শান্তভাবে ও সম্মানের সাথে চলবে, তাড়াহুড়া করবে না, যে পরিমাণ সালাত পাবে তা আদায় করবে এবং যে পরিমাণ পাবে না সে পরিমাণ পূর্ণ করবে।' (বোখারী)

এ হাদীসগুলোতে সালাতের একামতের সময় তাড়াহুড়া না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য আরেক বর্ণনায় সালাতের কথাও এসেছে, 'তোমরা যখন সালাতের জন্য অগ্রসর হবে'? তাই তাড়াহুড়া সালাত এবং একামত দু' অবস্থায়ই নিষিদ্ধ।

ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন : ইকামতের সময় তাড়াহুড়া করে না আসার একটি হিকমত হলো, তাড়াহুড়া করে আসলে এবং সালাতে শরীক হলে বিনয় ও খুশু আসবে না এবং যে আগে আসবে তার মনে সে খুশু বিদ্যমান থাকবে।

অন্য আরেক হাদীসে তাড়াহুড়া না করার আরেকটি হিকমত উল্লেখ রয়েছে : আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। আগে বর্ণিত হাদীসের শেষে উল্লেখ আছে : তোমাদের কেউ সালাতের ইচ্ছা পোষণ করে রওনা হলে সে সালাতের মধ্যেই বিবেচিত হবে। (মুসলিম) অর্থাৎ তার হুকুম মুসল্লীর হুকুমের মতোই। তাই মুসল্লীর যা করণীয় ও বর্জনীয় তারও। তা করণীয় ও বর্জনীয়। অর্থাৎ তাড়াহুড়া বর্জনীয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেন : হে ঈমানদারগণ! যখন শুক্রবারে তোমাদেরকে জুম'আর সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও যিকরের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।' এ আয়াতে فَاسْعَوْا শব্দের অর্থ হচ্ছে দ্রুত ধাবিত হও। এ শব্দের ভিত্তিতে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করার বিধান আছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন : এ আয়াতে سَعْيٌ শব্দের অর্থ দৌড়-ঝাঁপ করা নয়; বরং উপরোল্লিখিত হাদীসে, ধীরে সুস্থে আসাকেই অর্থ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ইমামগণ বলেছেন, কুরআনে سَعْيٌ শব্দের অর্থ হলো, কাজ করা ও কর্ম তৎপর হওয়া। অর্থাৎ আজান শুনার পর সালাতের প্রস্তুতি নেয়া, দ্রুততা বা

তাড়াহুড়া করা নয়। যেমন, কুরআনের অন্য আয়াতেও এ শব্দটি কাজ-কর্মের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا-

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আখেরাতের ইচ্ছা করে, সেজন্য আমল করে এবং সে যদি মুমিন হয় তাহলে তাদের আমল ও চেষ্টা-তৎপরতার যথার্থ মূল্যায়ন হবে।"

আল্লাহ আরো বলেন, اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى 'নিশ্চয়ই তোমাদের তৎপরতা ভিন্ন ভিন্ন।'

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

اِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا ـ

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমীনে ফেতনা-ফাসাদের চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হলো হত্যা করা।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে سَعْىٌ শব্দের অর্থ কাজ ও তাড়াহুড়া কিংবা দ্রুততা নয়। এ সকল আয়াত দ্বারা উল্লেখিত প্রশ্নের সমাধান যথাযথ হয়েছে।

এছাড়াও ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) আয়াতটি নিম্নোক্তভাবে পাঠ করেছেন– فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অর্থ 'আল্লাহর জিকর তথা সালাতের উদ্দেশ্যে রওনা কর।'

১২. কাঁচা রসুন-পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে গমন করা : এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এ গাছ (রসুন) খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।' (বোখারী)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে কিংবা সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং নিজ ঘরে বসে থাকে।' (বোখারী)

আনাস (রা)-এর এক বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি এ গাছ (রসুন) খায়, সে যেন আমাদের কাছে না আসে, অর্থাৎ সে যেন আমাদের সাথে সালাত আদায় না করে।' (বোখারী)

ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যদি মসজিদে কারো মধ্যে এ বস্তু দু'টির গন্ধ পেতেন তাকে বাকী কবরস্থান পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দিতেন। কেউ যদি এ দু'টি খেতে চায় সে যেন রান্না করে খায়।' (মুসলিম)

নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন : 'আদম সন্তান যে সকল জিনিস দ্বারা কষ্ট পায় ফেরেশতারাও সে সকল জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়।' (মুসলিম)

দুর্গন্ধের কারণে কাঁচা রসুন-পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। রান্না করে খেলে মুখে গন্ধ থাকে না। তখন মসজিদে গেলে কোন অপরাধ নেই।

১৩. ধূমপান করার পর মসজিদে যাওয়া : যে কারণে পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ, সে কারণে ধূমপান করেও মসজিদে যাওয়া উচিত নয়। সে কারণটি হলো মুখের দুর্গন্ধ। কোন কোন আলেমের অভিমতে পাওয়া যায় ধূমপানের দুর্গন্ধের হুকুম কাঁচা রসুন-পেঁয়াজের হুকুম অপেক্ষা আরো বেশি মারাত্মক। হোজাইফা ইবনে ওসাইদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ اٰذَى الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ طُرُقِهِمْ . وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُهُمْ .

'যে ব্যক্তি রাস্তায় মুসলমানদেরকে কষ্ট প্রদান করে, তার ওপর তাদের অভিশাপ জরুরি হয়ে যায়।' (তাবারানী, আবু নাঈম ও ইবনে আদী)

রাস্তায় কষ্টদানকারী যদি অভিশাপের উপযোগী হয় তাহলে মসজিদে কষ্টদানকারীর অবস্থায় কিরূপ হবে? অবশ্যই এটা মারাত্মক অপরাধ।

মুনীর দামেস্কী বলেছেন : পেঁয়াজ-রসুনের উপকার সত্ত্বেও দুর্গন্ধের কারণে মসজিদে যেতে নিষধে করা হয়েছে। আর ধূমপানের ক্ষতি ছাড়া কোন উপকারই নেই এবং দুর্গন্ধ পেঁয়াজ-রসুন অপেক্ষা বেশি। তাই ধূমপানের পর মসজিদে যাওয়ার হুকুম আরো বেশি কঠিন।

১৪. সালাতে এদিক-সেদিক দেখা : বিনা প্রয়োজনে এদিক-সেদিক দৃষ্টি দেয়া যাবে না। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতে এদিক-সেদিক দেখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেন– এটা হচ্ছে বান্দার সালাত থেকে শয়তানের ছোঁ মারা।' (বুখারী)

নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন সালাত পড়বে তখন এদিক-সেদিক দেখবে না। বান্দা যে পর্যন্ত সালাতে এদিক-সেদিক না তাকায় সে পর্যন্ত আল্লাহর নিজ চেহারা (রা) তার চেহারার দিকে নিবদ্ধ রাখেন।' (তিরমিযী, হাকেম)

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ সালাতে তিন জিনিস নিষেধ করেছেন। ১. মোরগের মতো সিজদায় ঠোকর খাওয়া। ২. কুকুরের মতো বসা এবং ৩. শিয়ালের মতো এদিক-সেদিক তাকানো। (আহমদ, আবু ইয়ালী)

আবু জার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দার সালাতের সময় আল্লাহ্ তার দিকে মুখ করে থাকেন যতক্ষণ না সে এদিক-সেদিক দেখে, যখন সে এদিক-সেদিক দেখে, আল্লাহ্ তার থেকে নিজ মুখ ফিরিয়ে নেন। (বুখারী)

কোন প্রয়োজন দেখা দিলে এদিক-সেদিক দৃষ্টি দেয়া যায়। এর প্রমাণ হলো, বোখারী শরীফে বর্ণিত সহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদীর হাদীস। 'নবী করীম ﷺ বনি আমর ইবনে আওফ গোত্রে তাদের মধ্যে আপোষ-রফার জন্য গেলেন। সালাতের সময় হওয়ায় মোআজ্জিন এসে আবু বকর (রা)-কে বলেন, আপনি যদি সালাত পড়ান তাহলে আমি একামত দিতে পারি। আবু বকর (রা) সালাত পড়াতে লাগলেন। ইতোমধ্যে নবী করীম ﷺ আসেন এবং কাতারের মধ্যে দাঁড়ান। লোকেরা হাততালি দেয়। আবু বকর (রা) সালাতে কখনও এদিক-সেদিক তাকাতেন না। লোকদের তালির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় তিনি পেছন ফিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাতারে দেখেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে ইমামতির জন্য নিজ স্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে ইশারা করেন। ... হাদীসের শেষাংশে আছে, তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে হাতে তালি দিতে দেখলাম এর কারণ কি? সালাতে ইমামের সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করলে তাসবীহ (সোবহানাল্লাহ) বললে। তাসবীহ্ বললে তাসবীহ্র প্রতি খেয়াল করা হবে। আর তাতে তালি তো মহিলাদের জন্য।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন : এ হাদীসে প্রয়োজন হলে এদিক-সেদিক তাকানো এবং মুসল্লীর দ্বারা কথা বলার চেয়ে হাতে ইশারা করা উত্তম বলে জায়েয প্রমাণিত হয়।

১৫. সালাতের ফরজ রোকনগুলো আদায়ে ইমামের তাড়াহুড়া : রুকু ও সিজদাহসহ বিভিন্ন রোকন এত তাড়াহুড়া করে আদায় করা যে, মুক্তাদীর পক্ষে তিনবার তাসবীহ পড়া সম্ভব হয় না এবং ঈমামকে ধীরে সুস্থে ঐ রোকনগুলো আদায় করতে হবে যেন মুসল্লীরা তার পেছনে তা ঠিকমত অনুসরণ করতে পারে।

১৬. সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকা সত্ত্বেও পেছনে আলাদা কাতার করা : এটা দুই কারণে করা হয়ে থাকে। তাড়াতাড়ি রুকুতে অংশ নেয়া কিংবা অলসতার কারণে সামনে অগ্রসর না হওয়া। এর ফলে সামনের কাতারে ফাঁকা জায়গা থেকে যায়। কেননা সে নিজে আলাদা আরেকটি কাতার তৈরি করেছে। বিচিত্র নয় যে, এরপর অন্য মুক্তাদীরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তখন কাতারের দুই পাশ অপূর্ণ রয়ে যাবে। নিম্নের হাদীসের কারণে তা নাজায়েয। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতের কাতার অপূর্ণ বা বিচ্ছিন্ন বা ফাঁকা রাখে, আল্লাহ নিজেও তার সাথে বিচ্ছিন্ন থাকেন।' (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ) নিম্নের হাদীসটিও এর সমর্থন করে। নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা কাতার ঠিক কর, নচেৎ আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন।'
(আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান)

এর সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসটিও উপস্থাপন করা যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ 'কাতারের পেছনে কোন ব্যক্তির একাকী সালাত নেই।' (ইবনে খুজাইমা) এক্ষেত্রে যা করণীয় তা হলো, ডান-বামে তাকিয়ে আরেকজন লোক পাওয়ার চেষ্টা করা। তবে সামনের কাতার থেকে লোক টেনে আনার ব্যাপারে বর্ণিত দু'টি হাদীসই দুর্বল। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর দুর্বল হাদীস সংকলনের ৯২১ নং ৯২২ নং হাদীসদ্বয় দ্রষ্টব্য। সামনের কাতার থেকে সালাতী ব্যক্তিকে টেনে আনলে কয়েকটি ক্ষতি হয়।

১. সামনের কাতারে ফাঁক সৃষ্টি হয়। যার কারণে কাতারে ফাঁক সৃষ্টি হলো, হাদীসে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে বলে উল্লেখ আছে। (আহমদ, আবু দাউদ)

২. লোক টানার ফলে কাতারের শূন্যতা পূরণের জন্য সকল মুসল্লীকে ব্যস্ত করে দেয়া হয়।

৩. ঐ মুসল্লীর সালাতের খুশু অর্থাৎ বিনয়কে বাধাগ্রস্ত করা হয় এবং তাকে সামনের কাতারের উত্তম ফযীলত ও মর্যাদা থেকে পেছনে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন কাতারে নিয়ে আসা হয়।

৪. মাসয়ালা না জানা থাকলে কাউকে টেনে আনলে সে জোর করবে এবং পেছনের কাতারে আসতে চাইবে না। এতে আরো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

এছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসে পুরুষ কাতারের পিছনে একাকি কোনো পুরুষ ব্যক্তি নামায পড়লে সে নামায হবে না বলে স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুতরাং কাতার থেকে কাউকে পিছনের দিকে টেনে নিতে না পারার কারণ দিখিয়ে কাতারের পিছনে একাকি সালাত আদায় কোনোক্রমে জায়েয নয়। বরং সাথে অন্য মুসল্লিকে পাওয়ার অপেক্ষা করতে হবে। যদি পেয়ে যায় তাকে নিয়ে কাতারের পিছনে সালাত আদায় করবে নচেৎ সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর পরবর্তিতে একাকি সালাত আদায় করবে। নিঃসন্দেহে জামাতে সালাত আদায় করার অপেক্ষা থাকা স্বত্বেও বিধান মোতাবেক শামীল হতে না পারা সে জামাতের ফযীলত পেয়ে যাবে।

১৭. সিজদায় দুই হাত ও উরুদ্বয় একসাথে মিলানো উচিত নয় : এক্ষেত্রে যা করণীয় তা হলো, পেটকে উরু থেকে এবং দুই বাহুকে দুই পার্শ্বদেশ থেকে সাধ্যমত দূরে রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করাও কাম্য নয়। যেমন, এমন করা উচিত নয় যে, পিঠকে বেশি সম্প্রসারিত করে দিয়ে নিজ মাথাকে সামনের কাতারে নিয়ে ঠেকানো। মোটকথা স্বাভাবিকভাবে সব কাজ করা উচিত।

১৮. চাদর কিংবা জামা মাটি পর্যন্ত ঝুলানো : আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে শরীরের কাপড় ঝুলাতে নিষেধ করেছেন।' (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, হাকেম) অর্থাৎ এমনভাবে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া যে, কাপড়ের দুই পাশকে কাঁধের মধ্যে মিলানোর পরিবর্তে ছেড়ে দেয়া। ফলে তা মাটি স্পর্শ করে। হাত ভেতর থেকে বের করে রুকু-সিজদা করে। যেমন, চাদরের দু' পাশ দুই কাঁধে না রেখে ছেড়ে দেয়া। ফলে তা মাটি স্পর্শ করবেই। এভাবে কাঁধে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া ইহুদীদের কাজ। খাল্লাল তাঁর 'আল-এলাল' গ্রন্থে এবং আবু ওবায়েদ তাঁর 'আল-গরীব' গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ ইবনে ওহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন আলী (রা) বের হন। তিনি কিছু লোককে শরীরে কাপড় ঝুলিয়ে সালাত পড়তে দেখে মন্তব্য করেন : 'তারা যেন ইহুদীদের স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

১৯. বুকের উপর হাত না বাঁধা : বোখারী শরীফে সহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, লোকদেরকে সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।' মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, 'নবী করীম ﷺ বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন।'

আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে খোযায়মা থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বুকের উপর দুই হাত রাখতেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন : নবী করীম ﷺ নিজ বুকের উপর দুই হাত রাখতেন। বাজ্জারও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা মারওয়াজী মাসায়েল গ্রন্থে লিখেছেন, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই আমাদেরকে নিয়ে বিতরের সালাত আদায় করেন। তিনি কুনুতে দুই হাত তুলতেন, রুকুর আগে কুনূত পাঠ করতেন, তারপর দুই হাত নিজ বুকের উপর কিংবা বুকের নিচে রাখতেন।

ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, এটা হচ্ছে লজ্জিত প্রার্থনাকারীর রূপ যা অর্থহীন কাজের উত্তম প্রতিরোধক এবং বিনয়ের সহায়ক। যারা সালাতে দুই হাত ছেড়ে দেয় অথবা নাভীর নিচে বা উপরে হাত রাখে এবং যারা ঘাড়ে হাত রাখে এগুলোর কোনটাই সঠিক নয়। নাভীর নিচে হাত রাখার ব্যাপারে আহমদ ও আবু দাউদ আলী (রা) থেকে যে বর্ণনা এসেছে এর সনদ খুবই দুর্বল। তিনি বলেছেন, 'নাভীর নিচে এক হাতের কব্জীর উপর অন্য হাতের কব্জি রাখা সুন্নাত।' এ বর্ণনায় আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক ওয়াসেতী দুর্বল রাবী। আল্লামা জাহাবী আব্দুর রহমানের ব্যাপারে বলেছেন, মুহাদ্দেসীন কেরাম তাকে দুর্বল রাবী বলে অভিহিত করেছেন।

২০. ইকামতের পর কাতার সোজা করার জন্য না বলা : নবী করীম ﷺ সালাতের ইকামতের পর মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাক্যে কাতার সোজা করার অনুরোধ জানাতেন, আমাদের দেশে ইকামত শেষ হবার আগেই অর্থাৎ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলার সাথে সাথেই ইমাম তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করে হাত বেঁধে ফেলেন। ফলে তাতে দু'টি ভুল হয়।

১. একামত সম্পন্ন হওয়ার পরই তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করে সালাতের সূচনা করতে হবে। অথচ, ইকামত অসম্পূর্ণ রেখে তাড়াহুড়া করে সালাত শুরু করা সুন্নাতের খেলাপ।

২. ইকামতের পর কাতার সোজা করার অভিপ্রায়ে নবী করীম ﷺ-এর পদ্ধতির অনুসরণ না করা। তিনি ইকামতের পর বলতেন–

اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا

'কাতার সোজা কর এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে দাঁড়াও'। (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলতেন–

أَقِيْمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ ـ

'তোমরা কাতার সোজা কর, সালাতের সৌন্দর্য হলো কাতার সোজা করা।' (বোখারী)

তিনি আরো বলতেন–

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلاَةِ ـ

'কাতার সোজা কর, কাতার সোজা করা সালাতেরই অংশ।' (বোখারী)

তিনি আরো বলতেন–

اَحْسِنُوْا اِقَامَةَ الصُّفُوْفِ فِى الصَّلاَةِ ـ

'সালাতে কাতার সুন্দর কর।' (মুসনাদে আহমদ)

তিনি আরো বলতেন–

رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا ـ

'মজবুতভাবে কাতারবন্দী হও এবং পরস্পর কাছাকাছি দাঁড়াও।' (আহমদ, আবু দাউদ)

এক হাদীসে এসেছে, 'বিলাল (রা) আযানের মতো ইকামতের পূর্ণ জওয়াব দিতেন।' (আবু দাউদ, মেশকাত– ৬৬ পৃ:)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ইকামত সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর ইকামতের জওয়াব দিয়ে ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলা সুন্নাত।' (নাইলুল আওতার, ১ম খণ্ড, ৩৫৩ পৃ:)

খোলাফায়ে রাশেদাও ইকামত শেষ না হলে তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না। বর্ণিত আছে, ওমর (রা) ইকামত শেষে একজন লোককে কাতার সোজা করার দায়িত্ব দিতেন এবং কাতার সোজা হওয়ার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না। ওসমান এবং আলী (রা)ও অনুরূপ করতেন। (তিরমিযী-১ম খণ্ড)

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত হলো, একামত শেষ হলে তাকবীরে তাহরীমা বলা। যারা বলেন, حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ বললে ইমাম ও মোক্তাদী দাঁড়িয়ে যাবে এবং قَدْقَامَتِ الصَّلاَةُ বললে ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবেন, তাদের এ বক্তব্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। তাই ইকামত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে আমাদেরকেও কাতার সোজা করার কথা বলতে হবে।

২১. খতমে কুরআনের অজুহাতে তারাবীর সালাতে তাড়াহুড়া করা : রমযানের প্রত্যেক রাত্রে তারাবীহ্র সালাত আদায় করা সুন্নাত। অসংখ্য ইমাম অজ্ঞতার কারণে কুরআন খতমের নামে তাড়াহুড়া করে তারাবীহ্র সালাত পড়ান। তারা রুকূ, সিজদা সঠিকভাবে আদায় করেন না এবং তাসবীহ্ও ঠিকমত পড়ার সুযোগ দেন না। বলা যায় তারা মোরগের ঠোকরের মতো ঠোকর মারেন। এগুলো নিষিদ্ধ এবং এ দ্রুততা শয়তানের কাজ। সালাত ফরজ হোক আর নফল-সুন্নাতই যাই হোক, সালাতের কিরায়াত, রুকূ-সিজদা ধীরে-সুস্থে আদায় করতে হবে এবং বিনয় ও খুশু রক্ষা করতে হবে। আয়াত এবং রুকূ-সিজদার তাসবীহ্ ও দোআগুলোর অর্থের দিকে খেয়াল করতে হবে।

নবী করীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম কিংবা ইমামগণ খতমের নামে তাড়াহুড়া করে তারাবীহ্ আদায় করেননি। ইমাম ও মুসল্লীগণ মনে করেন যে, তাড়াতাড়ি না করলে মুসল্লীরা সালাতে অংশ নিতে চাইবে না, তাদের উচিত ঐ সকল মুসল্লীকে তারাবীহ্র ফযীলত সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। আল্লামা গাজ্জালী (র) বলেছেন, যারা সালাতের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য রক্ষা ব্যতীত বাহ্যিক দিকগুলো বাস্তবায়ন করে, তাদের উদাহরণ হলো, কোন বাদশাহ্কে মৃত প্রাণী উপহার দেয়া যার প্রাণ নেই। আর যে বাহ্যিক দিকগুলোতে ত্রুটি করে তার উদাহরণ হলো, বাদশাহ্কে অঙ্গহীন কানা-খোঁড়া প্রাণী উপহার দেয়া। এ উভয় উপহার দানকারীই আল্লাহ্র অধিকার নষ্ট করার দায়ে শাস্তির সম্মুখীন হবে।

মোটকথা, সালাতে প্রশান্তি, স্থিরতা ও ধীর-সুস্থ পরিবেশের অভাব হলে সালাতের বিরাট একটি রোকনের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে এ নামায বিশুদ্ধ হয় না। তাই এ জাতীয় সালাত আদায় করে অসুস্থ ও বৃদ্ধসহ বিভিন্ন লোকদেরকে কষ্ট দেয়া ইমামের উচিত নয়। পবিত্র কুরআন এ জাতীয় সালাতেক মুনাফেকদের সালাত বলে আখ্যায়িত করে বলেছে–

وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا .

'তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসের মতো দাঁড়ায়, তারা লোক দেখানোর কাজ করে, তাদের খুব কম সংখ্যকই আল্লাহকে স্মরণ করে।' তাদের সালাত মুমেনদের সে আকাঙ্ক্ষিত সালাত নয় যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ـ

'সে মুমেনরাই সফলকাম যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী।'

(সূরা মুমিন : আয়াত-১-২)

তারাবীহ্ খুবই ফযীলতপূর্ণ সালাত। তাই তা ভালোভাবে আদায় করা দরকার।

২২. বিনা প্রয়োজনে সালাতে দু'চোখ বন্ধ করা : আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র) বলেছেন : সালাতে চোখ বন্ধ করা নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাতের পরিপন্থী। তিনি কখনও সালাতে এরূপ করতেন না। বরং তিনি সালাতে তাশাহহুদের বৈঠকে দোআর সময় আঙ্গুলের ইশারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ইবনুল কাইয়েম (র) চোখ বন্ধ না করার বিষয়ে খোমাইসা আবু জাহামসহ অন্যদের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এর সমর্থনে আরো বলা যায় যে, কসুফের সালাতের সময় তার জান্নাতের আঙ্গুরের ছড়া ধরার চেষ্টা, একবার সালাতে জাহান্নাম এবং তাতে বিড়ালের কাহিনী বিশিষ্ট মহিলাকে দেখা এবং তাঁর সালাতের সামনে দিয়ে পশু অতিক্রমের সময় তাকে বাধা প্রদানসহ বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি সালাতে চোখ বন্ধ করতেন না।

সালাতে চোখ বন্ধ রাখার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদসহ একদল আলেমের মতে এটা মাকরূহ। তাঁরা বলেছেন, এটা ইহুদীদের কাজ। তবে অন্য একদল আলেমের মতে, এটা বৈধ এবং তাঁরা এটাকে মাকরূহ বলেননি। বরং তারা বলেছেন, এর মধ্যেমে সালাতের প্রাণ খুশু ও বিনয় অর্জন সহজ।

বিশুদ্ধ মত হলো, চোখ খোলা রাখলে যদি তা খুশুর জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে খোলা রাখাই উত্তম। আর যদি সামনে কারুকার্য, ডিজাইন বা অন্য কিছুর প্রতি দৃষ্টির কারণে খুশু বাধাপ্রাপ্ত হয়– তাহলে চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ হবে না বরং শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হওয়ার কারণে তা মুস্তাহাব।

(যাদুল মাআদ-ইবনুল কাইয়েম)

২৩. প্রথম রাকাত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকাত কিংবা প্রথম দু'রাকাত অপেক্ষা শেষ দু'রাকাতকে দীর্ঘ করা : নবী করীম ﷺ-এর বিপরীত করতেন। অর্থাৎ তিনি প্রথম রাকায়াতকে দ্বিতীয় রাকায়াত এবং প্রথম দু'রাকায়াতকে শেষ দু'রাকাত অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করতেন।

আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের প্রথম রাকায়াতগুলোকে দীর্ঘ এবং শেষ রাকায়াতদ্বয়কে সংক্ষিপ্ত করে পড়তেন। তিনি

ফজরের সালাতেও এরূপ করতেন।' (বোখারী) আরেক বর্ণনায়, তিনি আসরের সালাতেও এরূপ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। (বোখারী)

২৪. টাখনু বা পায়ের ছোট গিরার নিচে কাপড় পরা : আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় চেঁচানো অবস্থায় নামায আদায় করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : 'যাও, অযূ কর।' তারপর সে আসল। নবীজী আবার তাকে অযূ করে আসার নির্দেশ দেন। সে আবার গেল এবং অযূ করে আসল। এক লোক নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : হে রাসূল ﷺ! আপনি তাকে অযূ করার আদেশ দেয়ার পর নীরব রইলেন কেন? তিনি জবাব দেন, লোকটি টাখনুর নিচে কাপড় পরে সালাত আদায় করছিল। আল্লাহ কাপড় চেঁচানো ব্যক্তির সালাত কবুল করেন না।' (আবু দাউদ) ইমাম নবুবী বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসের সনদ সহীহ। কেউ কেউ হাদীসটিকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ মর্মে অন্যান্য হাদীসের কারণে এ দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে গেছে।

টাখনুর নিচে কাপড় চেঁচানোর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে। আবু জার (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তারা হলো–

১. টাখনুর নিচে কাপড় চেঁচানো ব্যক্তি।
২. যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে খোঁটা দেয়।
৩. মিথ্যা কসম করে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা। (মুসলিম)

জাবের ইবনে সোলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ... তুমি ইজার হাঁটুর মাঝামাঝি পর্যন্ত পর, যদি তা না কর, তাহলে পায়ের টাখনু বা ছোট গিরা পর্যন্ত পরতে পরিধান কর, তবে টাখনুর নিচে কাপড় চেঁচানোর বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করবে। এটা হচ্ছে, লোক প্রদর্শন। আল্লাহ নিশ্চয়ই লোক প্রদর্শনকারীদেরকে পছন্দ করেন না ...। (আবু দাউদ)

অন্য হাদীসে রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَهُوَ فِى النَّارِ .

'দুই টাখনুর নিচে ইজার (লুঙ্গি) পরলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।' (বোখারী)

এখন এটা ইচ্ছা করে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাখনুর নিচে চেঁচালে উল্লেখিত হাদীসের কারণে তা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, এটা সাধারণত গর্ব-অহঙ্কার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। যদি কারো লোক প্রদর্শন বা গর্ব-অহঙ্কারের ইচ্ছা না থাকে তবুও তা লোক প্রদর্শন ও গর্ব-অহঙ্কারের উপায়। তাছাড়াও তাতে মহিলাদের সাথে সামঞ্জস্য এবং তাতে ময়লা ও নাপাকী লাগতে পারে। আর এটি অপচয় এর আরেকটি দিক। তাই লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ও জামা অবশ্যই টাখনুর উপর থাকতে হবে। এর নিচে পড়লে গুনাহ্ হবে।

২৫. ইকামতের সময় সুন্নাত বা নফল সালাত পড়া : আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ .

সালাতের ইকামত হয়ে গেলে ফরজ সালাত ব্যতীত আর কোন সালাত নেই। (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে বোহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের ইকামতের সময় এক ব্যক্তিকে দু'রাকায়াত সালাত পড়তে দেখেন। নবী করীম ﷺ এর সালাত শেষে লোকেরা তাকে ঘিরে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করেন, 'ফজরের ফরজ সালাত কি চার রাকায়াত? ফজরের ফরজ সালাত কি চার রাকায়াত?' (বোখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ ইকামতের পর তো মাত্র দু'রাকায়াত ফরজ সালাত পড়ার কথা। কিন্তু লোকটি তো চার রাকায়াত পড়ল।

হাদীসের আলোকে ইবনে হেজাম বলেন : ফজরের ফরজ সালাতের ইকামত শুনার পর ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়লে যদি জামাআত কিংবা তাকবীরে তাহরীমা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে ঐ দু'রাকায়াত সুন্নাত আগে পড়া নাজায়েয। কেউ তা পড়লে আল্লাহ্র সাথে নাফরমানী হিসেবে গণ্য হবে।

ইমাম নববী (র) বলেছেন, একামত শুনার পর অন্য সালাত না পড়ার পেছনে যে যুক্তি রয়েছে তা হল, ফরজ সালাতের জন্য প্রথম থেকেই পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়া এবং সুন্নাত ও নফলের দ্বারা ফরজের সামান্যও ঘাটতি না করা।

ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, ইকামতের সময় নফল ও সুন্নাত ত্যাগ করে ফরজ পড়ার পর তা আদায় করা সুন্নাতের উত্তম অনুসরণ। ইকামতের মধ্যে حَيَّ

عَلَى الصَّلاَةِ-এর অর্থ হলো, এমন যে ফরজ সালাত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তাতে দ্রুত এসে অংশগ্রহণ কর। তাই ইকামতের সময় নফল-সুন্নাত না পড়ে ফরজ সালাতে শামিল হতে হবে।

কেউ কেউ আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের বরাত দিয়ে বলেছেন : ইকামতের সময় নফল সালাত পড়া জায়েয। সে হাদীসে আছে : নবী করীম ﷺ ইকামতের সময় দু'রাকায়াত সালাত আদায় করতেন।' (ইবনে মাজাহ)

এ হাদীসের ভিত্তিতে দলীল পেশ করা যাবে না। কেননা, হাদীসটি দুর্বল। হাদীসের সনদে হারেস আওয়ার নামক রাবী অত্যন্ত দুর্বল। আল্লামা জাহাবী (র) তাঁর মীজানুল এ'তেদাল গ্রন্থে লিখেছেন : মুগীরা শাবী থেকে বর্ণনা সূত্রে বলেছেন, হারেস আওয়ার আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে। সে ছিল একজন মিথ্যাবাদী। ইবনে মুঈন তাকে দুর্বল এবং জারীর ইবনে আব্দুল হামিদ তাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করেছেন, শাবী বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সে একজন মিথ্যুক।

কিছু কিছু আলেম ইকামতের সময় অথবা পরে ফজরের সুন্নাত পড়াকে জায়েয বলেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়েম (র) তাঁর إِعْلاَمُ الْمُوَقِّعِيْنَ গ্রন্থে লিখেছেন : মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী একামত হয়ে গেলে ফরজ ছাড়া আর কোন সালাত নেই। তাই ইকামতের পর ফজরের সুন্নাত পড়া উপরোক্ত হাদীসের বিরোধী। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের শেষে 'ফজরের দু'রাকায়াত সুন্নাত ব্যতীত' এ অংশটি যোগ করাকে অস্বীকার করেছেন। তার মতে, শেষ অংশটুকু হাদীস নয়।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ قَالَ : وَلاَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ -

'যখন সালাতের একামত দেয়া হয় তখন ফরজ ব্যতীত আর কোন সালাত নেই। নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, ফজরের দু'রাকাত সুন্নাতও নয়? তিনি জবাবে বলেন : না, ফজরের দু'রাকাত সুন্নাতও নয়।' (বায়হাকী)

তবে, ফজরের ফরজ পড়ার পর দু'রাকাত সুন্নাত পড়ে নিলে সুন্নাতের ফযীলতও লাভ করা যায়। ফরজের পর সুন্নাত না পড়ার প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞা হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে ইকামতের পর কেউ যেন নতুন করে নফল বা সুন্নাত সালাত শুরু না করে। কেউ যদি ইকামতের আগে নফল-সুন্নাত শুরু করেন তাহলে হালকাভাবে তা শেষ করে জামায়াতে শরীক হলে নিম্নোক্ত আয়াতের পরিপন্থী হবে না : وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ 'তোমাদের আমল বরবাদ করো না।'

২৬. সালাতের মধ্যে ইশারায় সালামের জবাব না দেয়া : কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সালাম দিলে মুখে সালামের জবাব দেয়া বৈধ নয়। কিন্তু ইশারার মাধ্যমে জবাব দেয়া যাবে। এ মর্মে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন : 'আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম ﷺ কিভাবে সালাতে আনসারদের সালামের জবাব প্রদান করতেন? বেলাল (রা) বলেন, তিনি এভাবে জবাব দিতেন, একথা বলে বেলাল নিজ হাতের অগ্রভাগ সোজা করে দেখান।'

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লামা সানআনী বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কথার মাধ্যমে নয়; বরং ইশারার মাধ্যমে সালামের জবাব প্রদান করা যাবে।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁকে এক কাজে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে নবী করীম ﷺ-কে সালাতে পেলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। নবীজি ইশারায় জবাব দেন।' (মুসলিম)

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। 'তিনি নবী করীম ﷺ-কে সালাতের মধ্যে সালাম দিলে তিনি মাথা নেড়ে সালামের জবাব প্রদান করেন।'

(বায়হাকী)

এ সকল হাদীস দ্বারা এটাই অনুধাবন করা যায়, কথার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেয়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি ইশারার মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন। মাথা, হাত বা আঙ্গুলের ইশারায় সালামের উত্তর দিলে চলবে। প্রশ্ন হলো, সালাতের মধ্যেও কেন সালামের উত্তর দিতে হয়? উত্তর হলো, আল্লাহ্ কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন–

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا ـ

'আর তোমাদেরকে কেউ সালাম দিলে তোমরাও তার জন্য তার চেয়েও উত্তম জবাব প্রদান করবে। অথবা তার অনুরূপ সালাম দাও।' (সূরা নিসা : আয়াত-৮৬)

আল্লাহর আদেশ হলো সালামের জবাব দেয়া। সালাতে কথার মাধ্যমে উত্তর দেয়া সম্ভব নয় বিধায় ইশারায় উত্তর দিতে হয়।

২৭. সালাত কাজা হলে সাথে সাথে কাজা আদায় না করা : অনেকে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করে এবং কাজা আদায় করে। এটা নিতান্তই বিরাট ভুল, সুস্থ হওয়ার সাথে সাথে অথবা মনে পড়ার সাথে সাথে কাজা আদায় করা চাই। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ـ

'কোন ব্যক্তি ভুলে অথবা ঘুমের কারণে সালাত না পড়ে থাকলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করা এর কাফফারা।' (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

২৮. ইমাম পরবর্তী রাকায়াতের জন্য উঠা সত্ত্বেও মোক্তাদীর কিছুক্ষণ বসে থাকা : এটা ঠিক নয়, বরং সুন্নাতের খেলাপ। ইমামের অনুসরণ করা ফরজ। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ...

'অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে।' (বোখারী, মুসলিম)

২৯. কুরআন তেলাওয়াতে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো ভুল হয়ে গেলে যে ভুলের কারণে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায় এমনকি কাফির-মুশরিক অথবা গুনাহগার হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তবুও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে এরূপ ভুলে তেলাওয়াতকারী কাফির-মুশরিক অথবা গুনাহগার হবে না। এরূপ ভুল সালাতের মাঝে হলেও সালাত বাতিল হবে না। তথা গুনাহগার কিংবা মুশরিক অথবা কাফির হয়ে যাবে না। অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং সে গুনাহগার হবে। ক্ষেত্র বিশেষ সে কাফির অথবা মুশরিক হয়ে যেতে পারে।

৩০. বেশি পাতলা কাপড়ে সালাত পড়া যাতে সতর দেখা যায় : পুরুষের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের সারা শরীর সতর। পাতলা কাপড়ের ভেতর দিয়ে যদি শরীরের সতরের অংশের চামড়া দেখা যায় তাহলে সতর ঢাকা হবে না। ফলে সালাতও সহীহ শুদ্ধ হবে না। হ্যাঁ, যদি পাতলা কাপড়ের ভেতর অন্য কোন পোশাক থাকে যেমন, পুরুষের পাজামা, লুঙ্গি এবং মেয়েলোকের অন্য কোন কাপড় তাহলে সালাত বিশুদ্ধ হবে। সালাতে পুরুষের কাধ ঢাকা থাকতে হবে। গেঞ্জী থাকলেও চলবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

لاَيُصَلِّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْئٌ ـ

'তোমরা একটিমাত্র কাপড়ে এমনভাবে সালাত পড় না যে, কাঁধের উপর কিছু না থাকে।' (বোখারী, মুসলিম) এমন পোশাক পরে সালাত পড়লেও হবে না যার ফলে সতরের কোন অংশ বেরিয়ে পড়ে।

৩১. সালাতে চুল ও কাপড় গুছানো : আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لاَ اَكُفُّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا ـ

'চুল ও কাপড় না গুছিয়ে আমাকে সাত অঙ্গে সিজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' (বোখারী)

কেউ কেউ রুকু-সিজদার সময় বিনা প্রয়োজনে শরীরের কাপড় টেনে ধরে এবং কাপড়কে সম্প্রসারিত হতে দেয় না। কেউ কেউ দাঁড়ি কিংবা মাথার চুল ধরে নাড়াচাড়া করে। একবার এক ব্যক্তি এরূপ করায় নবী করীম ﷺ বললেন, তার অন্তরে খুশু ও বিনয় থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এরূপ করতে পারে না। এরূপ করলে সালাতের খুশু ও বিনয় নষ্ট হয়।

৩২. বাইরে সুতরাহ ব্যতীত সালাত আদায় করা : মসজিদে সালাত পড়লে ইমামের স্থান মেহরাব সুনির্দিষ্ট থাকে বলে সেখানে সুতরার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অন্যত্র কিংবা মসজিদের পেছনের অংশে সালাত আদায় করলে সুতরাহ দিতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'তোমরা সুতরাহ ব্যতীত সালাত পড়বে না এবং তোমাদের সালাতের সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দেবে না। যদি সে অমান্য করে তাহলে, তার সাথে সংগ্রাম কর। কেননা, তার (শয়তান) সঙ্গী তার সাথে আছে।'

(ইবনে খোযাইমাহ, হাকেম, বায়হাকী) হাকেম বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং আল্লামা জাহাবী একে সমর্থন করেছেন।)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– 'তোমাদের কেউ সালাত পড়লে যেন সামনে সুতরাহ রাখে এবং এর নিকটবর্তী হয়। কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার সাথে লড়াই করবে; সে হচ্ছে শয়তান।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, ইবনে খোযাইমা এবং ইবনে আবি শায়বা)

সুতরার দূরত্বের পরিমাণ

সুতরার ও মুসল্লীর মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ কতটুকু হওয়া প্রয়োজন? এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'তিনি নিজে কা'বার ভেতর প্রবেশ করে দরজাকে পেছনে রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হতেন এবং কা'বার দেয়াল থেকে প্রায় তিন হাত দূরে অবস্থান করে সালাত আদায় করতেন। বেলাল (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, নবী করীম ﷺ সে স্থানেই সালাত পড়েছিলেন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, তাঁর ও সুতরার মাঝখানের দূরত্ব ছিল প্রায় তিন হাত।' (বোখারী)

সহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোসাল্লা ও কা'বার দেয়ালের মাঝে একটি ভেড়া অতিক্রমের জায়গা ছিল।' ইমাম নওয়ী (র) তাঁর শরহে মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন, এখানে 'মোসাল্লা' বলতে, সিজদার জায়গা বুঝানো হয়েছে।

আউন ইবনে আবু জোহাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, নবী করীম ﷺ (মক্কার মাআবদায়) বাতহায় দু'রাকায়াত করে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেছেন। তাঁর সামনে ছিল আ'নজাহ। তাঁর সামনে দিয়ে নারী ও গাধা অতিক্রম করেছে।' (বোখারী, মুসলিম)

ইবনুল আসীর তাঁর 'আন-নেহায়' গ্রন্থে লিখেছেন, আ'নজাহ হচ্ছে, তীরের অর্ধেক বা আরো একটু বড় ঠিক এ পরিমাণ। আ'নজায় তীরের মতো দাঁত আছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ-এর সামনে হারবাহ নামক যুদ্ধাস্ত্র দাঁড় করানো হতো এবং তিনি এর দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন।' (বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ) 'হারবাহ' হচ্ছে সুঁচালো মাথা বিশিষ্ট লোহার তৈরি ছোট যুদ্ধাস্ত্র।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'নবী করীম ﷺ নিজ সওয়ারীকে সামনে রেখে সালাত পড়তেন।' (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

সুতরাহর পরিমাণ : সুতরাহ কী পরিমাণ হবে? এ মর্মে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-কে সুতরাহর পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেন : সওয়ারীর পিঠে রাখা আসনের কাঠের মতো উঁচু হলেই চলবে।' (মুসলিম)

তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সালাতের সময় সামনে সওয়ারীর আসনের কাঠের মতো উঁচু জিনিস দাঁড় করালেই চলবে। এরপর সামনে দিয়ে কি যায় তা নিয়ে আর কোন চিন্তার কারণ নেই।' (মুসলিম)

দাগ কি সুতরার বিকল্প হতে পারে? দাগ কখনো সুতরার বিকল্প হতে পারে না। তাই উঁচু সুতরাহ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। যে হাদীসে সুতরাহ না পেলে বিকল্প হিসেবে দাগ দেয়ার কথা এসেছে সে হাদীসের সনদ অত্যন্ত দুর্বল। তাই সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইমামের সুতরাহ মোক্তাদীর জন্য যথেষ্ট।

দুর্বল হাদীসগুলোর একটা হলো

আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে মসজিদে হারামে বাবে বনি শায়বা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখেছি। তিনি কা'বা শরীফের সামনে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান, একটি দাগ বা রেখা টেনে, তারপর তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে সালাত আরম্ভ করেন। লোকেরা কা'বা ও ঐ দাগের মাঝে তাওয়াফ করতে থাকে।' (আবু ইয়ালী) এ হাদীসের সনদে হাসসান ইবনে ওববাদ অজ্ঞাত ব্যক্তি। ইমাম জাহাবীর বলেন, তিনি কে আমরা তা জানি না। এছাড়াও সনদে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল মালেকও দুর্বল ব্যক্তি। তাই হাদীসটি দুর্বল। এ বিষয়ে এরূপ আরো কয়েকটি দুর্বল হাদীস রয়েছে।

দুই হারাম শরীফে সুতরাহর প্রয়োজনীয়তা : দুই হারাম শরীফ অর্থাৎ মক্কার মসজিদে হারাম এবং মদীনার মসজিদে নব্বীতেও সুতরাহর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, সুতরার ব্যাপারে রাসূল করীম ﷺ-এর আদেশ সকল মসজিদের জন্য প্রযোজ্য। তা থেকে কোন মসজিদকে বাদ দেয়া হয়নি। তাই দুই হারাম শরীফও ঐ আদেশের শামিল। যদি ইমাম মসজিদের দেয়াল কিংবা মেহরাবের কাছে না দাঁড়ান।

সুতরাহ সম্পর্কিত একাধিক হাদীস তিনি মদীনার মসজিদে নব্বীতে বসেই বলেছেন। অপরদিকে মক্কার মসজিদে হারামে সুতরাহ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরাহ করেন, বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকায়াত সালাত আদায় করেন। তাঁর সাথীরা মানুষ থেকে তাঁকে আড়াল করে রাখেন।'

(বোখারী)

ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে সহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণিত। 'তিনি বলেন, আমি মসজিদে হারামে আনাস ইবনে মালেককে সামনে লাঠি দাঁড় করে সালাত আদায় করতে দেখেছি।' (ইবনে আবি শায়বা)

সালেহ্ ইবনে কাইসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি ইবনে ওমরকে কা'বার দিকে কেবলামুখী হয়ে সালাত পড়তে দেখেছি। তিনি তাঁর সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দেননি। বরং বাধা প্রদান করেছেন।' (বোখারী)

৩৩. মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা : এটা একটি বিরাট গুনাহ্। আবুল জোহাইম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে, এতে তার কি গুনাহ্ হচ্ছে, তাহলে তার জন্য মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা অপেক্ষা ৪০ .... পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম হতো।' এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবুন নাদর বলেন : আমি জানিনা, নবী করীম ﷺ ৪০ দিন, মাস না বছর বলেছেন। (শরহে মুসলিম, ইমাম নওয়ী)

আবু সালেহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু সাঈদ (রা)-কে জুমার দিন লোকদেরকে আড়ালকারী একটি জিনিসের দিকে মুখ করে সালাত পড়তে দেখেছি। আবু মুঈত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ইচ্ছা করল। আবু সাঈদ (রা) তাঁকে নিজ বুক দিয়ে ধাক্কা দেন। যুবকটি পারাপারের অন্য কোন পথ না দেখে আবারও তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এবারও আবু সাঈদ পূর্বাপেক্ষা আরো জোরে ধাক্কা দেন। যুবকটি আবু সাঈদের এ আচরণের বিরুদ্ধে শাসক মারওয়ানের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে। আবু সাঈদও তাঁর পেছনে পেছনে মারওয়ানের কাছে গমন করেন। মারওয়ান জিজ্ঞেস করেন, হে আবু সাঈদ! আপনার ও আপনার ভাতিজার মধ্যে কি ঘটেছে? আবু সাঈদ বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ মানুষ থেকে আড়াল সৃষ্টিকারী সুতরার দিকে সালাত পড়ার সময় সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চাইলে তাকে প্রতিহত করে সরিয়ে দেবে। সে সরতে না চাইলে তার সাথে লড়াই করবে। নিশ্চয়ই সে শয়তান।' (বোখারী)

ইমাম নবুবী বলেছেন, প্রথম হাদীসে সালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রম করাকে হারাম করা হয়েছে। তাতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও সতর্ক করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, হাদীসের মর্মানুযায়ী এটা কবীরা গুনাহের শামিল। তিনি আরো বলেন, প্রকাশ্য হাদীসের দাবি হলো, মুসল্লীর সামনে দিয়ে মোটেও অতিক্রম করা যাবে না। জায়গা না থাকলে অপেক্ষা করতে

হবে যে পর্যন্ত না মুসল্লী সালাত থেকে অবসর হয়। আবু সাঈদের এ কাহিনী একথার সহায়ক।

আল্লামা শাওকানী (র) বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জাহান্নাম ওয়াজিবকারী কবীরা গুনাহ। তাতে ফরজ ও নফল-সুন্নাত সমান।

সৌদী আরবের প্রয়াত মুফতী জেনারেল শেখ আব্দুল আযীয ইবনে বাজ (র) বলেছেন : প্রকাশ্য হাদীসের দাবি হলো, মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাওয়া হারাম এবং মুসল্লীর তা প্রতিরোধ করার অধিকার রয়েছে। তবে কেবলমাত্র একটি সময়ে মুসল্লীর সামনে দিয়ে যেতে পারবে যখন অতিক্রম হতে বাধ্য হয় এবং এছাড়া আর কোন পথ না থাকে। তবে মুসল্লী থেকে দূর দিয়ে অতিক্রম করলে এবং তার সামনে সুতরাহ না থাকলেও গুনাহ হবে না। সেটা সুতরার সামনে দিয়ে অতিক্রম করারই সমান।

দূরত্বের পরিমাণ : এখন এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, মুসল্লী থেকে কতখানি পরিমাণ দূর দিয়ে গেলে গুনাহ হবে না? এ প্রশ্নের জবাব হলো, অনেক ওলামায়ে কেরামের মতে, সুতরাহ ব্যতীত মুসল্লী যে স্থানে দাঁড়াবে সে স্থান থেকে তিন হাত পরিমাণ দূর দিয়ে গেলে গুনাহ হবে না। গুনাহ কেবল সে ব্যক্তির হবে যে ঐ তিন হাতের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করবে।

ইবনে হাজমের মতে, যে ব্যক্তি মুসল্লী থেকে তিন হাতের বেশি দূর দিয়ে অতিক্রম করবে, তার গুনাহ হবে না এবং মুসল্লীও অতিক্রমকারীকে কোনরূপ বাধা প্রদান করবে না। কিন্তু যদি তিন হাত বা এর কম পরিমাণ দূর দিয়ে যায় তাহলে অতিক্রমকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে। সুতরাহ হলে, এর পেছন দিয়েই অতিক্রম করতে পারবে। তখন আর গুনাহ হবে না।

ইমামের সামনে সুতরাহ থাকলে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে কোন অপরাধ নেই। ইমাম বোখারী 'ইমামের সুতরাহ পেছনের মোক্তাদীর সুতরাহ' এ শিরনামে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : 'আমি একটি গর্ধভীর উপর আরোহণ করা অবস্থায় মিনায় পৌছি। তখন আমি বালেগ অবস্থায় ছিলাম। নবী করীম ﷺ সেখানে সামনে দেয়ালবিহীন এক স্থানে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। আমি একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করি, তারপর সওয়ারী থেকে অবতরণ করি এবং গর্ধভীটিকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেই। তারপর জাম'আতে ঐ সালাতে অংশগ্রহণ করি। কেউ আমার প্রতি কোনরূপ আপত্তি করে।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে আব্বাসের এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, ইমাম ও মোক্তাদী কারো সামনে তিন হাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম হওয়া ঠিক নয়।

সৌদী সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ আব্দুল্লাহ জিবরীন বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম না করার কারণ উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। আর তা হলো, সালাত থেকে মুসল্লীর মন অন্য দিকে সরিয়ে নেয়া। পক্ষান্তরে, ইবনে আব্বাসের হাদীস দ্বারা একথা বুঝা জরুরি নয় যে, তিনি সালাতের কাতারের একেবারে সামনে দিয়ে অতিক্রম করেছেন। হতে পারে, তিনি তিন হাত দূর দিয়ে অতিক্রম করে বলেছেন, আমি কাতারের সামনে দিয়েই অতিক্রম করেছি।

অনেকে দূর দিয়ে পর্যন্তও নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে ইতস্ততঃ করে আসলে এ ইতস্ততার কোন প্রয়োজন নেই।

৩৪. সালাতে ভালো পোশাক না পরা : সালাতে ভালো ও সুন্দর পোশাক পরা প্রয়োজন। অনেকেই এ বিষয়ে যথেষ্ট গাফলতি করে। তারা সালাতের সময় যেন-তেন একটা কাপড় পরেই সালাত শেষ করে। কেউ একটা গেঞ্জি পরে, কেউ চাদর বা গামছা পরে এবং কেউ পুরাতন বা ছেঁড়া কিংবা ময়লা কাপড় পরে। কেউ সম্পূর্ণ খালি গায়েও সালাত পড়ে। অথচ এ পোশাক পরে তারা কেউ হাট-বাজার, অফিস-আদালত ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যায় না। আল্লাহর দরবারের হাজিরা সেগুলো অপেক্ষা সর্বোত্তম সৌন্দর্যের দাবিদার। আল্লাহ নিজে সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। তাই সালাতে সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে হবে। মসজিদ আল্লাহর ঘর। সে মসজিদে নিজের কাছে মওজুদ সর্বোত্তম পোশাক পরে হাজিরা দিতে হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাই নির্দেশ প্রদান করেছেন।

يَابَنِي آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ

'হে আদম সন্তান! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক সালাতে তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ কর।' (সূরা আরাফ : আয়াত-৩১)

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী, সালাতের সময় মেসওয়াক করা, সুন্দর পোশাক পরা এবং খুশবু লাগানো শামিল রয়েছে। জুম'আ ও ঈদের সালাতে এ সুন্নাতের প্রয়োজনীয়তা আরো অধিক বেশি।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- তোমাদের কেউ সালাত পড়লে সে যেন তার দু'কাপড়ে সালাত আদায় করে। সৌন্দর্য প্রকাশের অগ্রাধিকার আল্লাহর জন্যই।' (তাহাওয়ী, বায়হাকী, তাবরানী)

৩৫. ইকামতের সময় قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ বললে এর উত্তরে أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا বলা : যারা এটা বলেন, তাদের প্রমাণ হলো, আবু উমামা অথবা অন্য একজন সাহাবীর বর্ণিত হাদীস। সে হাদীসে এসেছে, 'বেলাল ইকামতের সময় যখন قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ বলতেন, নবী করীম ﷺ তখন বলতেন : أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا। 'আল্লাহ্ সালাতকে কায়েম রাখুন ও স্থায়ী করুন।' (আবু দাউদ) এ হাদীসটি দুর্বল হাদীস। তাই এর উপর আমল করা ঠিক হবে না। মোনজেরী বলেছেন, হাদীসের সনদে একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছেন। তাছাড়াও সনদে শাহর ইবনে হাওশাব নামক বর্ণনাকারীকে একাধিক মুহাদ্দেস দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। সনদে মোহাম্মদ ইবনে সাবেতকে হাফেজ আজ-জাহাবী সত্যবাদী, তবে হাদীসের ব্যাপারে নমনীয় আখ্যায়িত করে তার বর্ণিত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

উল্লেখ্য যে ইবাদতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যঈফ হাদীসের প্রতি আমল করা থেকে সতর্ক হওয়া অধিক জরুরি। বিআদ সৃষ্টি হওয়ার প্রধান স্থান সৃষ্ট ইবাদত। এ পথে অধিকাংশ বিআদ সৃষ্টি হয়ে থাকে সুতরাং قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ জবাবে أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا বলা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

৩৬. قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ বলার আগ পর্যন্ত মুক্তাদীদের না দাঁড়ানো : অনুমান করা হয় যে, এটা সুন্নাত। আসলে তা সুন্নাত নয় এবং এ পর্যন্ত অপেক্ষা করাও ঠিক নয়। ইকামতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে সালাতের প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন।

যারা قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তাদের প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত হাদীস। 'আওয়াম ইবনে হাওশাব আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন বেলাল (রা) قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ বলতেন, তখন নবী করীম ﷺ উঠে দাঁড়াতেন ও তাকবীর বলতেন।'

ইমাম আহমদ (রা) বলেছেন, হাদীসের সনদের বর্ণনাকারী আওয়াম ইবনে হাওশাব আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফার সাক্ষাত লাভ করেননি। এদিকে ইবনে কাসীর বলেছেন, হাদীসটি মোনকাতে'। আর এ কারণে তা দুর্বল হাদীস। সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা সনদের মাঝখানে কোন দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারেও মতভেদ আছে। কিছু কিছু ইমাম উপরে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং একনা ও মোকনে কিতাবে (ফেকাহ্)-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৭. অধিকাংশ সময় ছোট ছোট বা সংক্ষিপ্ত কেরায়াত পাঠ করা : সালাতে সূরা-কেরায়াতের পরিমাণ সম্পর্কে সুন্নাত পদ্ধতির অনুসরণ না করে কেবলমাত্র সংক্ষিপ্তাকারে সূরা-কেরায়াত পড়ে সালাত সমাপ্ত করা আদৌ ঠিক নয়। শেখ এমাদ নামক জনৈক বুজুর্গের সালাতে সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণে দীর্ঘ কেরায়াতের পর এক ব্যক্তি আর তাঁর পেছনে সালাত না পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শেখ এমাদ তা শুনে বলেন : কোন রাজা-বাদশাহর দরবারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেরী হলে কেউ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয় না; বরং বাদশাহর সাহচর্য দীর্ঘ হওয়ায় খুশীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দোজাহানের প্রভু মহান আল্লাহর দরবারের একটু দেরী হলে এবং কেরাত লম্বা হলে আর সহ্য হয় না। মজলিসে দীর্ঘ আলোচনায় আমরা বিরক্ত হই না। কিন্তু সালাত দীর্ঘ হলে বিরক্ত হই। আল্লাহর কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়া দরকার।

কেউ কেউ নিম্নোক্ত হাদীসের কারণে সালাত সংক্ষিপ্ত করার পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেন। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সালাতের ইমামতি করলে সে যেন সংক্ষেপে সালাত আদায় করে। কেননা, মুসল্লীদের মধ্যে রয়েছে দুর্বল, রোগী ও বৃদ্ধ লোক।' (বোখারী)

আরেক হাদীসে নবী করীম ﷺ দীর্ঘ সালাতের জন্য মুআজ ইবনে জাবালকে ভর্ৎসনা করে তিন বার বলেন : 'তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী? তিনি তাঁকে মাঝারী ধরনের লম্বা সূরা পাঠের নির্দেশ দেন।'

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'আমি নবী করীম ﷺ-এর পেছনে ব্যতীত সংক্ষিপ্ত অথচ এমন পূর্ণ সালাত আর কারো পেছনে আদায় করিনি। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে এ পরিমাণ দাঁড়াতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি হয়তো সিজদায় যাওয়ার কথা ভুলে গেছেন। তারপর তিনি সিজদায় যেতেন এবং দু'সিজদার মাঝে এ পরিমাণ বসতেন, আমরা বলতাম যে, তিনি আরেক সিজদার কথা ভুলে গেছেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (রা) বলেছেন, আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা নবী করীম ﷺ-এর সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ সালাতের অবস্থা আমরা বুঝতে পারি।

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ কিয়াম ও কিরায়াত সংক্ষিপ্ত করতেন কিন্তু রুকূ ও সিজদার মাঝে সোজা হওয়ার পূর্ণতা বিধান করতেন। ফলে একদিকে সংক্ষিপ্ত কেয়াম ও কিরায়াত এবং অন্যদিকে রুকূ ও সিজদার মাঝে দীর্ঘ প্রশান্তির মাধ্যমে সালাতের পূর্ণতা লাভ করতেন। এর ফলে আনাসের এ মন্তব্যের সত্যতা প্রতিভাত হয় যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত অপেক্ষা এত সংক্ষিপ্ত অথচ এত পূর্ণ সালাত আর দেখিনি।'

ইবনুল কাইয়্যুমের এ বিশ্লেষণ খুবই বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত। কিন্তু ইদানিং আমরা এর বিপরীত সালাতই দেখতে পাই। আমরা দেখি, লোকেরা কিয়াম ও কেরায়াত করলেও রুকূ ও সিজদায় ঠোকর খায়। আবার কেউ কেউ কেয়াম-কেরায়াত এবং রুকূ-সিজদার সব কিছুতেই মোরগের মতো ঠোকর মারে।

মুআজকে সংক্ষিপ্তাকারে সালাত পড়ার জন্য মহানবীর আদেশ মোরগের ঠোকর খাওয়া নামাযীদের সংক্ষিপ্ত সালাতের জন্য দলীল নয়। বরং এর অর্থ হলো সালাতের রুকন ও ওয়াজিবগুলো প্রশান্তি সহকারে আদায় করা, তাকে বেশি দীর্ঘায়িত না করা অথবা ঠোকর খাওয়ার মতো সংক্ষেপ না করা।

হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী আব্দুল ওয়াহেদ মাকদেসী ফরজ সালাতে দাঁড়ালে বাম দিকে তিনবার নিক্ষেপ করে 'আউজুবিল্লাহিমিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়ে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতেন, তারপর বড় করে তাকবীর বলতেন এবং সুবহানাল্লাহ্ পড়তেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'তাঁর চেয়ে কাউকে এত উত্তম সালাত, এত পরিপূর্ণ বিনয় ও খুশু' এবং সুন্দর কেয়াম, বসা ও রুকূ করতে দেখিনি।'

নবী করীম ﷺ সালাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাত্রায় কেরায়াত পড়েছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি প্রথম রাকায়াতে এত লম্বা কেরায়াত পড়তেন যে, একজন বাকি নামক স্থানে গিয়ে পেশাব-পায়খানা সেরে অযূ করে এসে দেখতে পেলেন যে তিনি তখনও রুকূতে যাননি।

৩৮. সালাতে সালাম ফিরানোর সময় মাথা নাড়ানো : কেউ কেউ সালাম ফিরানোর সময় মাথা নাড়ে, মাথা উঁচু করে, তারপর নিচু করে। এভাবে সালাম সমাপ্ত করে। এটা ঠিক নয়। সালাম ফিরানোর সময় মাথা সোজা রাখতে হবে। নবী করীম ﷺ ডানদিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরানোর সময় তাঁর ডান গাল মোবারকের শুভ্রতার আলো দেখা যেত। অনুরূপভাবে, বামদিকে সালাম ফিরানোর সময়ও বাম গালের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী) তিনি মাথা নাড়াতেন বলে কোন বর্ণনায় আসেনি।

৩৯. তাসবীহর ছড়ার ব্যবহার ও আঙ্গুলে তাসবীহ পাঠ না করা : সৌদী আরবের পরলোকগত মুফতী জেনারেল শেখ আব্দুল আযীয ইবনে বাজকে হাতে তাসবীহ না গুনে তাসবীহর ছড়া ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দেন, তাসবীহর ছাড়া ব্যবহার না করা উত্তম। কোন কোন আলেম এটাকে মাকরূহ বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মহানবী ﷺ-এর অনুসরণে হাতের আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ পড়াকে উত্তম বলেন। বর্ণিত আছে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাসবীহ ও তাহলীল হাতের আঙ্গুল দ্বারা করার আদেশ দিয়ে বলেছেন, এগুলো দায়িত্বশীল ভাষা প্রকাশক।' (আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত। 'নবী করীম ﷺ ডান হাতে তাসবীহ পাঠ করতেন।' (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ অযূ-গোসল, জুতা পরিধান ও জুতা পায়ে দেয়ার সময় সর্বদা ডান দিক হতে আগে শুরু করাকে পছন্দ করতেন। সে ভিত্তিতে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে তাসবীহ পাঠ করা উত্তম। তবে দু'হাতের আঙ্গুলেও তাসবীহ পাঠ করা যায়। কিছু হাদীসে হাতের আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ পাঠের কথা উল্লেখ রয়েছে। হাত বলতে দু'হাতকে বুঝানো হয়।

তাসবীহর ছড়ার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো জাল ও দুর্বল হাদীস। দাইলামী কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে : 'তাসবীহর ছড়া কতইনা উত্তম স্মরণকারী।' মুহাদ্দেসীনে কেরাম এটাকে জাল হাদীস অভিহিত করেছেন।

অন্য হাদীসে রয়েছে : 'নবী করীম ﷺ এক মহিলার নিকট প্রবেশ করে দেখেন, তার সম্মুখে রয়েছে কতগুলো দানা বা কঙ্কর। সেগুলো দিয়ে তিনি তাসবীহ গুণেন। নবী করীম ﷺ বলেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজ ও উত্তম জিনিস সম্পর্কে বলব না? তিনি বলেন : আর সেটা হলো–

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ .....

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

হাদীসটির সনদ দুর্বল। আর বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছেন।

সুফিয়াহ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আমার কাছে প্রবেশ করেন। তখন আমার সামনে ছিল চার হাজার দানা ... (তিরমিযী)। হাদীসের সনদ দুর্বল। সৌদী আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি তাসবীহর ছড়া ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেছেন, নবী

করীম ﷺ-এর হাতে তাসবীহ পাঠ করেছেন বলে প্রমাণিত। তাই নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণের মধ্যে রয়েছে সকল কল্যাণ নিহিত। বিশেষ করে ইবাদতের ক্ষেত্রে তা অধিক প্রযোজ্য। ইবাদত স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত, সৃষ্টি কর্তৃক সৃষ্ট নয়। তাই আল্লাহ্ অথবা তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে না আসলে কোন জিনিসকে ইবাদত হিসেবে নতুন করে প্রচলন করা যাবে না। যেহেতু, তাসবীহর ছড়ার স্বপক্ষে শরীয়তের কোন দলীল-প্রমাণ নেই, তাই তা ব্যবহার করা ঠিক নয়। বরং একজন সাহাবী এর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তাকে তাসবীহর ছড়া দিয়ে তাসবীহ্ পাঠ করতে দেখে তা ছিড়ে ফেলে দেন। তারপর তিনি আরেক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে কঙ্কর দিয়ে তাসবীহ্ পাঠ করতে দেখে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলেন : তোমরা অন্যায়ভাবে বেদআতী কাজ করছ কিংবা তোমরা ইলেম-জ্ঞানের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছ। (মাজাল্লাতুল বুহুস আল-ইসলামিয়াহ, ১৯ শ খণ্ড, ১৪৩ পৃ.)

এ দু'টি বর্ণনা দ্বারা এটাই এটাই বুঝা যায়, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হাতের আঙ্গুলের পরিবর্তে তাসবীহর ছড়া, কঙ্কর ও দানা দিয়ে তাসবীহ্ পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তাসবীহ্ হচ্ছে ইবাদত। আর তাসবীহর ছড়ার বিষয়ে মহানবী ﷺ থেকে কোন বর্ণনা নেই। সেজন্য তা বেদআত হিসেবে গণ্য হবে।

এদিকে, প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে একটা সূতো ছিল যাতে দু' হাজার গিরা বিশিষ্ট ছিল। তিনি যতক্ষণ ঐ গিরাগুলো দ্বারা তাসবীহ্ না পড়তেন, ততক্ষণ ঘুমাতে যেতেন না। (মুসনাদে আহমদ)

এ বর্ণনা এবং উপরে বর্ণিত দুর্বল হাদীসগুলোকে সামনে রেখে কোনো কোনো আলেম তাসবীহর ছড়ার ব্যবহারকে জায়েয বলেছেন। তবে তারা আঙ্গুলে তাসবীহ্ গণনাকে উত্তম বলেছেন।

৪০. হাই তুলে মুখ বন্ধ না করা : হাই তুললে মুখ বন্ধ করতে হবে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন, তোমাদের কেউ সালাতে হাই তুললে যথাসাধ্য মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করবে। কেননা, শয়তান ভেতরে প্রবেশ করে।' (আবু দাউদ)

অন্য রেওয়ায়েতে যথাসাধ্য মুখ বন্ধের চেষ্টার অর্থ হলো, হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করা। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ হাই তুললে সে যেন হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে নেয়।' (মুসলিম)

অলসতার কারণে এবং কোন সময় পেট ভরা থাকলে হাই তোলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। ইবনুল আজ্জি বলেছেন, সর্বাবস্থায় হাই তোলার সময় মুখ বন্ধ করতে হবে। সালাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, নামাযই হচ্ছে তা প্রতিরোধের উত্তম স্থান, যাতে করে সালাতের ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়। যদিও সর্বাবস্থায় হাই তুললে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয়।

৪১. আযান হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া : ইমাম মুনজেরী বলেছেন, ওজর ছাড়া আযান হবার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া খুবই খারাপ কাজ। তিনি এ মর্মে তিনি উল্লেখ করেছেন : 'আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আযানের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। তিনি বলেন, এ লোকটি আবুল কাসেম (মুহাম্মদ ﷺ) এর নাফরমানী করল।' (মুসলিম) ইমাম আহমদ আরো একটু বেশি বর্ণনা করেছেন। 'তোমরা মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হলে সালাত পড়া ছাড়া বের হবে না।'

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি আমার এ মসজিদে আযান হওয়ার পর কোন প্রয়োজনে বের হয়ে ফেরত না আসলে সে মুনাফেক ছাড়া আর কিছু নয়।' (তাবরানী)

ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরাম-এর ওপরই আমল করেছেন। আযানের পর কেউ অযূ অথবা অন্য কোন জরুরি কাজ ব্যতীত বের হতেন না।

৪২. কেউ একাকী সালাত পড়তে থাকলে তার সাথে এসে কেউ জাম'আতে শামীল হতে চাইলে নিষেধ করা : সৌদী আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি বলেছে, কেউ একাকী সালাত আদায়কারীর সাথে এসে যোগ দিয়ে জাম'আত করতে চাইলে সেটা জায়েয। তাই তাকে একা সালাত আদায়কারীর নিষেধ করা উচিত নয়, এমনকি একা সালাত আদায়কারী ফরজ না পড়ে নফল বা সুন্নাত আদায় করলেও তার সাথে অন্য ব্যক্তি এসে ফরজ আদায় করতে পারবে। নফল ও সুন্নাত আদায়কারীর পেছনে ফরজ সালাত আদায় করা যায়। এর প্রমাণ হলো, মুআজ (রা) নবী করীম ﷺ-এর সাথে জাম'আতে ফরজ সালাত আদায়ের পর নিজ গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের ফরজ সালাতের ইমামতি করেছেন। তাঁর সালাত ছিল নফল আর অন্যদের সালাত ছিল ফরজ।' (বোখারী, মুসলিম)

নবী করীম ﷺ যুদ্ধের ময়দানে ভয়কালীন সালাতে একদলকে নিয়ে দু'রাকায়াত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন এবং পরে অন্য দলকে নিয়ে আরো দু'রাকায়াত সালাত পড়েছেন।' (আবু দাউদ) তাঁর দ্বিতীয় সালাতটি ছিল নফল।

৪৩. সালাতে সূরার ক্রমধারা অব্যহত রাখার ওপর তাকিদ দেয়া : কুরআন মাজীদের সূরাগুলোর ক্রমধারা কি আল্লাহ্ প্রদত্ত, না সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদ প্রসূত সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে কাসীরের মতে, তা ইজতেহাদ প্রসূত। তাই সূরা আগে-পরে পড়লে কোন সমস্যা নেই। এর প্রমাণ হলো, হোজাইফা (রা) বলেন : আমি এক রাত নবী করীম ﷺ-এর সাথে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করি। তিনি সূরা বাকারা দিয়ে সালাত শুরু করেন। আমি ভাবলাম, একশত আয়াত শেষে তিনি রুকুতে যাবেন, কিন্তু তিনি কেরায়াত পড়া অব্যহত রাখেন। আমি ভাবলাম, তিনি প্রথম রাকায়াতে সূরা বাকারা শেষ করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি পরে সূরা নেসা পাঠ করলেন। তারপর সূরা আল-ইমরান পড়া শুরু করেন এবং তা শেষ করেন ......।' (মুসলিম)

ইমাম নববী কাযী আয়াযের বরাত দিয়ে বলেছেন, এটা প্রমাণ করে যে, কুরআনের বর্তমান সূরাসমূহের ক্রমধারা সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদ প্রসূত। কেননা, তাঁরা পরবর্তীতে এ কুরআন সংকলন করেছেন এবং এটা নবী করীম ﷺ-এর প্রবর্তিত ক্রমধারা ছিল না। তিনি বিষয়টি উম্মতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম মালেকসহ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত এটাই। কাযী আবু বকর বাকেলানীর মতে, কুরআনের সূরাসমূহের ক্রমধারা হয় রাসূল ﷺ-এর নির্ধারিত অথবা ইজতেহাদ প্রসূত। তা সত্ত্বেও পরবর্তীটাই বেশি শুদ্ধ ও সহীহ।

মোটকথা, সালাতে সূরাসমূহের ক্রমধারা রক্ষা করার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ থেকে সুনির্দিষ্ট কোন আদেশ বা প্রমাণ নেই। তাই এটা ওয়াজিব নয়। তবে ক্রমধারা রক্ষা করা উত্তম বলে সৌদী আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি অভিমত ব্যক্ত করেছে। (মাজাল্লাতুল বুহুস আল-ইসলামিয়াহ-১৯/১৪৮)

৪৪. ইমামের সাথে একজন মোক্তাদী সালাতে দাঁড়ালে ইমামের একটু সামনে এগিয়ে দাঁড়ানো : নিয়ম হলো, ইমাম ও মোক্তাদী সম্পূর্ণ বরাবর অর্থাৎ একই রেখায় দাঁড়াবে। কেউ আগে-পিছে দাঁড়াবে না। ইমাম বোখারী (র) বোখারী শরীফে 'দু'জন হলে মোক্তাদী ইমামের ডানে বরাবর দাঁড়াবে' এ শিরোনামে এক অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, তিনি তাঁর খালা মায়মুনার কাছে রাত্রি যাপন করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর তিনি উঠে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায়

করেন। ইবনে আব্বাসও তাঁর সাথে সালাতের উদ্দেশ্যে বামে দাঁড়ান। নবী করীম ﷺ তাঁকে নিজের ডানে দাঁড় করান।'

(ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এখানে ইমাম ও মোক্তাদী আগে-পিছে দাঁড়াননি।)

আতা ইবনে আবি রেবাহও মোক্তাদীকে ইমামের বরাবর দাঁড়ানোর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আতাবাহ ইবনে মাসউদ বলেন, : আমি 'হাজেরাহ' নামক জায়গায় ওমরের কাছে গেলাম। তখন তিনি নফল সালাত পড়ছিলেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়াই। তিনি আমাকে তাঁর ডানে দাঁড় করান।' (মুআত্তা মালেক)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (র) বলেছেন, এক ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত পড়লে তাকে ইমামের ডানে বরাবর দাঁড়াতে হবে, ইমাম থেকে আগে ও পিছে দাঁড়াবে না। (সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ নং ৬০৬)

সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা আউন্সিলের সদস্য শেখ আব্দুল্লাহ জিবরীন বলেন, ইমামের সাথে মোক্তাদী একজন হলে ইমাম মোক্তাদী থেকে প্রায় একক বিঘত এগিয়ে দাঁড়াবে মর্মে হানাফী মাজহাবের এ অভিমত অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস মোতাবেক মোক্তাদীকে ইমামের বরাবর দাঁড়াতে হবে।

৪৫. ইমামের সালাম ফিরানোর পর বাকি সালাত পূর্ণ করার জন্য আংশিক সালাত আদায়কারী তথা মাসবুকের তার সাথে কোন ব্যক্তি নতুনভাবে জামা'আতে শরীক হতে চাইলে বাধা দেয়া : জাম'আতে সালাত পড়া জরুরি বিধায় যে কোন সুযোগে সদ্ব্যবহার করে মাসবুকের সাথে দাঁড়িয়ে একসাথে সালাত আদায় করতে পারে। মাসবুকের একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে অন্য এক ইমামের পেছনে আংশিক সালাত আদায় করে এখন নিজে কি করে আরেকজনের ইমাম হতে পারে। শরীয়তে তাতে কোন বাধা নিষেধ নেই।

সৌদী আরবের ওলামায়ে কেরামের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি এক স্বপক্ষে ফতোয়া দিয়েছে, এ মাসয়ালার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো উল্লেখযোগ্য। নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে একাকী সালাত আদায় করতে দেখে বলেন, এমন কেউ আছে যে, এক ব্যক্তিকে দান করবে অর্থাৎ তার সাথে সালাত আদায় করবে? (যেন তার সালাত জাম'আতে হয়)। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে খোজায়মা ইবনে হিব্বান, হাকেম)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে সালাত পড়ছিলেন। আমি এসে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি আমার পাশে এসে

দাঁড়াল। তারপর আরেক ব্যক্তি আসায় আমরা এখন একটি দলে পরিণত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বুঝলেন যে, আমরা একদল লোক তাঁর পেছনে সালাত পড়ছি এবং তাঁকে ছাড়াই আমাদের জামায়াত জায়েয হবে, তখন তিনি নিজ ঘরে চলে গেলেন এবং সালাত পড়লেন। কিন্তু আমাদের সাথে পড়লেন না। সকালে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি রাত্রে আমাদের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, সেজ্যনই আমি এরূপ করেছি। (মুসলিম) অর্থাৎ তাদের একজন তখন ইমামতি করেন।

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হুজরায় নামায পড়ছিলেন। হুজরার দেয়াল ছিল খাট। লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত পড়তে দেখে তাঁর সাথে জামা'য়াতে শামীল হয়ে যান, সকালে সবাই এ সালাত সম্পর্কে আলোচনা করল। তিনি দ্বিতীয় রাতও সালাত পড়েন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে সালাত শুরু করেন। (বোখারী)

উপরোক্ত হাদীসগুলো একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তির ইমাম হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে ফরজ ও নফল-সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য না করাই মূলনীতি। কেননা, পার্থক্য সৃষ্টির পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ নেই।

৪৬. সালাত শেষে সালাম ফিরানোর পর একসাথে হাত তুলে ইমামের দোআ করা : সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ মোহাম্মদ ইবনে ওসাইমিন বলেছেন, এটা হচ্ছে বেদআত, যা নবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত নেই। মুসল্লীদের জন্য যে জিনিস সুন্নাত সেটা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ সালাত শেষে যে সকল দোআ পাঠ করেছেন সেগুলো নিজে একা একা পাঠ করা এবং শব্দ করে উচ্চারণ করা। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ফরজ সালাত শেষে লোকেরা শব্দ করে দোআগুলো পাঠ করত।' (বুখারী)

৪৭. ফরজ সালাতের সালাম ফিরানোর পর কপালে হাত রেখে মনগড়া দো'আ পাঠ : কপালে হাত রেখে দো'আ পড়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের সনদ দুর্বল বলে কেউ কেউ এরূপ দোআ পড়াকে বেদআত বলে অভিহিত করেছেন। হাদীসগুলো হলো–

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর ডান হাত মাথায় রেখে এ দোয়াটি পাঠ করতেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ- اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ.

(তাবারানী, নাইলুল আওতার, মুসনাদে বাজ্জার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

নাসিরুদ্দীন আলবানী তাবরানীর আওসাতে বর্ণিত সনদ এবং খতীবের সনদকে দুর্বল বলেছেন এবং ইবনে সুন্নী ও নোআইমের বর্ণনাকে, জাল বলেছেন, ইবনে সুন্নীর 'আ'মালুল ইয়াওম ওয়াল লাইল' গ্রন্থের বর্ণিত দোআটি হচ্ছে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

কিন্তু এও বলেছেন, আল্লামা সুয়ূতী হাদীসটি খতীব থেকে 'আল জামেতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের একটি সনদও আপত্তিকর নয়। তাই মনগড়া কোন দোআ পড়ার চেয়ে এ দোয়াটি পড়া যেতে পারে।

৪৮. আযান ও একামাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর নাম শুনে নখে ও মুখে চুমা খাওয়া এবং নামাজের পরে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত জিকির-আযকার না করা : আযান ও ইকামতে' মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ শব্দটি শুনে নখে ও আঙ্গুলে চুমু খাওয়া সংক্রান্ত যে দু'টি হাদীস পাওয়া যায়, সে হাদীস দু'টি সহীহ হাদীস নয়। আল্লামা সাখাওয়ী বলেছেন, হাদীস দু'টির সনদ মহানবী ﷺ পর্যন্ত পৌছায় না।

(রাদ্দে মোহতার, ১ম খণ্ড, ৩৭০)

আল্লামা আব্দুল হাই লখনবীও তাই বলেছেন। তাঁর মতে, যারা বলে এ মর্মে হাদীস অথবা সাহাবীদের আছার আছে সে মিথ্যুক এবং এ কাজটি জঘন্য বেদআত কাজ। (সেআরাহ ২য় খণ্ড; যাহরাহতু রিয়াদিল আবরাহ–৭৬–পৃ:)

অশুদ্ধ হাদীস দুটি হলো–১. নবী করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মুআজ্জিনের اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যটি শুনে তা বলে এবং দু' হাতের তর্জনী আঙ্গুলদ্বয়ের ভেতরের অংশে চুমু খেয়ে তা চোখে লাগায় তার জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যায়।' (মুসনাদে ফেরদাউস–দাইলামী)

দ্বিতীয় হাদীসটি হলো, খিজির (আ)-থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মুআজ্জিনের মুখে উপরোক্ত বাক্যটি শুনে বলে–

مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةُ عَيْنِىْ - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুল দুটির চুমু খেয়ে তা চোখের ঠোকায় সে অন্ধ হবে না এবং তার চোখও উঠবে না।

(মুজেবাতুর রহমান ওয়া আযায়েমুল মাগফেরাহ–আবুল আব্বাস মাদানী সূফী)

* ফরজ সালাতের সালাম ফিরানোর পর নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত দোয়া-জিকির না পড়া।

৪৯. পায়ের আঙ্গুলের মাথা দিয়ে কাতারে সোজা করা : হাদীস শরীফে পায়ের গোড়ালী এবং কাঁধ এক সমান রেখে কাতার সোজা করার নির্দেশ রয়েছে। আনাস (রা) বলেন, আমরা আমাদের সালাতের সাথীর সাথে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম। নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, আমি লোকদেরকে তার সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের গোড়ালী সাথে গোড়ালী মিলিয়ে কাতার সোজা করার ব্যাপারে রাসূল করীম ﷺ-এর আদেশ পালন করতে দেখেছি।

সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ সালেহ ও সাইমীন বলেছেন, কাতার সোজা করার ব্যাপারে পায়ের গোড়ালীই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। গোটা শরীর গোড়ালীর উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন জনের আঙ্গুল বড় ছোট রয়েছে। কাজেই আঙ্গুল কাতার সোজা করার কোনো ভিত্তি হতে পারে না।

৫০. ওমরী কাজা : যারা বালেগ হওয়ার পর অজ্ঞতা, অবহেলা, অবজ্ঞা বা অন্য কোন কারণে সালাত পড়েনি, হেদায়েতের অনুভূতি লাভের পর তারা অতীতের ঐ সকল সালাতগুলো ক্ষতিপূরণের জন্য পেরেশান হয়ে যায়। সেজন্য সাধারণভাবে ওমরী কাজার ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এ ধারণাটি কুরআন ও হাদীস সমর্থিত নয়। কাজা আদায় করতে হয় সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তের হারানো সালাতের যা সুস্পষ্ট জানা আছে। কিন্তু যে সালাতের সুনির্দিষ্ট নাম, ওয়াক্ত ও সংখ্যা জানা নেই, তার কাজা অনুমান করা যায় না। অনুমান কোন ইবাদত হয় না। বরং বিনা ওজরে ছেড়ে দেয়া নামাজের জন্য তাকে যা করতে হবে তা হলো, অতীতের গুনাহের জন্য তওবা-ইস্তেগফার করা এবং কান্নাকাটি করা। আল্লাহ শিরক ছাড়া সকল

গুনাহ মাফ করেন। পক্ষান্তরে, বর্তমানে বেশি করে নফল ও সুন্নাত সালাত পড়লে অতীতের নফলগুলোসহ ছুটে যাওয়া ফরজসমূহের ক্ষতিপূরণ হবে, ইনশাআল্লাহ। সহীহ হাদীসে আছে, কারো ফরজ সালাত কম হলে নফল সালাত তা পূরণ করে দেবে। (আবু দাউদ)

খ. জুমুআর সালাতের প্রচলিত ৭টি ভুল সংশোধন

১. গোসল না করা : আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালেগের গোসল করা ওয়াজিব।

(মুআত্তাসহ হাদীসের ৬টি বিশুদ্ধ কিতাব)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : 'জুমআর দিন আসলে সেদিন তোমরা গোসল করবে।" (হাদীসের একাধিক বিশুদ্ধ কিতাব) কেউ জুমআ পড়তে চাইলে সে যেন গোসল করে।" (মুসলিম)

২. মুসল্লীদের ঘাড় টপকিয়ে সামনের কাতারে শরীক হওয়া : আব্দুল্লাহ ইবনে বোসর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খোতবা প্রদানের সময় এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে আদেশ দেন, বস, তুমি লোকদেরকে কষ্ট দিয়েছ।

ইমাম তিরমিযী ঘাড় টপকিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়াকে ওলামায়ে কেরামের মতে মাকরূহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে, এরূপ করা হারাম। ইমাম নওয়ী বলেছেন, সহীহ হাদীসের আলোকে তা হারাম। ইমাম আহমদের মতে, তা মাকরূহ।

আল্লামা এরাকী কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি লোকদের ঘাড় টপকানোর চেয়ে জুমুআ ত্যাগ করাকে পছন্দ মনে করি। ইবনুল মোসাইয়্যের বলেন : মুসল্লীর ঘাড় টপকানো অপেক্ষা আমার কাছে নিজ ঘরে জুমুআর সালাত পড়া উত্তম বলে বিবেচিত। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে, তা হারাম।

৩. জুমু'আর সময় দু'পা পেটের সাথে কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখা কিংবা হাত দিয়ে ধরে রাখা : মুআজ ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর সময় ইমামের খোতবা দানকালে পেটের সাথে দু'পা বেঁধে কিংবা হাত দিয়ে ধরে রাখতে নিষেধ করেছেন। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম)

ইবনুল আসীর তাঁর 'আন-নেহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, এভাবে বসলে ঘুম আসে এবং অযু ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এছাড়াও এর ফলে সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

৪. জুমুআর দিন দ্বিতীয় আযানের সময় মসজিদে প্রবেশ করে আযানের জবাব দানের জন্য অপেক্ষা করা এবং খোতবার প্রারম্ভে তাহিয়াতুল মসজিদ সালাত না পড়া : এর ফলে প্রবেশকারী সুন্নাতের সওয়াব লাভের জন্য ওয়াজিব লঙ্ঘন করে। আযানের জওয়াব দেয়া সুন্নাত, আর খোতবা শুনা ওয়াজিব। আযানের সময় মসজিদে প্রবেশকারীকে খোতবা শোনার স্বার্থে দু'রাকায়াত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সংক্ষেপে পড়তে হবে। এ মর্মে নবী করীম ﷺ বলেছেন : ইমামের খোতবার সময় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু'রাকায়াত সালাত পড়ে এবং তাড়াতাড়ি করে।' (মুসলিম আহমদ, আবু দাউদ) যারা এ দুরাকায়াত সালাত পড়ে না। তারা হাদীসের বিরোধিতা করে।

৫. জুমুআর ফরজের পর কথা বা কাজ ব্যতীত অবিচ্ছিন্নভাবে সুন্নাত পড়া : নিয়ম হলো, ফরজের পর কোন দরকারী কথা বলবে বা কোন কাজ করবে। তারপর সুন্নাত সালাত পড়বে। এ মর্মে নামেরের বোনের ছেলে সায়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী মুয়াবিয়ার সাথে মাকসুরায় সালাত পড়েছি। ইমামের সালাম ফিরানোর পর একই স্থানে দাঁড়িয়ে আমি (সুন্নাত) সালাত পড়লাম। তিনি আমার কাছে লোক পাঠান এবং বলেন, তুমি যা করলে আর এরূপ করবে না, তুমি ফরজ পড়ার পর হয় কথা বলবে, আর না হয় বের হয়ে যাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কথা বলা কিংবা বের হওয়ার ছাড়া পূর্ববর্তী সালাতের সাথে পরবর্তী সালাত মিলিয়ে না পড়ি। (মুসলিম)

ইমাম নববী (র) বলেছেন : আমাদের সাথীদের মতে, ফরজ সালাতের স্থান থেকে সরে গিয়ে সুন্নাত ও নফল সালাত পড়া মুস্তাহাব। উত্তম হলো, মসজিদ থেকে ঘরে গিয়ে নফল ও সুন্নাত পড়া। তা না হলে, মসজিদের অন্য স্থানে সরে গিয়ে সালাত পড়া। এর ফলে সিজদার স্থান বাড়বে এবং ফরজের স্থান থেকে সুন্নাত ও নফলের স্থানের মধ্যে পরিবর্তন হবে। কথার মাধ্যমে ও সংযোগহীনতা সৃষ্টি হয় তবে, স্থান পরিবর্তন উত্তম। (শরহে মুসলিম-ইমাম নওয়ী, ৬খণ্ড, ১৭০-১৭১পৃ:)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন, জুমু'আসহ অন্যান্য সালাতেও সুন্নাত পদ্ধতি হলো, ফরজ ও সুন্নাতের মধ্যে সংযোগহীনতা সৃষ্টি করা। কেননা, নবী করীম ﷺ দু'ধরনের সালাতের মধ্যে কেয়াম কিংবা কথা দ্বারা সংযোগহীনতা সৃষ্টি করা হয়। অনেক লোক সালাম ফিরানোর পরপরই দুরাকায়াত সালাত পড়া শুরু করে। এটা সঠিক নয়। কেননা, এতে নবী করীম ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। এর লক্ষ্যে হয় ফরয ও সুন্নাত-নফলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা।

৬. জুমু'আর খোতবার সময় কথা বলা : জুম'আর খোতবার সময় কথা বলা নিষেধ। এ মর্মে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

'তুমি যদি জুমুআর সময় ইমামের খোতবা চলাকালে তোমার সঙ্গীকে চুপ করতে বল, তাহলে তুমি لَغْوٌ করলে।' (বোখারী) لَغْوٌ শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। ১. ভুল করা, ২. সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া, ৩. জুমুআর ফযীলত বাতিল হওয়া ইত্যাদি।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, খোতবার সময় কথা বললে তাকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া সৎ কাজের আদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সত্ত্বেও যদি সওয়াব বাতিল হয়ে যায় তাহলে, অন্য কোন শব্দ উচ্চারণের প্রশ্নই উঠে না। অর্থাৎ খোতবার সময় নিরিবিলি একাগ্রচিত্তে খোতবা শুনতে হবে। তাতে কোন কথা বলে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, খোতবার সময় সকল প্রকার কথাবার্তা।
(ফাতহুল বারী-শরহে বোখারী-ইবনে হাজার আসকালানী-২য় খণ্ড, ৪১৫ পৃ:) এমনকি কংকর সরানোও নিষিদ্ধ নিষেধ।

এ মর্মে ইবনুল মুনজেরী আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবু জার (রা) থেকে বর্ণিত। আমি জুমআর সময় মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন নবী করীম ﷺ খোতবা প্রদান করছিলেন। আমি উবাই ইবনে কা'বের পাশে বসা ছিলাম। নবী করীম ﷺ সূরা তাওবা পাঠ করলেন। আমি উবাইকে জিজ্ঞেস করলাম কবে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে? তিনি আমার দিকে চেহারার চামড়া কুঁচকে অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকালেন এবং কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পর আমি পুনরায় একই প্রশ্ন করলে তিনি একই ভাবের পুনাবৃত্তি করলেন এবং কোন প্রকার উত্তর দিলেন না। নবী করীম ﷺ সালাত শেষ করেন। আমি উবাইকে প্রশ্ন

করলাম, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কেন এবং চেহারার চামড়া কুঁচকালেন কেন? উবাই জবাব দেন, তুমি তো তোমার সালাত বাতিল করেছ। আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এ ঘটনাটি খুলে বললে তিনি উত্তরে বলেন, উবাই সত্য বলেছে। (ইবনে খোজাইমা)

উবাইর সাথে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের অনুরূপ এক ঘটনা ঘটেছিল। তিনিও নবী করীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে উবাইর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে নবী করীম ﷺ বলেন, উবাই ঠিকই বলেছে, উবাইকে অনুসরণ কর।

(আবু ইয়ালী, ইবনে হিব্বান)

জুমআর খোতবা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা শ্রবণ করার প্রয়োজনীয়তা কতবেশি এটা উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

৭. খোতবার আগে সুন্নাত পড়ার সময় দেয়া : অনেক মসজিদে জুমআর খোতবার আগে বক্তৃতা দেয়া হয়। বক্তৃতা শুনার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, এখন কেউ নমায পড়বেন না খোতবার সাথে সুন্নাত পড়ার সময় দেয়া হবে। এর ফলে, মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাকাত সুন্নাত নামায পড়ার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর আদেশের বিরোধিতা করা হয়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اِذَ دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَايَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ـ

'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুরাকায়াত সালাত পড়ার আগে না বসে।' (বোখারী)

অথচ, বক্তৃতা শোনার জন্য তাকে সে আদেশ পালন করা থেকে বারণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আদেশের মধ্যে কি কোন কল্যাণ নিহিত রয়েছে?

এ সমস্যার মূল কারণ হলো, স্থানীয় ভাষায় খোতবা না দেয়া। আরবি খোতবা লোকেরা বুঝে না বলে আগে বাংলায় বক্তৃতা করে এর ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা হয়। এর ফলে তিনবার খোতবা দিতে হয়। নবী করীম ﷺ মাত্র দুটি খোতবা দিয়েছেন। স্থানীয় ভাষায় খোতবা দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। এ মর্মে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া রয়েছে। দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু যোগ-বিয়োগ বা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না।

গ. অযু-গোসলে প্রচলিত ১৭টি ভুল সংশোধন

১. অযু করার সময় প্রকাশ্যে নিয়ত উচ্চারণ করা : এটা সুন্নাতের পরিপন্থী। সুন্নাত পদ্ধতি হলো, মনে মনে অযুর নিয়ত করা এবং মুখে উচ্চারণ না করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন, মুখে নিয়তের উচ্চারণ বুদ্ধি ও দ্বীনদারির ঘাটতি। দ্বীনদারীর ঘাটতি হলো বেদআত। আর বুদ্ধির ঘাটতির উদাহরণ হলো কেউ খাওয়ার সময় যদি অনুরূপ নিয়ত করে যে, আমি খাবারের এ পাত্রটিতে হাত দেয়ার নিয়ত করলাম, আমি তা থেকে এক লোকমা মুখে দিয়ে চিবিয়ে গিলে তৃপ্ত হওয়ার নিয়ত করলাম। মোটকথা, এগুলো ঠিক নয়।

ইবনুল কাইয়েম (র) বলেছেন, নবী করীম ﷺ অযুর শুরুতে–

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّا لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةِ لِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى :

বলতেন না, অথবা কোন সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনুরূপ কিছু বর্ণিত নেই। এমনকি কোন দুর্বল হাদীসেও এরূপ কোন হাদীস বর্ণনা আসেনি।

লোকেরা অযুর দোআ-এ নামেও একটি দোআ পড়ে। সেটি হলো।

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ ـ اَلْاِسْلَامِ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلُمَاتٌ ـ

এরূপ দোয়ার সমর্থনেও কোন হাদীস বা সাহাবায়ে কেরামের সমর্থন নেই। তাই এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত।

ইবনুল কাইয়্যুম (র) বলেছেন, অযুর শুরুতে নবী করীম ﷺ থেকে বিসমিল্লাহ এবং অযু শেষে নিম্নোক্ত দোআ ব্যতীত আর কিছু বর্ণিত নেই।

১ম

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً اعَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

২য়

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

২. অযু-গোসলে পানির অপচয় করা : যারা পুকুর-নদীনালা ও সাগরে অযু করে এবং যারা কলের পানি বা কূপের পানি দিয়ে অযু করে তাদের উভয়ের বেলায় পানির অপচয়ের বিষয়টি প্রযোজ্য।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ৫ মোদ পানি দিয়ে গোসল এবং এক মোদ পানি দিয়ে অযু করতেন। (বোখারী)

ইমাম বোখারী (র) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম পানির অপচয় এবং নবী করীম ﷺ-এর ব্যবহৃত পানির পরিমাণ অতিক্রম করাকে মাকরূহ বলেছেন।

(বোখারী, কিতাবুল অযু)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন, নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণ, কেউ বেশি পানি ব্যবহার করে অপচয় করতেন না।

সা'দ ইবনে আবু আক্কাস (রা) বেশি পানি দিয়ে অযূ করছিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি বলেন, হে সা'দ! তুমি পানির অপচয় কর কেন? সা'দ জবাব দেন, অযূর মধ্যেও কি অপচয় আছে? নবী করীম ﷺ বলেন, হ্যাঁ, যদি তুমি প্রবাহমান নদীর মধ্যেও অযু কর। (ইবনে মাজাহ) অপচয় সব ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, কম পানি ব্যবহার ব্যক্তির বুদ্ধি প্রতিপত্তির প্রমাণ। তাঁর ছাত্র মারওয়াজী বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমদ) অযূর সময় লোক চক্ষুর আড়াল করে রাখতাম যেন তাঁর কম ব্যবহারের কারণ তারা না বলে যে তিনি ভালো করে অযু করেন না। তিনি অযু করলে মাটি প্রায় ভিজত না।

আবুল ওফা ইবনে আ'কীল বলেন, নবী করীম ﷺ-এর চরিত্রে ও ইবাদতে বেশি বেশি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। (জাইল তাবাকাতিল হানাবেলা, ১ম, খণ্ড-১৫০)

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে পবিত্রতা অর্জন ও দোয়ায় সীমালঙ্ঘনকারী, একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে।' (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

আ'ওনুল মা'বুদ কিতাবের লেখক বলেছেন, তিন কাজে সীমালঙ্ঘন হতে পারে–

ক. তিনবারের বেশি অঙ্গ ধৌত করা,

খ. পানি বেশি খরচ করা এবং

গ. ওয়াসওয়াসার কারণে প্রয়োজনের চেয়ে অঙ্গের বেশি অংশ ধৌত করা।
অতঃপর তিনি বলেন, ওলামায়ে কেরামগণ পানির অপচয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যদিও সেটা সাগরের তীরের পানিই হোক না কেন।

৩. ভালোভাবে পরিপূর্ণ উপায়ে উত্তমরূপে অযু না করা : মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমরা ভালো করে অযু আদায় কর। আবুল কাসেম মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, পায়ের গোড়ালীর জন্য জাহান্নামের আগুনের ধ্বংস।' (বোখারী) অর্থাৎ পায়ের গোড়ালী সাধারণত ভালো করে ধোয়া হয় না বলে তাতে পানি পৌঁছে না। তাই তা জাহান্নামের কারণ হবে।

খালেদ ইবনে মা'দান নবী করীম ﷺ-এর এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাত পড়তে দেখেন, অথচ তার পায়ের উপরের অংশে এক সিকি পরিমাণ জায়গা শুকনো রয়েছে, তিনি তাকে পুনরায় অযূর নির্দেশ দেন।' (আহমদ) আবু দাউদ আরো একটু বেশি বর্ণনা করে বলেছে, তিনি তাকে সালাত পুনরায় পড়ারও নির্দেশ দেন।' ইমাম আহমদ (র) বলেন, এ হাদীসের সনদ সঠিক।

আল্লামা শাওকানী (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ পরিমাণ স্থান শুকনো রেখেছে, এ হাদীস তার পুনঃ অযুর ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

অযূর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা জরুরি। বহু লোক অযুর অঙ্গগুলোতে ঠিকমতো পানি পৌঁছেছে কিনা তার প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না। তাদের জন্য নিম্নের হাদীসগুলো খুবই প্রয়োজনীয়।

ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স ভালোভাবে অযূ করল, ফরয সালাত পড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ লোকদের সাথে জামআতে সালাত পড়ল, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা দেবেন।' (মুসলিম, আমহদ, নাসাঈ)

আবু আইউব এবং ওকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তিকে যেভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে। সেভাবে অযূ ও সালাত আদায় করলে তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা মার্জনা করে দেয়া হবে।'

(আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

৪. পেশাবের অপবিত্রতা থেকে না বাঁচা : নবী করীম ﷺ এটাকে কবীরা গুনাহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মক্কা অথবা মদীনার একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দু'ব্যক্তির কবর থেকে চিৎকার শুনতে পেলেন অতঃপর তিনি বলেন, তারা বড় কোন বিষয়ে আযাব ভোগ করছে না। তারপর বলেন, তাদের একজন পেশাবের অপবিত্রতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করত না এবং অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি খেজুরের একটি ডাল আনার নির্দেশ দেন। তিনি এটাকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে দু'কবরের উপর দু'অংশ গেঁড়ে দেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ রাসূল ﷺ! আপনি এটা কেন করলেন? তিনি জবাব দেন, এগুলো শুকানোর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের আযাব লাঘব করতে পারেন।' (বোখারী)

পেশাব করার সময় পেশাব বা পেশাবের ছিঁটা গায়ে বা কাপড়ে পড়লে তা অপবিত্র হয়ে যায়। নাপাক শরীর ও কাপড় দিয়ে সালাত পড়লে সালাত হবে না।

৫. পেশাব-পায়খানা করার সময় সতর ঢেকে না রাখা : উরু ঢাকা জরুরি এবং তা সতরের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে উরু খোলা রেখে পেশাব-পায়খানা করে। একবার নবী করীম ﷺ জোরহোদ নামক সাহাবীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, হে জোরহোদ! তোমার উরু ঢাক, কেননা, উরু হচ্ছে সতর।'

(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর।' (হাকেম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উরু সতর। (তিরমিযী)

তাই পেশাব-পায়খানা করার সময় উরু ঢেকে বসতে হবে।

৬. পেশাব থেকে পবিত্রতার নামে বাড়াবাড়ি করা : কিছু লোক পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের নামে শয়তানের ওয়াসওয়াসার শিকার হন। তারা পবিত্রতার জন্য মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করে। এজন্য কৃত্রিমতা অবলম্বন করতে গিয়ে শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করে ফেলে। তারা পেশাবের সর্বশেষ ফোঁটা বের করার জন্য পুরুষাঙ্গ ধরে ৪০ কদম হাঁটে, এক পা, এক পা করে দু'পা দিয়ে চিপে, যেন সেনাবাহিনীর কসরত! তাদের যুক্তি হলো, বদনার পানি ফেলে দেয়ার পর উপুড় করে রাখলে অল্প অল্প করে ফোঁটা তৈরি হয়ে নিচে পড়ে। তেমনি পেশাবও আস্তে আস্তে ঝড়ে পড়ে। এজন্য কাশি দেয় এবং গলা ঘক, ঘক্ করে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (র) বলেছেন, শয়তানের ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত লোকেরা পেশাবের পর ১০টি কাজ করে। সেগুলো হলো–

১. পুরুষাঙ্গকে গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত হাত দিয়ে টেনে এবং চিপে পেশাবের সর্বশেষ ফোঁটা বের করে।
২. গলা ঘক্ ঘক্ যেন করে অবশিষ্ট পেশাব বের হয়।
৩. নিচ থেকে উপরে উঠে আর তাড়াতাড়ি বসে পড়ে।
৪. রশি বেয়ে উপরের দিকে ওঠার পর নিচে নেমে বসে পড়ে।
৫. পুরুষাঙ্গের মাথায় পেশাবের ফোঁটা দেখে পুরুষাঙ্গের ছিদ্রকে ফাঁক করে করে পবিত্রতা জন্য পানি ঢালে।
৬. পুরুষাঙ্গের মাথায় তুলা দিয়ে রাখে।
৭. পুরুষাঙ্গের মাথায় ন্যাকড়া বেঁধে রাখে।
৮. সিঁড়ি বেয়ে উপরে একটু উঠার পর দ্রুত নেমে আসে।
৯. কিছুক্ষণ হাঁটার পর পুনরায় কুলুব ব্যবহার করে।

ইবনুল কাইয়ুম বলেন, আমাদের ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন– এগুলো সবই শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং বেদআত কাজ। তিনি বলেন প্রথম দু'টির বিষয়ে হাদীস অনুসন্ধান করে সহীহ কোন হাদীস পাইনি বরং দুটির ব্যাপারে একটি দুর্বল হাদীস রয়েছে যার উপর আমল করা যায় না। তিনি বলেন, পেশাবের উদাহরণ হলো স্তনের দুধের মত। দোহান করলে দুধ বের হবে, আর ছেড়ে দিলে দুধ স্থিতিশীল থাকবে, অর্থাৎ কিছুই বের হবে না। যারা এ কাজের বদ অভ্যাস করেছে তারা ওয়াসওয়াসার শিকার। আর যারা তা করেনি তারা তা থেকে মুক্ত। যদিও সকল কাজ সুন্নাত হতো, তাহলে এগুলো সবার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবায়ে কেরামগণ করতেন।

(এগাছাতুল লাহফান-ইবনুল কাইয়েম. ১ম খণ্ড, ১৪৩, ১৪৪ পৃ:)

শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সালাম বলেন : শয়তানের ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত লোকেরা উপরোক্ত যে ১০টি কাজ করে, মহানবী ﷺ তা করেননি। এগুলো সবই শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং গোমরাহীর অন্তর্ভুক্ত। (আস-সুনান ওয়াল মুবতাদেআত-পৃ. ২৫)

পুরুষাঙ্গ ধরে হাঁটাহাঁটি করাই সতর লঙ্ঘন। পুরুষাঙ্গ ধরে হাটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়ও বটে। অনেক বাড়িতে মেয়েলোকের সামনেও এ কাজ নিজ লজ্জাস্থান ধরে এভাবে হাঁটত তখন সেটা কি রকম বেহায়াপনা হতো। এটাও ঠিক তেমনি এক ভয়াবহ বেহায়াপনা। পেশাব ধীরে সুস্থে করতে হবে। এরপর ঢিলা বা পানির যে কোন একটা ব্যবহার সকলেই পাক হওয়া যায়। তাড়াহুড়া করে পেশাব করলে পেশাব ঝরার আশঙ্কা থাকতে পারে। কিন্তু ধীরে সুস্থে পেশাব করলে সে আশঙ্কা থাকে না। তাই নিজেদেরকে বিনা প্রয়োজনে ঐ সকল বদ অভ্যাসের রোগী বানানো ঠিক হবে না। আর যাদের পেশাব ঝরার রোগ রয়েছে তারা প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য নতুন অযু করে নেবেন।

৭. পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত পড়া : এটা ঠিক নয়। এর ফলে নিজের কষ্ট তো আছেই। এছাড়াও নবী করীম ﷺ-এর আদেশের বিরোধিতা করা হয়। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, খাওয়া উপস্থিত হলে এবং দুটি নিকৃষ্ট জিনিসকে (পেশাব-পায়খানা) দমন করা অবস্থায় সালাত হতে পারে না। (মুসলিম)

৮. ঘুম থেকে জেগে হাত না ধূয়ে পানির পাত্রে হাত ঢুকানো : হাদীসের মধ্যে এসেছে, পানির পাত্রে হাত ঢুকানোর আগে হাত ধুয়ে নিতে হবে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তিনবার হাত ধোয়ার আগে সে যেন পানির পাত্রে নিজ হাত না প্রবেশ করায়। তোমরা জাননা, তোমাদের হাত রাত্রে কোথায় থাকে।

(মালেক, শাফেঈ, আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং অন্য ৪টি হাদীসের বিশুদ্ধ কিতাব)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : হাত ধোয়ার পেছনে তিনটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে–

১. পায়খানা-পেশাবের রাস্তায় হাত লাগলে নির্গত ঘাম বা নাপাকী হাতে লাগতে পারে।

২. হাতের মধ্যে শয়তানের স্পর্শ লাগতে পারে। যেমন, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগলে সে যেন নিজের নাকের দুটো ছিদ্র ভালো করে ঝেড়ে নেয়। শয়তান

তার নাকের ছিদ্রের ভেতর বাস করে। (বোখারী, মুসলিম) এ হাদীস দ্বারা নাক পরিষ্কার করার যে কারণ জানা গেল, সেটা হলো, সেখানে শয়তানের রাত্রি যাপন। তাই একই কারণ হাত ধোয়ার পেছনেও প্রযোজ্য হতে পারে।

৩. এটা ইবাদতের বিষয় যার অর্থ আমাদের বোধগম্য নয়।

৯. অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ না বলে : সাঈদ ইবনে যায়েদ এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, : অযু ছাড়া সালাত হয় না এবং বিসমিল্লাহ বলা ছাড়া অযূ হয় না।' (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম)। সৌদী আরবের সুপ্রিম ওলামা কাউন্সিলের সদস্য শেখ আব্দুল্লাহ জিবরীন বলেছেন, কোন কোন আলেমের মতে, পেশাব ও পায়খানা যেতে বিসমিল্লাহ বলা মাকরূহ এবং অযূতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। (শরহু মানার আস-সাবীল)

১০. গর্দান মাসেহ করা : গর্দান মাসেহ করার ব্যাপারে রাসূলে করীম ﷺ থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই। তালহা ইবনে মাসরাফ তার পিতা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘাড় মাসেহ সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীস দুর্বল। তাই ইমাম নওয়ী, ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে হাজার আসকালানী এটাকে দুর্বল হাদীস বলেছেন।

১১. যমযমের পানি দিয়ে অযু না করা : যেকোন পানি দিয়েই অযু-গোসল সবই করা যায়। সেটা যমযমের পানি হলেও। আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর 'যাওয়ায়েদ আল-মুসনাদ' গ্রন্থে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ হজ্জ থেকে মসজিদে হারাম পৌঁছে এক বালতি পানি আনার আদেশ দেন । তিনি সে পানি পান করেন এবং তা দিয়ে অযু করেন।

আল্লামা সা'আতী বলেছেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যমযমের পানি পান করা ও তা দিয়ে অযু করা মুস্তাহাব।' (আল-ফাতহুর রাব্বানী-১১শ খণ্ড, ৮৬ পৃ:)

ইমাম নববী শরহে মুসলিমে লিখেছেন, আব্বাস (রা) থেকে যমযমের পানি দ্বারা গোসল করা নিষিদ্ধ মর্মে বর্ণনা সহীহ নয়।

সৌদী আরবের পরলোকগত জেনারেল মুফতী শেখ আব্দুল আযীয ইবনে বাজ বলেছেন, যমযমের পানি দিয়ে অযু জায়েয। তেমনি প্রয়োজন দেখা দিলে এস্তেঞ্জা এবং ফরজ গোসলও জায়েয। তাঁর মতে, নবী করীম ﷺ-এর হাতের আঙ্গুলীর ফাঁক দিয়ে উৎসারিত পানি অযু-গোসল ও পান করার জন্য জায়েয ছিল। যমযম সে ধরনের পানি না হলেও দু'পানিই পবিত্র। তাই দুটি পানির হুকুম একই হবে। (ফাতাওয়া বি আহকামিল হজ্জ ওয়াল ওমরাহ–শেখ আ: আযীয ইবনে বাজে)

১২. মাসিক সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে সালাত না পড়া : মহিলারা মাসিক সম্পর্কিত মাসয়ালা না জানার কারণে সালাতের ক্ষেত্রে অনেক ভুল করে বসে। কেউ যদি শেষ ওয়াক্তে পবিত্র হয়, তার উপর ঐ ওয়াক্ত আদায় করা ফরজ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ১ রাকাত আসরের সালাত পায় সে পুরো আসর পেয়ে গেল।' (বোখারী, মুসলিম)

তাকে বাকি রাকায়াতগুলো পড়া অব্যহত রাখতে হবে। তখন সূর্যাস্ত হলেও সমস্যা নেই। আর যদি সূর্যোদয়ের আগে ১ রাকায়াত সালাত পরিমাণ সময় আগে পবিত্র হয়, তাকে ফজর পড়তে হবে। সালাতের শেষ সময়ে পাক হওয়া সত্ত্বেও গোসল করতে অবহেলা করায় সালাতের সময় চলে গেলে কবীরা গুনাহ্ হবে। মাতা-পিতা ও স্বামীর কর্তব্য হল মেয়েলোকদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা ও তাকিদ দেয়া। নচেৎ তারাও সালাত লঙ্ঘনের গুনাহের শরীক হবে।

ইমাম ইবনুন নাহ্হাস বলেছেন, সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর যদি মাসিক আসে এবং যদি ঐ সময়ে সালাত আদায় করা সম্ভবপর হয়, তাহলে পাক-পবিত্র হওয়ার পর সে ওয়াক্তের কাজা আদায় করতে হবে।

(তাম্বীহ আল-গাফেলীন-ইবনুন নাহহাস-পৃষ্ঠা : ৩১১)

শেখ সালেহ্ ইবনে ওসাইমিন বলেছেন, সালাতের ওয়াক্ত শুরুর যেমন সূর্য হেলার আধ ঘণ্টা পর মাসিক দেখা দিলে পরে ঐ সালাত কাজা আদায় করতে হবে। কেননা, ওয়াক্ত শুরুর সময় সে পাক ছিল। (ফাতাওয়াহ আল-মারআহ-২৫ পৃ:)

১৩. অযু করার পর শরীর ও কাপড়ে নাপাকী লাগলে অযু ভঙ্গ হয় না। অনুরূপভাবে, নখ অথবা চুল কাটলেও অযু নষ্ট হয় না। যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় এগুলো তার মধ্যে বিদ্যমান নেই।

১৪. পাক হওয়া সত্ত্বেও ৪০ দিন পর্যন্ত নেফাসের মেয়াদ পূরণ করা : সন্তান প্রসবের পর যেদিন পাক হবে সেদিন থেকে সালাত-রোযা শুরু করবে। ৪০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই। আরো আগে পাক হওয়া সত্ত্বেও সালাত রোযা না করলে কবীরা গুনাহ্ হবে।

বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্র্যাকটিক্যাল সালাত বইটি পড়ার পর সালাতের ভুলগুলো ও আলোচনা হলে সালাতকে পরিপূর্ণ করার পথে আর কোন বাধা থাকে না। উপরন্তু সালাতের জন্য দরকার পরিবত্রতা অর্জন। অযু-গোসলের মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। তাই সালাতের ত্রুটির

পাশাপাশি অযু-গোসলের ভূল-ত্রুটিগুলোও আলোচনার দাবি রাখে। সেজন্য আমি অযু-গোসলের ভুল-ত্রুটিগুলোও আলোচনা করেছি।

মুসলমানের সাপ্তাহিক ঈদ হলো জুমআর দিন। সে কারণে জুমআর সালাতের ভুল-ত্রুটিগুলো শোধরানো দরকার। সে কাজটুকুও সম্পন্ন করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। হাদীস শরীফে এসেছে, মহানবী ﷺ বলেছেন, বান্দাহকে সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে সালাতের হিসেব দিতে হবে। সালাতের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর হিসেবও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। তাই আসুন, মহান কেয়ামত দিবসের প্রস্তুতি হিসেবে আমরা নামায ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা চালাই। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দিন, আমীন।

তথ্য সূত্রে : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামায, এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

৭. কতিপয় প্রচলিত বিদআতী নামায

এ কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে কোন ইবাদত কবুল হওয়ার মূল ভিত্তি হল তাওহীদ। আর তা শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক শর্ত হল ২টি; ইখলাস ও মুহাম্মাদী তরীকা। সুতরাং যে নামায মুহাম্মাদী তরীকায় নেই, তাতে পূর্ণ ইখলাস থাকলেও তা বিদআত। মহানবী ﷺ বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

"যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" (সহীহ মুসলিম ১৭১৮)

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

"আর নবরচিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকো। কারণ, নবরচিত কর্ম হলো বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হলো জাহান্নাম। (আবু দাউদ, সহীহ নাসাঈ, ১৪৮৭)

সাধারণ নফল নামায নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে ইচ্ছামত সংখ্যায় পড়া যায়। কিন্তু সেই সাধারণ নামাযকে নিজের তরফ থেকে সময়, সংখ্যা, পদ্ধতি, স্থান, গুণ (ফযীলত) বা কারণ দ্বারা নির্দিষ্ট করলে তা বিদআত বলে পরিগণিত হয়।

যে নামাযের কথা কেবল যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং কোন হাসান বা সহীহ হাদীসে তার বর্ণনা নেই, সে নামায বিদআত।

উপরোক্ত পটভূমিকায় নিম্নে এমন কতিপয় নামাযের কথা আলোচনা করব, যা বিদআত। আর তা কেবল জানার জন্যই; যাতে কেউ অজান্তে সেই বিদআত না করে বসে।

১. **মা-বাপের জন্য নামায :** প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়ে বসে বসে ২ রাকআত নফল নামায পড়া। মা-বাপের উদ্দেশ্যে এমন নামায বিদআত। (মু'জামুল বিদআ-৩৪৫)

২. **ঈদের রাতের নামায :** উভয় ঈদের রাতে বিশেষ নামায (যঈফ জামেউস সগীর ৫৩৫৮, ৫৩৬১) এবং এই রাত্রি জেগে ইবাদত বিদআত। (মু'জামুল বিদআ ৩৩২পৃ:) ঈদুল ফিতরের রাতের ১০০ রাকআত এবং ঈদুল আযহার রাতের ২ রাকআত নামাযও বিদআত। (ঐ ৩৪৪পৃ:)

যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও আযহার রাত্রি জাগরণ (ইবাদত) করবে, তার হৃদয় সেদিন মারা যাবে না, যেদিন সমস্ত হৃদয় মারা যাবে। (ত্বাবারানী) সে হাদীসটি জাল ও মনগড়া হাদীস।

(সিলসিলাহ যায়ীফাহ, আলবানী ৫২০, যঈফ জা: ৫৩৬১দ্র:)

৩. **উমরী কাযা :** কাযা উমরী বা উমরী কাযা নামাযের অস্তিত্ব শরীয়তে নেই বিধায় তা বিদআত।

বিদআতীরা বলে, যদি কোন লোকের বহু সময়ের নামায কাযা হয়ে থাকে এবং সে তার সংখ্যা জানে না, তবে সে জুমুআর দিন ফরয নামাযের পূর্বে ৪ রাকআত নফল এক সালামে আদায় করবে। এই নামাযে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ৭ বার এবং সূরা কাওসার ১৫ বার পড়বে। এই নামায পড়লে নামাযী ও তার পিতা-মাতার অসংখ্য কাযা নামায আল্লাহ মাফ করে দিবেন। উল্লেখিত এ সকল আমল ভিত্তিহীন সুতরাং বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

৪. **সালাতুল আওয়াবীন :** আওয়াবীনের নামায আসলে চাশতের নামাযে অপর নাম। মহানবী ﷺ বলেন, "চাশতের নামায হলো আওয়াবীনের নামায। (সহীহুল জামে' ৩৮২৭) আর এ হাদীস এ কথারই দলীল যে, মাগরীবের পর উক্ত নামের নামাযটি ভিত্তিহীন ও বিদআত। যেমন এই নামাযের খেয়ালী উপকার বর্ণনায় বলা হয়ে থাকে যে, সৃষ্টিজগৎ ঐ নামাযীর অনুগত হয়ে যায় এবং ১২ বছরের কবুল হওয়া ইবাদতের সওয়াব লিখা হয়।

যে হাদীসে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের নামাযকে আওয়াবীনের নামায বলা হয়েছে, তা সহীহ্ নয়; যয়ীফ।

(সিলসিলাহ যায়ীফাহ, আলবানী ৪৬১৭, যঈফ জামেউস সগীর ৫৬৭৬)

তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে যে ৬ রাকআত নামায মাগরিবের পর পড়লে ১২ বছর ইবাদতের সমান হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা সহীহ্ নয়; বরং তা খুবই দুর্বল হাদীস। (যঈফ তিরমিযী ৬৬, সি যঈফা ৪৬৯. যঈফ জামেউস সগীর ৫৬৬১নং) যেমন ৫০ বছরের গোনাহ মাফ হওয়ার হাদীসও দুর্বল।

(সিলসিলাহ যায়ীফাহ, আলবানী ৪৬৮, যঈফ জামেউস সগীর ৫৬৬৫নং)

তদানুরূপ এই সময়ে ২০ রাকআত নামাযে বেহেশতে একটি গৃহ লাভের হাদীসও জাল ও মনগড়া। (আলবানী ৪৬৭ যঈফ জা: ৫৬৬২)

অবশ্য সাধারণভাবে নফল নামায যেমন নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে পড়া যায়, তেমনি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণ নফল অনির্দিষ্টভাবে পড়া যায়। মহানবী ﷺ-এর সময়ে নফল নামায পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (সহীহুল জামে'৪৯৬২নং)

৫. **এহতিয়াতী যোহর :** জুমু'আর নামাযের পর অনেকে যোহরের নিয়তে ৪ রাকআত নামায পড়ে থাকে। যা ভিত্তিহীন, মনগড়া ও বিদআত।

(আল-আজবিবাতুন নাফেআহ, আন আসইলাতি লাজনাতি মসজিদিল জামেআহ, মুহাদ্দিস আলবানী ৭৪পৃ: মু'জামুল বিদআ ১২০, ৩২৭পৃ:)

৬. **সালাতুল হিফ্য :** কুরআন হিফ্য সহজ হওয়ার উদ্দেশ্যে জুমুআর রাতে ৪ রাকআত এই নামায পড়া হয়। এর প্রথম রাকআত সূরা ফাতিহার পর সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা দুখান, তৃতীয় রাকআতে ফাতিহার পর সূরা সিজদা এবং চতুর্থ রাকআতে ফাতিহার পর সূরা মূল্ক পড়া হয়। আর এর শেষে লম্বা দুআ করা যায়। এ আমলের জন্য যে হাদীস বর্ণনা করা হয় তা জাল ও মনগড়া হাদীস।

(যঈফ তিরমিযী ৭১৯. সিলসিলাহ যায়ীফাহ আলবানী ৩৩৭৪নং)

মনগড়া প্রাত্যহিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব

৭. **জুমুবার** : জুমুআবারে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ২ রাকআত; প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার ও সূরা ফালাক্ব ২৫ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১ বার এবং সূরা ফালাক্ব ২০ বার পড়া।

ফযীলত : মৃত্যুর পূর্বে স্বপ্নে আল্লাহর ও বেহেশতে নিজের জায়গার দর্শন লাভ।

৮. **মৃতের জন্য ঈসালে সওয়াবের নামায** : মৃতব্যক্তির কল্যাণের জন্য সওয়াব পৌঁছবার উদ্দেশ্যে নামায পড়া এবং তার সওয়াব তার নামে বখশে দেয়া বিদআত। (জু'আমুল বিদা' ৩৪০ পৃ:)

৯. রবিবার দিনগত রাত্রে যে কোন সময়ে ৪ রাকআত ১ সালামে, প্রথম রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার, দ্বিতীয় রাকআতে ২০ বার, তৃতীয় রাকআতে ৩০ বার এবং চতুর্থ রাকআতে ৪০ বার পড়া। নামাযের পর নির্দিষ্ট অযীফা ৭৫ বার করে।

ফযীলত : দোযখী হলেও বেহেশত লাভ হবে! সমস্ত জাহেরী গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ এবং আগামী সোমবারের ভিতরে মৃত্যুবরণ করলে শহীদ হবে।

১০. **সোমবার** : সোমবার চাশতের সময় ২ রাকআত নামায, প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার, সূরা ইখলাস ১ বার, সূরা ফালাক্ব ১ বার এবং সূরা নাস ১ বার পড়া।

ফযীলত : সমস্ত গুনাহ্ মাফ হবে। এই দিনে আরো ১২ রাকআত নামায।

ফযীলত : কিয়ামতে এক হাজার বেহেশতী যেওর ও তাজ পরানো হবে, ১ লক্ষ ফিরিশতা এই নামাযীকে নিয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ফিরিশতার অসংখ্য উপহার থাকবে।

সোমবার দিবাগত রাত্রে ১২ রাকআত এবং প্রত্যেক রাকআতে সূরা নাসর ৫ বার করে পড়া।

ফযীলত : বেহেশতে ৭টি পৃথিবীর সমান বিরাট ঘর তৈরি হবে।

১১. **মঙ্গলবার** : মঙ্গলবার দিনে চাশতের সময় অথবা সূর্য ঢলার সঙ্গে সঙ্গে ১০ রাকআত এবং প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার ও সূরা ইখলাস ৩ বার পড়া।

ফযীলত: ৭০ দিনে কোন গুনাহ্ লিখা হবে না। ৭০ বছরের গোনাহ মাফ হয়। আর ঐ দিনে মৃত্যুবরণ করলে সে শহীদ হবে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে ২ রাকআত; প্রথম রাকআতে ১০ বার সূরা ফালাক্ব এবং দ্বিতীয় রাকআতে ১০ বার সূরা নাস পড়া।

ফযীলত : ৭০ হাজার ফিরিশতা আসমানে থেকে নাযিল হয়ে এই নামাযীর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব লিখতে থাকবে।

১২. **বুধবার :** বুধবার দিনে সকালে ১২ রাকআত : প্রত্যেক রাকআত আয়াতুল কুসরী ১ বার, সূরা ইখলাস ৩ বার, সুরা ফালাক্ব ৩ বার এবং সূরা নাস ৩ বার পড়া।

ফযীলত : সমস্ত গুনাহ্ মাফ, কবরের আযাব, সংকীর্ণতা ও অন্ধকার দূর হবে, নবীদের মত আমল নিয়ে কিয়ামতে উঠবে এবং কিয়ামতের কষ্ট দূর হবে।

বুধবার মাগরিব ও এশার মাঝে ২ রাকআত: প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ৫ বার, সূরা ইখলাস ৫ বার, সূরা ফালাক্ব ৫ বার এবং সূরা নাস ৫ বার পড়া।

ফযীলত : মা-বাপের নামে বখশালে মা-বাপের হক আদায় হয়ে যাবে; যদিও দুনিয়াতে তারা তার ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। সিদ্দীক ও শহীদগণের সওয়াব লাভ হবে।

১৩. **বৃহস্পতিবার :** বৃহস্পতিবার দিনে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ২ রাকআত; প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১০০ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১০০ বার পড়া। সালামের পর দরূদ শরীফ ১০০ বার।

ফযীলত : রজব, শা'বান ও রমযান মাসের রোযাদারদের মত, কা'বা শরীফের হাজীদের মতো এবং মুমিনদের সংখ্যা অনুপাতে সওয়াব লাভ হয়।

বৃহস্পতিবার মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাকআত নামায প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার পড়া।

ফযীলত : ১২ বছরের দিনের রোযার এবং রাতের ইবাদত করার সওয়াব লাভ হয়!

মনগড়া মাসিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব

১৪. মহররম মাসের খেয়ালী নামায : মহরম মাসের প্রথম তারিখের রাতে ২ রাকআত: প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার।

এই রাতে আরো ৬ রাকআত : প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার। এতে বেহেশতে ২০০০ কক্ষ লাভ হবে; প্রত্যেক কক্ষে ইয়াকূতের ১০০০ দরজা এবং প্রত্যেক দরজায় সবুজ রঙের তখতার উপর হুর বসে থাকবে। ৬০০০ বালা দূর হবে এবং ৬০০০ সওয়াব লাভ হবে!

এই তারিখে দিনে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে দু' জন ফিরিশতা বডিগার্ড পাওয়া যায় এবং সারা বছর শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ।

আশুরার রাতে ১ রাকআত : প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে কিয়ামত পর্যন্ত রৌশন থাকবে।

এই রাতে আরো ৪ রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গুনাহ্ মাফ হয়।

আশুরার দিনে ৪ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গোনাহ্ মাফ হয়! বেহেশতে ১০০০ নূরের কক্ষ তৈরি হয়। এই দিনে রয়েছে আরো ৪ রাকআত খেয়ালী নামায।

অথবা যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআত সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ১০ বার, সূরা ইখলাস ১১ বার এবং নাস ও ফালাক ৫ বার। নামায শেষ ইস্তিগফার ৭০ বার। এ নামায বিদআত।

এই মাসের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন যোহরের পর ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। এ নামায হাসান-হোসেনের রূহের উপর বখশে দিলে কিয়ামতে তাঁদের সুপারিশ লাভ হবে।

১৫. **সফর মাসের খেয়ালী নামায :** প্রথম তারিখের রাতে এশার পর ৪ রাকআত; প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ১৫ বার। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। তৃতীয় রাকআতে সূরা ফালাক ১৫ বার চতুর্থ রাকআতে সূরা নাস ১৫ বার। এতে সমস্ত বালা মুসিবত থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং খুব বেশি সওয়াব লাভ হয়।

এই মাসের শেষ বুধবার বা আখেরী চাহার শোম্বার চাশতের সময় ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার।

এ মাসের ১ম সপ্তাহের জুমু'আর রাতে এশার পরে ৪ রাকআত নফল এবং তার খেয়ালী সওয়াবের কথার উল্লেখ রয়েছে অনেক কিতাবে।

১৬. **রবিউল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায :** এই মাসের প্রথম হতে ১০ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন ২০ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২১ বার। এই নামায নবী করীম ﷺ-এর নামে বখশে দিলে তিনি নামাযীকে বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন।

অনেকের মতে এ মাসে নিয়মিত দরূদ পড়লে ধনী হওয়া যায়।

১৭. **রবিউল-সানী মাসে বিদআতী নামায :** এই মাসের ১, ১৫ ও ২৯ তারিখে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫ বার। এতে ১০০০ সওয়াব লাভ, ১০০০ পাপ মাফ এবং ৪টি হূর লাভ হবে।

অনেকের খেয়াল মতে এ মাসের ১৫ তারিখে মাগরিবের পর ৪ রাকআত নামায পড়লে উভয়কালে কামিয়াবী লাভ হয়। এ মাসের শেষ রাতে ৪ রাকআত নামায পড়লে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

১৮. **জুমাদাল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায :** এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে ৪ রাকআত প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার। এতে ৯০,০০০ বছরের নেকী লাভ হবে এবং ৯০,০০০ বছরের গুনাহ মোচন হয়ে যাবে! কারো খেয়াল মতে এ মাসের প্রথম তারিখে ২০ রাকআত নামায পড়তে হয়।

১৯. **জুমাদাস সানীর খেয়ালী নামায :** এই মাসের প্রথম তারিখের রাত ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৩ বার। এতে ১ লাখ নেকী লাভ হবে এবং ১ লাখ গুনাহ মোচন হবে।

এ রাতে ১২ রাকআত নামাযের কথাও বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

২০. **রজব মাসের খেয়ালী নামায :** এই মাসের ১. ১৫, ও শেষ তারিখে গোসল করলে (গঙ্গাজলে স্নান করার মত) প্রথম দিনকার শিশুর মত নিষ্পাপ হওয়া যায়! এই মাসে ৩০ রাকআত নামায এবং তার ৫টি রাত ইবাদত খেয়ালী ফযীলত বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

কারো মতে এ মাসের ১৫ তারিখে এশার পরে ৭০ রাকআত নামায পড়লে পৃথিবীর বৃক্ষরাজি পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। (মু'জামুল বিদআ ৩৪১)

২১. **শবে মি'রাজের নামায :** এই মাসের ২৭ তারিখে এশা বিতরের মাঝে ৬ সালামে ১২ রাকআত নামায। আর নামাযের পর ১০০ বার কালেমায়ে তামজীদ এবং নির্দিষ্ট দুআ পাঠ। এই দিন দান করতে হয়। ঐ দিনের রোযা এবং ঐ রাতে ইবাদত ১০০ বছর রোযা এবং ১০০ রাত ইবাদত করার সমান। (মু'জামুল বিদআ ৩৪১ ও ৩৪৫)

২২. **শা'বান মাসের খেয়ালী নামায :** এই মাসের ১ তারিখের রাতে ৪ রাকআত প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। এতে অসংখ্য সওয়াব লাভ হয়।

এই মাসে যে কোন রাতে ১ সালামে ৮ রাকআত নামায পড়ে ফাতেমার নামে বখশে দিলে তিনি ঐ নামাযীর জন্য শাফাআত না করে বেহেশতে এক পাও দিবেন না!

২৩. **শবে বরাতের নামায :** শবে বরাত আসলে শবে কদরের ভ্রান্ত রূপ। শবে কদরের মর্যাদা ছেড়ে শবেবরাতের নফল ইবাদত নিয়ে মাতামাতি করে শবে বরাত বা ভাগ্য লাভের জন্য লোকে ১০০ রাকআত নামায পড়ে থাকে। আর প্রত্যেক রাকআতে ১০ বার সূরা ইখলাস পড়ে থাকে। এ নামাযও মনগড়া বিদআত। (মু'জামুল বিদআ ৩৪১-৩৪২পৃ:) শবে বরাতের

নামায পড়লে নাকি ২০টি হজ্জের এবং ২০ বছর একটানা ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়! আর ১৫ তারিখে রোযা রাখলে নাকি অগ্র-পশ্চাৎ ২ বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়।

এ রাতে নামায আদায়ের পূর্বে নাকি গোসল করতে হয়। আর সে গোসলের সওয়াবও রয়েছে নাকি খেয়ালী; এ গোসলের প্রতি ফোঁটার পানির বিনিময়ে ৭০০ রাকআত নফল নামায আদায়ের সওয়াব আমলনামায় লিখা হয়ে থাকে।

এ রাতে বালা দূর করা, আয়ু বৃদ্ধি করা এবং অভাবমুক্ত হওয়ার নিয়তে ৬ রাকআত নামায পড়া হয়। পড়া হয় সূরা ইয়াসীনসহ আরো মনগড়া দুআ (মু'জামুল বিদআ ৩৪২ পৃ:) ঘরে ঘরে জ্বালানো হয় দীপাবলী। বানানো হয় নানা রকম খাবার। আর এ সবের পশ্চাতে এক একটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়।

এ ছাড়া আরো কত শত খেয়ালী ইবাদত ও সওয়াবের কথা পাওয়া যায় একাধিক বাজারী বই-পুস্তকে; যার সবগুলোই বিদআত এবং সে সবের একটিও সহীহ্ দলীল নেই।

২৪. **রমযান মাসের খেয়ালী শবে কদরের নামায রমযানের শেষ দশকের বিজোর ৫টি রাত্রিতেই :** শবে কদরের সারা রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতে হয়, নামায পড়তে হয়। কিন্তু কেবল ২৭ তারিখের রাতে তারাবীহর পর খাস শবে কদরের নামায পড়ে বিদআতীরা। তাতে তারা প্রত্যেক রাকআতে সূরা ক্বাদর এত এত বার এবং সূরা ইখলাস এত এত বার পড়ে থাকে। যার কোন দলীল ও ভিত্তি নেই।

২৫. **শাওয়াল মাসের খেয়ালী নামায :** এই মাসের ১ তারিখের রাতে অথবা ঈদের নামাযের পর ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২১ বার। এতে বেহেশতের ৮টি দরজা খোলা এবং দোযখের ৭টি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে বেহেশতে নিজের স্থান দেখা যায়।

এ ছাড়া দিনে অথবা রাতে আরো ৮ রাকআত নামাযের কথা বলা হয়।

২৬. **যুলক্বাদাহ মাসের খেয়ালী নামায :** এই মাসের ১ তারিখের রাতে ৪ রাকআত প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৩ বার। এতে বেহেশতে

৪০০০ লাল ইয়াকূতের ঘর তৈরি হয়! প্রত্যেক ঘরে জওহারের সিংহাসন থাকবে। প্রত্যেক সিংহাসনে হুর বসা থাকবে; তাদের কপাল সূর্য অপেক্ষা বেশি উজ্জ্বল হবে।

এ ছাড়া এই মাসের প্রত্যেক রাতে ২ রাকআত নামায পড়লে ১ জন শহীদ ও ১ হজ্জের সওয়াব লাভ হবে! আর এই মাসের প্রত্যেক শুক্রবার ৪ রাকআত নামায পড়লে ১টি হজ্জ ও ১টি উমরার সওয়াব হবে।

২৭. **যুলহজ্জ মাসের খেয়ালীনামা :** এই মাসের ১ তারিখের রাতে ৪ রাকআত প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৫ বার। এতে অগণিত সওয়াব লাভ হয়।

এ মাসের প্রথম ১০ দিনের বিতরের নামাযের পর ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা কাওসার ৩ বার এবং সূরা ইখলাস ৩ বার পড়লে 'মাকামে ইল্লীন' লাভ হবে, প্রত্যেক কেশের বদলে ১০০০ নেকী এবং ১০০০ দীনার সদকা করার সওয়াব লাভ হবে!

এ ছাড়া আরো কত মনগড়া নামাযের কথা রয়েছে অনেক বই-পুস্তকে। আসলে সওয়াব তাদের নিজের পকেট থেকে বলেই এত এত সওয়াব অর্জনের ব্যাপারে আশ্চর্য ও অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রাত্যহিক ও মাসিক ঐ শ্রেণীর নির্দিষ্ট নামায যে বিদআত, সে প্রসঙ্গে উলামাদের স্পষ্ট উক্তি রয়েছে।

মহান আল্লাহর করুণায় সুসমাপ্ত

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	
৪.	শব্দার্থ আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	৩০০
৫.	আল লু'লু ওয়াল মারজান (মুত্তাফিকুন আলাইহি) বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন	১০০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ –মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন –মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না –আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম –হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:)	৪০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার) – সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাসি-কান্না ও যিকির –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা –ইকবাল কিলানী	১৫০
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মুকসূদুল মুমিনীন	
১৪.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ নেয়ামুল কুরআন	
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ এর প্র্যাকটিকাল নামায –মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন –যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৯.	রাসূল ﷺ এর ২৪ ঘন্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় – আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ -এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে –ইকবাল কিলানী	১৩০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) –ইকবাল কিলানী	১৫০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩১.	দোয়া কবুলের পূর্বশত –মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন – ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা – শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	ইসলামী সাধারণ জ্ঞান	
৩৭.	কবিরা গুনাহ্‌	২২৫
৩৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০
১৭.	ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
২৩.	পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
২৭.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
২৯.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৩৩.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
৩৪.	মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
৩৫.	আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে ......

ক. রাসূল ﷺ-এর অজিফা, খ. আল্লাহ কোথায়?, গ. পাঞ্জে সূরা, ঘ. চল্লিশ হাদীস, ঙ. বিয়ে ও তালাক, চ. খাছ পর্দা, ছ. ক্বাসাসুল আম্বিয়া, জ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায় ঝ. তওবা ও ক্ষমা, ঞ. আল্লাহর ৯৯টি নামের ফজিলত, ট.আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে, ঠ. তোফাতুল আরোজ (বাসর ঘরের উপহার)।

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq56@yahoo.com